কথামৃত – প্রথম পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

কথামৃত আলোচনা শুরু করার আগে, কথামৃতের ব্যাপারে গুটি কয়েক মৌলিক কথা বলে নিলে আমাদের সব কিছু বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথমে ঠাকুরের সম্বন্ধে বলতে হবে, তারপরে আসবে কথামৃতের রচনাকারকে নিয়ে, আর সেখান থেকে কথামৃত কিভাবে এসেছে; এই তিনটে জিনিসকে আমরা আগে আলোচনা করে নেব। প্রেক্ষপট জানা থাকলে বুঝতে সুবিধা হয়।

যে কোন জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথমে দরকার মন। কিন্তু এই মনকে আজ পর্যন্ত কেউ সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যাঁরা প্রাণির মস্তিষ্কের কার্যাবলীকে নিয়ে কাজ করেন, সেই নিউরো বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও পর্যন্ত মন জিনিসটা পরিষ্কার না। সমষ্টি-শব্দ মন, যেটাকে আমরা একটা subjective রূপে বুঝে নিয়ে বলে দিচ্ছি – মন বলতে এই, আপাতত এটাকে নিয়েই আমরা চলব, এর থেকে বেশী বিস্তারে গিয়ে আমাদের কাজ নেই। বৈজ্ঞানিকরা আজ এক রকম কথা বলছেন, কাল অন্য রকম কথা বলছেন, ওনারাও মনকে নিয়ে পুরো রিসার্চ করে উঠতে পারেননি। কিছু দিন আগে একটা লেখা পড়লাম, সেখানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, মন জিনিসটাকে বোঝার জন্য হিন্দুদের যোগদর্শনকে আমাদের একটু study করা দরকার।

মন যখন জগৎকে জানার চেষ্টা করে, তখন মন নিজের গঠন অনুযায়ী জগতের ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে নেয়, কিন্তু এখন কার মন কেমন individual মন দিয়ে বলে দেওয়া মুশকিল। বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে যদি যাওয়া হয়, তাঁরাও এখনো মনকে ঠিক ঠিক ভাবে define করতে পারছেন না, আমরাও পারিনি, বিশেষ করে প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা কেন হয়, এর কোন উত্তর কারুর কাছে নেই। তবে হিন্দুরা আলাদা আলাদা মনের ব্যাপারে একটা খুব সুন্দর শব্দ বার করেছেন – সংস্কার। আগের আগের জন্মে যে যে কর্ম করেছে, সেই কর্মের সংস্কারগুলো থেকে গেছে, সেই সংস্কার অনুসারে মানুষের মন গঠিত হয়ে থাকে।

বহির্জগৎ আর মন, এই দুটোর যখন মিলন হয়, তখন মনের উপর কিছু ছাপ পড়ে। এই ছাপ পড়ার পর, সেই ছাপের প্রতি মন নিজের একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়, এই প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেওয়টাকে আমরা জ্ঞান বলছি। যোগদর্শনের এটি একটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং খুব নামকরা ও বিরাট subject। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগৎ থেকে আমরা নানান জিনিস অনবরত গ্রহণ করে যাচ্ছি, মনও ক্রমাগত তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিক ভাবে মন তাই সব সময় একটা চঞ্চল অবস্থায় থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, যখন ইন্দ্রিয়গুলি কোন কাজ করে না, তখন আবার ভিতর থেকে অনেক কিছু হতে থাকে, যাকে আমরা স্বপ্নাবস্থা বলি। চোখ যদি বন্ধ করে রাখা হয়, যদি ঘুমিয়ে না থাকে, তখন পুরনো চিন্তা-ভাবনাগুলি, স্মৃতিরূপে যেগুলি থেকে গেছে, কিংবা কল্পনা, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে মন চঞ্চল হয়ে থাকে। যোগশাস্ত্র বলছেন, যদি কোন ভাবে মনের এই চাঞ্চল্যকে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তখন একটা অন্য ধরণের জ্ঞান আসে। এই কথাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের অনেক ভাবে অনেক ধরণের জ্ঞান হয় – জাগ্রত অবস্থায় জগতের জ্ঞান আসে, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের জ্ঞান আসে, অনেক সময় মিথ্যা জ্ঞান আসে, আবার কল্পনার জ্ঞান থাকে, পুরনো স্মৃতিগুলির জ্ঞান থাকে।

এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানের বাইরে আরেকটা জ্ঞান আছে, যোগদর্শনে ওনারা বলছেন এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান না, এই জ্ঞান বস্তুজ্ঞানও না। বৃত্তি মানে, মন যে প্রতিক্রিয়া ছাড়ে এটাকে বলা হয় বৃত্তি। পাঁচ প্রকার জ্ঞানের বাইরে যে অন্য একটি স্বতন্ত্র ধরণের জ্ঞানের কথা বলছেন, এটা বৃত্তি জ্ঞান না, সেইজন্য এটা বস্তুজ্ঞানও নয়। স্মৃতি রোমন্থন করছি, পুরনো কথা মনে করছি, কল্পনা করছি, এগুলো সব বস্তুজ্ঞান।

যোগসাধনা করে মনকে যখন শান্ত করে দেওয়া হল বা অন্য কোন কারণে মন যখন শান্ত হয়ে গেল, তখন সেই মনে অন্য ধরণের একটা জ্ঞান আসে। এখন মানুষের মন কত দিন শান্ত থাকবে, কতটা শান্ত থাকবে, এর বিস্তারিত জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। যাঁদের মন কদাচিৎ যখন শান্ত হয়ে যায়, তাঁদেরকে আমরা মহাপুরুষ বলি, সন্ত-মহাত্মা বলি। এই সন্ত-মহাত্মাদের উপরে আরেকটা থাক আছে, যাঁদেরকে আমরা অবতার বলি, প্রফেট বলি। তাঁদের শান্ত মনটা যেন নিত্যকার আর অনায়াস ব্যাপার। কখন সখন তাঁরা যেন নিজের ইচ্ছাতেই বৃত্তির অবস্থায় আসেন, যেখানে মন এই জগৎকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে থাকে। অতীতে সন্ত-মহাত্মা অনেক হয়েছেন, ভবিষ্যতেও অনেক হবেন, যেমন তুলসীদাস তিনি একজন সন্ত, সুরদাস তিনি একজন সন্ত। কিন্তু বেদের ঋষিরা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, এনারা অন্য একটা শ্রেণী। ধ্যানের গভীরে ঋষিরা যে জ্ঞান লাভ করেন, সেই জ্ঞান যেন আরও গভীর। আর ওই জ্ঞান কোন কিছুকে অবলম্বন করে থাকে না। সন্ত-মহাত্মাদের জ্ঞান কোন কিছুর উপর অবলম্বন করা থাকে। যে কথাগুলো আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে, সেই বাণীর উপর আধার করে সন্ত-মহাত্মারা জ্ঞান উপলব্ধি করেন। এনারা যেন একটু নীচের থাকের, আমাদের দৈনন্দিন ধর্মীয় ক্রিয়া তাতেই হয়ে যায়।

কিন্তু আমরা এখানে দেখতে চাইছি পুরো আধ্যাত্মিক জ্ঞান কিভাবে আসে। যাঁরা এসব বিষয় নিয়ে চর্চা করেন না, তাঁরা এই জিনিসগুলিকে বুঝতেও পারবেন না। এক ঝাঁক শালিক পাখিকে একসাথে দেখলে মনে হবে সব শালিক পাখিই এক রকম দেখতে। কিন্তু যাঁরা শালিক পাখি নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা বুঝে নেবেন, এটা এই প্রজাতির শালিক, ওটা অন্য জাতের শালিক। যিনি যে বিদ্যাকে নিয়ে চর্চা করেন, তিনি সেই বিদ্যার সুক্ষ্ম জিনিসগুলোর ব্যাপারে জানতে পারেন। যদি বিদ্যাকে ভাসাভাসা জানা থাকে, সেই জানা দিয়ে বিদ্যার সূক্ষ্ম জিনিসগুলোকে ধরা বা জানা যায় না। আধ্যাত্মিক বিদ্যার ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান, তারা এসব শুনলে বলবে, কি বক্ বক্ করছে। কিন্তু তা না, এখানেও সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। ওই সূক্ষ্ম তফাৎ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে একজন ভাল মানুষ, একজন সাধুপুরুষ, সন্ত-মহাত্মা আর সেখান থেকে আরও উপরে ঋষি, অবতাররা আছেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে অবতারদের ব্যাপারে আমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার থাকে না। অবতারকে আমরা আমাদের মতই একজন মনে করি, চেহারা আমাদের মত, কথাবার্তা আমাদের মতই, কিন্তু এনারা কারা? ঠাকুর একটা সহজ উপমা দিচ্ছেন, একটা পুকুরের জলে অনেক মাছ খেলা করছে। পুকুরের জলে চাঁদের ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। মাছেরা চাঁদের প্রতিবিম্বকে মনে করছে, এ আমাদেরই মত মাছ। সারা রাত চাঁদের ছবির সাথে খেল করল, খুব আনন্দ করল, সকাল হতেই চন্দ্র অস্তমিত হয়ে গেল। তখন মাছেরা ভাবছে, এ কোথায় গেল, কে ছিল সে? অন্য দিকে ভাগবতের প্রথম দিকে, আবার রাসলীলাতেও বলছেন, অবতারকে বোঝা যায় না, তবে মানুষরূপ ধারণ করে এনারা এমন কিছু কাজকর্ম করেন, যেটা দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন কাজ করা কখনই সম্ভব না, তাতেই বোঝা যায় ইনি অবতার, ইনি ভগবান। সাধারণ লোকেদের পক্ষে এমনিতে অবতারকে অবতার রূপে চেনা অসম্ভব।

ঠাকুর শঙ্করাচার্যকেও অবতার বলছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুকেও অবতার বলছেন, আবার ভাগবতে চব্বিশ অবতারের কথা বলছেন, এর বাইরেও নাকি অসংখ্য অবতার আছেন, তার সাথে আমরা মনে

করি ঠাকুর অবতার। অবতার পুরুষদের নিয়ে দুটো factor এসে যায়। একটা হল, যাদের মন অতি সাধারণ আর যারা পরম্পরাতে বড় হয়নি, তাদের কাছে অবতার পুরুষকে মনে হবে, ইনি আমাদের মতই একজন সাধক, সাধনা করেছেন, যেমন তুলসীদাস, মীরাবাঈ এনারা খুব উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন, এনারাও সাধনা করে ওই রকম একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যারা পরম্পরাতে বড় হয়েছে, তারা যদি কেউ এগুলোকে নাড়াচারা করতে শুরু করে, তখন দেখে যে, কোথাও একটা তফাৎ আছে। কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, এনারা সত্যিই খুব উচ্চমানের ভক্ত ছিলেন, একেবারে একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবন দেখছি, ঠাকুরের জীবন দেখছি, তখন এই দেখে অবাক লাগে যে, এখানে যেন এক অসীম শক্তির প্রকাশ। কারণ এই শক্তি আগে কোন মানুষে দেখা যায়নি, আর এটাকে ডুপ্লিকেট করা যায় না।

কিন্তু এর বাইরেও একটা তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হয়, যার ব্যাখ্যা আমরা একটু পরেই করব, কিন্তু তার ফলটাকে আগে বলে দেওয়া হল – সন্ত-মহাত্মা যাঁরা হন, তাঁরা অনেক সময় স্বপ্নে এসে আমাদের কাউকে কাউকে জ্ঞান দেন, উপদেশ দেন, কখন ধ্যানের গভীরে কারুর প্রত্যক্ষ হন, একজন দুজনকে হয়ত স্বপ্নে বা ধ্যানে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। কিন্তু যিনি অবতার পুরুষ, তিনি ইচ্ছামাত্র যে কোন লোককে, যেখানে খুশী, একেবারে তাঁর স্থূল শরীর নিয়ে তার সামনে বা সূক্ষ্ম শরীরে তার মনে উপস্থিত হয়ে যেতে পারেন। এই ধরণের লোকেরা অবতারের ভক্ত হতে পারেন, ভক্ত নাও হতে পারেন আর অবতারের বিরোধীও হতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁরা তাঁর ভক্ত বা যাঁরা তাঁর বিরোধী, এমনিতে হয়ত ভাল মানুষ, কিন্তু কোন কারণে বিরোধিতা করছিলেন, কিন্তু এই মহাপুরুষরা তাঁকে একটি কথা বলে দিলেন, কিংবা তাঁর দিকে একটু করুণার চোখে দৃষ্টিপাত করলেন, কি একটু ছুঁয়ে দিলেন, তাতেই তাঁর জীবনের আমূল রিবর্তন হয়ে যাবে। এই যে জীবন পরিবর্তিত করে দেওয়ার ক্ষমতা, এটা অবতারদের প্রচণ্ড ভাবে থাকে। এই ক্ষমতা শ্রীকৃষ্ণেরও ছিল, যীশুখ্রীষ্টেরও ছিল, ভগবান বুদ্ধেরও ছিল, ঠাকুরেরও ছিল। তার আগে বলা হল, সূক্ষ্ম শরীরে এসে দর্শন দেওয়ার ক্ষমতা। এই দর্শন একজনের হলে হবে না, একজনের হলে তখন তিনি সন্ত-মহাত্মা হয়ে যাবেন। আরেকটা হল, এনাদের নিজেদের যে উপলব্ধি সেটা সাংঘাতিক, সাধারণ মানুষ এই উপলব্ধি করতে পারবে না।

আরেকটা দেখার জিনিস হল, অনেকেই তাঁর সূক্ষ্ম দর্শন পেয়েছেন, তাঁদের কথাই পরবর্তি কালে আমরা পরম্পরা রূপে পাই। আমরা যারা বলছি কৃষ্ণ ভগবান, বুদ্ধ ভগবান, তার মানে পরম্পরাতে যাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি, শিক্ষককে, মা-বাবা, জ্যাঠা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করি, তাঁরা আমাদের বলে দিয়েছেন, ইনি অবতার। সেই থেকে আমরাও বলে যাচ্ছি, ইনি অবতার। কিন্তু ইনি অবতার বলে দেওয়াটা হল মুখের কথা, ওটা কোন কাজে লাগে না। ঠাকুর যেমন বলছেন সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কিছু নেশা হয় না, গায়ে মাখলেও নেশা হবে না, নেশা হওয়ার জন্য সিদ্ধি ভিতরে যেতে হবে। ঠাকুর অবতার, এটা যদি আমরা মুখে বলে দিই তাতে কিছু আসে যায় না। ঠাকুর যে অবতার এই জিনিসটাকে বোধ করতে হয়। বোধ করতে গেলে আবার ওই সমস্যা আসে, বোধ করার জন্য যখন চেষ্টা করা হয়, তখন মনে হয় তিনি একজন সাধু-মহাত্মা যিনি একটা উচ্চ অবস্থায় গেছেন, আবার অনেক সময় মনে হবে, যেহেতু গুরু বা আচার্যরা বলে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তিনি এমন কোন এক বিরাট শক্তি, যে শক্তি এই মানব শরীর ধারণ করেছেন।

সত্য যাই হোক, আমরা এটা জানি যে, ঠাকুরের আগে যে সন্ত-মহাত্মারা ছিলেন, তাঁরা নিজেরা যে শাস্ত্রের উপর আধার করে সাধনা করে সিদ্ধি পেয়েছেন, সেই সকল শাস্ত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষে তখন যেন হাজার হাজার ঋষিরা জন্ম নিয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মে ঋষির সংখ্যা অত্যন্ত কম, বিশেষ করে অত্যন্ত উচ্চমানের ঋষির সংখ্যা আরও কম। খ্রীশ্চানিটিতে ওনারা যীশু খ্রীষ্টকে ভগবান মনে করেন, ঠিকই মনে করেন। কারণ তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অনেককে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু খ্রীশ্চান ট্রাডিসান নিয়ে পড়াশোনা করলে দেখা যাবে ওনাদের মধ্যে প্রচুর সন্ত-মহাত্মা হয়েছেন, মুরি-

মুড়কির মত হয়েছেন, তাঁদের দিয়ে পুরো খ্রীশ্চান ধর্মের শক্তিটা চলে। কিন্তু খ্রীশ্চানিটিতে অবতারের কোন concept নেই বা অবতার সেখানে আসেন না, যেটাই সত্য হোক, মূল হল যীশু অবতার ছিলেন, যীশুর পর আর কোন অবতার নেই। হিন্দু ধর্মে সেটা হয়নি, হিন্দুদের যে পরম্পারা, এই পরম্পরাতে ভগবান ঋষি রূপে এসেছেন, যেমন কপিল মুনি, তাঁকে আমরা অবতার রূপে মনে করি, ভগবান বুদ্ধও একজন ঋষি, আমরা তাঁকে অবতার বলে মনে করি, ব্যাসদেবও একজন ঋষি, কিন্তু তাঁকেও অবতার রূপে গ্রহণ করা হয়। এই যে ঋষিরা ছিলেন, যাঁরা আমাদের বেদমন্ত্রগুলি দিয়ে গেছেন, তার সাথে কিভাবে তাঁদের সেই পরমসত্তার অনুভূতি হয়েছিল, তার বর্ণনাগুলি দিয়ে গেছেন। হাজার হাজার বছর আগে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন, সেগুলো তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের, সন্তানদের দিয়েছেন। সেই কথাগুলো শিষ্যরা, সন্তানরা পারিবারিক পরম্পরায় বা গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় ধরে রেখেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাদের ট্রেনিং দিয়ে এমন একটা orientation দিতেন, যাতে তাদের স্মৃতিটা প্রখর হত, তারাও ওই কথাগুলো মুখস্ত করে রাখত।

অনেক পরে ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে ব্যাসদেবের আবির্ভাব হল, সমালোচকরা বলবেন ব্যাসদেব পঞ্চম বা ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে এসেছিলেন, আর যাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁরা এটাকে আরও দু হাজার বছর আগে নিয়ে যান। আমরা সঠিক জানি না, তবে এতটুকু জানি ব্যাসদেব অনেক প্রাচীন যুগের লোক। ব্যাসদেবের আবির্ভাবের আগে ভারতে যত বেদ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তিনি এসে সব কটা বেদকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় করলেন। আর এর ফলস্বরূপ বেদ সংরক্ষিত হয়ে গেল। তারও অনেক বছর পর, ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে এসে লোকেদের মনে হল, বেদ পবিত্র বলে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তাতে বেদ একদিন হয়ত হারিয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন, নবম বা দশম শতাব্দীতে এসে প্রথম বেদ লিপিবদ্ধ হয়। একবার লেখা হয়ে যাওয়ার পর বেদ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকল না।

বেদকে আধার করেই আমাদের সমস্ত শাস্ত্র এসেছে, সেইজন্য বেদে আমরা সব রকম শাস্ত্রের কথাই পাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেদকে বলা হয় যে বেদ হল যজ্ঞপ্রধান। যদিও পরে পরে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বললেন, বেদমন্ত্র যজ্ঞপ্রধান হলেও এগুলোকে নিয়ে ধ্যানও করা যায়। যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, *ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুরবর্ণ্যেং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ*, এই মন্ত্র যজ্ঞেও ব্যবহার করা যায়। *তৎ সবিতুরবর্ণ্যেং..* এটা একটা মন্ত্র, যেটা দিয়ে যজ্ঞ হয়। কিন্তু এর আগে *ভূঃ ভূবঃ স্বঃ* লাগিয়ে দিলে এটা একটা মন্ত্র হয়ে যায়, যে মন্ত্রকে কোটি কোটি হিন্দু হাজার হাজার বছর ধরে ধ্যান করে আসছেন। যাঁরা গোঁড়া তাঁরা বলবেন, বেদের মন্ত্র দিয়ে ধ্যানও করা যায়, কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে পিছনের দিকে যখন তাকাই, তখন আমরা দেখি বেদ মূলতঃ যজ্ঞের জন্যই ব্যবহৃত হত। কিন্তু অনেকেই যাঁরা দিনরাত যজ্ঞযাগের ভাবে ছিলেন, ধীরে ধীরে সেখান থেকে তাঁদের মন আলাদা হয়ে গেল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে জানি যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, প্রচুর জপ-ধ্যান করেছেন, বেশ ভাল একটা জীবন-যাপন করেছেন, একটা বয়সে এসে তাঁরা বলছেন, 'মহারাজ খুব ইচ্ছে বাড়ির কাছে বা দূরে কোথাও কুটিরের মত একটা বাসা থাকবে, সেখানে সারাদিন একা একা থাকব, আর তপস্যা করব'। কখন আমি তাঁদের উৎসাহ দিই, কখন discourage করে বলি, আগেকার দিনের লোকেদের মত আপনার সেই শক্তি নেই যে, এই বয়সে নিজে রান্নাবান্না করে জপধ্যান করবেন, বাড়ির লোকজনদের সাথেই থাকুন না কেন। দরকার হলে বাড়িতেই আলাদা একটা ঘর করে সারাদিন ওখানেই থাকুন, কেউ তখন আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না'। বেদের সময় যখন এখনকার মত ভোগ আদি ছিল না, সেই সময় এই ধরণের কিছু লোক, যাঁরা সারাটা জীবন দেবতাদের উদ্দেশ্য যজ্ঞযাগ করে, আধ্যাত্মিক চিন্তন করে কাটিয়েছেন, একটা বয়সের পর তাঁদের মনটা আরও গভীরে চলে যেত। মন যখন গভীরে চলে যেতে থাকল, তখন তাঁরা জনবসতি ছেড়ে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যেতেন, সেখানে গিয়ে ধ্যান-ধারণা করে আরও গভীরে চলে যাচ্ছেন।

আপনারা শুনলে অবাক হবেন, মার্ক্সিস্ট ফিলজফারসরা, মার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিকরা বলেন, এই যে কিছু মানুষ জনবসতি ছেড়ে বনে চলে যাচ্ছেন, এটা একটা revolt, ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহ। যাঁরা পড়াশোনা করেননি, উপনিষদকে সঙ্গে রেখে বেদ পড়েননি, তাঁদের মনে হবে এনারা তো ঠিকই বলছেন, এত নামকরা বিদ্বদজন, এনারা কি ভুল বলতে পারেন! কিন্তু জিনিসটা একেবারেই তা নয়। যেমন সমাজে বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্ন রকমের কাজ করেন, আর আমরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের কাজ করতে পছন্দ করি। ঠিক তেমনি ঋষিরাও নানান রকমের আয়োজন করে যজ্ঞ করতেন। অনেক সময় তাঁদের যখন বয়স হয়ে যেত বা মনের এমন একটা অবস্থায় চলে যেতেন, ওনারা তখন সব কিছু থেকে সরে এসে ধ্যানে মন দিতেন। ধ্যানে মন দেওয়ার পর আরও ধ্যানের গভীরে গিয়ে সত্যের মুখোমুখি হয়ে ওনারা আরও কিছু কিছু নূতন নূতন তত্ত্ব নিয়ে এলেন, সেগুলোকে তাঁরা আবার নিজের শিষ্যকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে আমাদের দুটো পরম্পরা বেরিয়ে এলো – বেদের পরম্পরা ও উপনিষদের পরম্পরা। যদিও উপনিষদ বেদেরই অঙ্গ, কিন্তু কিছু কিছু অর্থে উপনিষদ একটু আলাদা, কারণ উপনিষদের মন্ত্রগুলি সরাসরি যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় না। পরম্পরায় চলতে চলতে পরে পরে দেখা যেতে লাগল যে, পরের দিকে যে আচার্যরা আসছেন, তাঁরা নিজেদের তরফ থেকে একটা দুটো কথা যোগ করে বলে দিচ্ছেন, দেখ বাপু এই কথাগুলো আমরা আমাদের আচার্যদের কাছে শিখে এসেছি। যেমন ঈশোপনিষদের আচার্য বলছেন, *ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে*, যাঁরা বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা এটা শুনেছি বা শিখেছি। সেখান থেকে পরে দেখা গেল, বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পড়ত না।

ব্যাসদেবের মনে হল, বেদ পড়ার অধিকার যদি সবার না থাকে তাহলে কি করে মানুষের কাছে ধর্মের কথা, ঋষিদের আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি পৌঁছাবে, তখন তিনি পুরাণ লিখতে শুরু করলেন। পরম্পরাতে আমরা যেভাবে পাই, তাতে দেখা যায় পুরাণ রচনা করার আগে তিনি মহাভারত রচনা করেছেন। মহাভারত আর বেদের মাঝখানে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে বাল্মীকিকে পাই, যিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। সমস্যা হল, রামায়ণ, মহাভারত আর পূরাণ এই তিনটে গ্রন্থের রচনাকাল আমরা জানি না। প্রাচীন সাহিত্যের রচনাকাল নির্ণয় করার ব্যাপারটা খুব specialized জিনিস, সেইজন্য যাঁরা খুব উচ্চমানের পণ্ডিত তাঁরাই বলতে পারেন। কারণ অনেক সময় আমরা দেখি পুরাণের কাহিনীগুলি রামায়ণেও আছে, পুরাণের কাহিনী মহাভারতেও আছে, আবার মহাভারতের কাহিনী পুরাণেও আছে, আবার রামায়ণের কাহিনী মহাভারতেও আছে। পুরাণকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, পুরাণ মানে পুরনো দিনের কাহিনী কিন্তু যেটা এখনও আধুনিক, একেবারে fresh।

আবার আমাদের স্মৃতি গ্রন্থাদি শাস্ত্রে আচার-আচরণকে আরও বেশী করে কোডিফাই করে দেওয়া হল। এইভাবে আমাদের গ্রন্থের কলেবর বেড়েই চলেছে, একদিকে হল শ্রুতি গ্রন্থ বেদ উপনিষদ, আবার এলো স্মৃতিমূলক গ্রন্থ যার মধ্যে রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, আঠারোটা পুরাণ ও আঠারোটা উপপুরাণ আছে। আবার এসে গেল স্মৃতি শাস্ত্র, যেখানে মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থগুলি রয়েছে। তার সাথে আমরা পাই নীতিশাস্ত্র, চাণক্যের নীতিশাস্ত্র যদিও অনেক পরে এসেছে, কিন্তু তার আগে মহাভারতেই আমরা অনেক নীতিশাস্ত্র পাই। এইভাবে চলতে চলতে আজ থেকে দেড়শ বছর আগে যা দাঁড়াল তাতে হিন্দুদের কত শাস্ত্র, কত গ্রন্থ জমা হল আমরা কল্পনাই করতে পারব না। একদিকে চারটে বেদ, তার সাথে উপনিষদ, কেউ বলেন একশোর বেশী উপনিষদ, কেউ বলেন হাজারটা উপনিষদ আছে। সব মিলিয়ে পুরাণের এগারো থেকে বার লক্ষের মত শ্লোক, মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক, তারপর কত রকমের স্মৃতিমূলক গ্রন্থ রয়েছে। অন্য দিকে ছিল তন্ত্র, যার কথা আমরা আলোচনাতেই আনলাম না। বেদে যেমন যজ্ঞ করার জন্য, স্বর্গে যাওয়ার জন্য, তাদের নিজস্ব অনেক আচার বিধি ছিল, তন্ত্রও ঠিক সেইভাবে নিজের মত করে অনেক আচার-বিধি নিয়ে এলো, ওনারা বলেন যে, এই আচরণ-বিধি দিয়ে

স্বর্গে সুখ পাবে, এই জগতে সুখ পাবে আবার চাইলে তোমার মুক্তিও হতে পারে। এই তন্ত্রের আবার শত শত গ্রন্থ।

আজ থেকে দুশো বছর আগে, ১৮৫৭, যেখান থেকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়, যেখান থেকে ভারতকে নূতন ভারত রূপে পরিভাষিত করা হয়, আজকের মন নিয়ে আমরা যদি সেখানে গিয়ে দাঁড়াই, তখন আমাদের মনে হবে বেদ, উপনিষদ খুব সুন্দর রচনা, কি সুন্দর কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেদের মন্ত্রগুলিকে কবিতায় রূপান্তরিত করে দিলেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও বেদ, উপনিষদকে এভাবেই দেখেছিলেন। মার্ক্সীয় পণ্ডিতদের লেখাগুলো যদি পড়েন, দেখবেন তাঁরা বলছেন, কবিতাগুলো ভাল, তবে এই জায়গাতে একটা দোষ আছে, ওই জায়গাতে একটা দোষ আছে। আবার আমাদের একজন ইতিহাসবিদ্ বলছেন, বেদ যেন একটা মহা অরণ্য, তার মধ্যে মাঝে মাঝে যেন সুন্দর ফুলের বাগান, সেগুলো হল উপনিষদ। তার মানে, ভদ্রলোক কিছুই বোঝেননি। বেদ ও উপনিষদ কি আলাদা! বেদও যা, উপনিষদও তাই। অথচ এনারা বিরাট স্কলার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কিন্তু মূল জিনিসটা এনারা বোঝেননি। ১৮৫৭ সালে চলে গেলে তখন বোঝার কোন সম্ভবনাই ছিল না। তখন মনে হবে, বাঃ বাঃ আমাদের পূর্বজরা এইভাবে সব কিছু করতেন, এই তো এখনও কত ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করছেন। আর কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা ওগুলো অনুশীলন করে যাচ্ছেন, বেদের কোন মন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন না। অন্য দিকে একটু সমালোচনা করলে আপনাকে অভিশাপ বর্ষণ করতে ভুল হবে না।

আমরা যেমন এখন বলতে শুরু করেছি pre-independence post-independence, ঠিক তেমনি এটা হবে pre-spiritual independence post-spiritual independence। Pre-spiritual independence হল, ঠাকুরের যে সাধনা আদি হল, তার আগে; post-spiritual independence হল শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আমাদের কাছে একটা phenomenon রূপে আসছেন। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ, যিনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন, তিনিও বলছেন, মেকলে ১৮৩৬ সালে নূতন শিক্ষা পদ্ধতি আনলেন আর সেই বছরেই ঠাকুরের আবির্ভাব, অর্থাৎ ঠাকুর যেন ইংরাজী শিক্ষাকে আটাকাবার জন্য আবির্ভূত হলেন। ঠাকুর কদাপি এই ধরণের কাজ করবেন না। কিন্তু আমরা জানি ১৮৩৬ হল একটা ঐতিহাসিক মুহুর্ত। ভবিষ্যতে যখন ইতিহাস লেখা হবে, তখন pre-Ramkrishna post-Ramakrishna হয়ে যাবে। তফাৎ কি? এতক্ষণ যত নাম বলা হল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, তন্ত্র স্মৃতি এগুলো কি কোন কল্পনা প্রসূত, নাকি লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নাকি অন্য কিছু। বুম্ করে ঠাকুর এসে এই ধারণাগুলিকে পাল্টে দিলেন। নিজের সাধনা দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন, বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, তন্ত্র সব কিছুর ভিতরে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, এই কথাগুলো সত্য, আক্ষরিক ভাবে সত্য। ঠাকুরের কোন কেতাবী বিদ্যা ছিল না, কোন পড়াশোন ছিল না, কিছু কিছু কথা শুনেছিলেন ঠিকই, সেটাও তাঁর সিদ্ধির পর। বেদ, উপনিষদের যে কথাগুলি তিনি জানতেন না, বেদের যে জিনিসগুলির বর্ণনা আছে, সেগুলোকে তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন। ঠাকুর একবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বেদ থেকে কিছু বলতে বললেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ থেকে বর্ণনা করতে শুরু করলেন, সেই পরমসত্তা যেন একটা ঝাড়লণ্ঠন, জীব যেন সেই লণ্ঠনের এক-একটা বাতি। শোনার পর ঠাকুর বলছেন, আরে তাই তো, আমি তো এই রকমই দেখেছি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যে বেদ থেকে কথাটা বললেন, তার যেন ওটা একটা ভাল লাগার ব্যাপার, তিনিও সাধনা করছেন, ভাল লাগছে বলেই তিনি বললেন। কিন্তু ঠাকুর ওটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সন্ত-মহাত্মাদের কথা বলা হয়েছিল, ওনারা যে কোন একটা আধ্যাত্মিক ভাবকে আধার করে, সেটাকে সত্য রূপে জেনেছেন। ঠাকুরও তাই করেছেন, প্রথমে কমলাকান্তের গান শুনে, রামপ্রসাদের গান শুনে তাঁরও মনে প্রশ্ন এলো, মা কালী কি সত্য। কিন্তু সেখান থেকে তাঁর মনে হতে লাগল, সবটাই

আমাকে দেখতে হবে, বেদে কি আছে, পুরাণে কি আছে। কথায় কথায় মা কালীর কাছে দৌঁড়ে যাচ্ছেন, মা আমাকে দেখিয়ে দে পুরাণে কি আছে, মা আমাকে দেখিয়ে দে বেদে কি আছে। আর এক এক ভাবকে নিয়ে তিনি সাধনা করে যাচ্ছেন। যখন যে ভাব তাঁর মনে উঠছে, দেখা যেত সেই ভাবের আচার্যও জুটে যাচ্ছে, আর তিনিও ঠাকুরকে ওই ভাবের সাধনার পদ্ধতিগুলি শিখিয়ে দিচ্ছেন, কিছু দিন সাধনা করে ঠাকুর সেটাকে উপলব্ধি করে নিচ্ছেন। এই ভাবে ঠাকুর একটার পর একটা উপলব্ধি করে যাচ্ছেন। রাম মন্ত্রে সাধনা করছেন, রামের সাক্ষাৎ করলেন, শিবের সাক্ষাৎ করছেন, কৃষ্ণের দর্শন হচ্ছে আর তার সাথে কত রকমের অনুভূতি হচ্ছে। তোতাপুরী আসার পর তিনি অদ্বৈত সাধনাতে নামলেন। সাধারণ ভাবে আমাদের চিন্তা-ভাবনায় অদ্বৈত আর ভক্তি যেন একসাথে চলতে পারে না। শঙ্করাচার্যের গীতার ভাষ্যে আমরা দেখছি, দুটো এক সঙ্গেই চলে।

এই যে হাজার হাজার বছরের যে আধ্যাত্মিক ইতিহাস, সবটাই যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়েই না, ওর মধ্যে কোনটা সত্য, কোনটা সত্য নয়, দৈনন্দিন জীবনে এর কোন সম্পর্ক আছে কি নেই, এগুলো জানার কোন পথ নেই। হঠাৎ ঠাকুর এসে সব কিছুকে মিলিয়ে দিলেন। আর তাই না, খুব কাছ থেকে পড়া হলে দেখা যাবে, ধর্মের অবাস্তব জিনিসগুলি, ফালতু জিনিসগুলিকে ঠাকুর উড়িয়ে দিলেন। কবীর দাসের একটা নামকরা দোঁহা আছে, সাধু এইসা চাহিয়ে যেইসা সুখ সুভায়, সাধু কেমন হবে? কুলোর মত হবে। যেগুলোর মধ্যে সার বস্তু আছে সেই জিনিসটা কুলোর মধ্যে থাকবে, যেমন গম, গমটা থাকবে কিন্তু বাকি কুটোকাটা, ভুষো যা কিছু থাকবে সেগুলোকে উড়িয়ে দেবে। এই দোঁহাতে কবীর দাস ঠাকুরের কথাটাই যেন বলতে চাইছেন – ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। সাধু বস্তুকে ধরবে অবস্তুকে সরিয়ে দেবে, নিত্যকে ধরে রাখবে অনিত্যকে ছেড়ে দেবে। ঠাকুর সন্ত-মহাত্মা-ঋষি সবার থেকে আলাদা। এই যে বিরাটা হিন্দু ধর্ম, সেখানে যত অবস্তু আছে, সেগুলোকে তিনি ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিলেন, হিন্দু ধর্মের যত সার জিনিস আছে, সেগুলোকে ধরে রেখে দিলেন। তার মানে, বেদ থেকে শুরু করে, চৈতন্যচরিতামৃত, সুরদাস, তুলসীদাস পর্যন্ত হিন্দু ধর্মে যত গ্রন্থ এসেছে, প্রত্যেকটি গ্রন্থই সত্য, ঠাকুর কোথাও বলছেন না, এর মধ্যে কোন একটা গ্রন্থ ভুল। কেউ যদি কোন একটা গ্রন্থকে ধরে এগিয়ে চলে যায়, তাতেই হবে। কিন্তু ঠাকুর আবার এটাও দেখাচ্ছেন শাস্ত্রে কিভাবে চিনিতে বালিতে মিশে আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দিতে হয়। কথামৃতে এমন এমন কথা আসবে পরে আমরা দেখব, যেমন বলছেন, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হয়। একটা জিনিস সেটা ঠিক কিনা, সেটা চলবে কিনা, ঠাকুর দেখে পাশ করে দেবেন। ঠাকুর যদি বলে দেন, এটা ঠিক, তাহলে ওটা ঠিক, এরপর আর কোন আপত্তি, কোন ওজর, কোন কিছু চলবে না।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে গত এক মাসে অক্সফোর্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথম্যাটিক্সে পোস্ট ডক্টরাল করে একজন যুবক জয়েন করেছে। আরেকজন কিছু দিনে আগে বিদেশে এ্যপ্লায়ড ফিজিক্সে পোস্ট ডক্টরাল করে এখানে জয়েন করেছে। সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, সাতাশ আটাশ হবে। দেখে অবাক লাগে, একজন বি.টেক করার পর এমটেক, পিএইচডি করে অক্সফোর্ড থেকে পোস্ট ডক্টরেট করে সোজা সন্ন্যাসী। আরেকজন এমএসসি করে, পিএইচডি করে, বিদেশ থেকে পোস্ট ডক্টরেট করে সন্ন্যাসের পথে চলে এলেন। আগেকার দিনে যে এই ধরণের সন্ন্যাসী হত না, তা না, কিন্তু বর্তমান কালে বিশেষ করে ঠাকুরের জন্য আমাদের শাস্ত্রের কথাগুলো সত্য হয়েছে। দেখে মনে হয়, ঠাকুর আর কিছু করুন আর না করুন, আমাদের যে ধর্মশাস্ত্র এটা সত্য, এটাকে এমন আক্ষরিক ভাবে রেখেছেন, আর এটা যে আমাদের কাছেই সত্য তা না, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য সত্য। আবদুল সালাম পাকিস্থানের নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনিও নিজের ধর্মকে মানতেন, কিন্তু নিজের ধর্মকে মানা আর ধর্ম সত্য জেনে সব কিছু ত্যাগ করে সেই সত্যের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার মধ্যে বিরাট তফাৎ।

ঠাকুর অবতার, তিনি এসে আক্ষরিক ভাবে দেখালেন ধর্ম সত্য। বলে যে, মলয়ের বাতাস যখন চলে তখন সব গাছ চন্দন হয়ে যায়, যদিও এটা একটা আখ্যায়িকা। তাতেও বলছেন যে, যে গাছে একটু সার বস্তু আছে সেই গাছই চন্দন হয়, কিন্তু কলাগাছ, বাঁশ গাছ হবে না। যাঁরা ঠাকুরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, ঠাকুরকে মানতে পারছেন না, বুঝতে হবে এরা সারবিহীন বৃক্ষ। সারবিহীন বৃক্ষ বলে যে তাঁকে নিন্দা করতে হবে, তাও না, কারণ সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস, যেটা উভয় দিক থেকে চলে। বাড়িতে ছোটদের শেখানো হয়, আমাদের পরিবারের এই রীতি, আমরা পরিবারের কাউকে তুই বলে ডাকি না, আমরা বড়দের সম্মান দিয়ে কথা বলি, এই ধরণের নানা রকমের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি এই সমাজে যাঁরা ঠাকুরের কথা জানেন, ঠাকুরকে ভক্তি করেন, তাঁদের দায়ীত্ব হল, যাঁরা ঠাকুরের কথা জানেন না, তাঁদেরকে ঠাকুরের কথা জানিয়ে দেওয়া। শুধু জানিয়ে দেওয়া, বাকিটা তাঁর ইচ্ছা, ঠাকুরের সৃষ্টি তিনিই দেখবেন, আমাদের যতটুকু করার করলাম।

আমাদের কত সৌভাগ্য যে ঠিক এই সময়েই আমরা জন্ম নিয়েছি। ঠাকুরের সময় যদি জন্ম নিতাম, ঠাকুরের কথা জানতেই পারতাম না, জানলেও যে বিশ্বাস হত কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কথামৃতে, লীলাপ্রসঙ্গে আমরা অনেক ঘটনার বর্ণনা পাই। কলকাতা ও তার আশেপাশে তখন লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরা ঠাকুরকে বিশ্বাসই করত না, মানতও না। বরঞ্চ ঠাকুরের সন্তানদের রাস্থায় দেখলেই বলত, পরমহংসের দল চলে প্যাঁক্ প্যাঁক্। পরমহংস মানে হাঁস, হাঁসের চেলারা যাচ্ছে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে। বর্তমান কালে আমাদেরও ছাড়ে না, আমরাও যখন ট্রেনে বাসে যাই, আমাদেরকেও অন্য ভাবে ব্যঙ্গ করে। আবার অনেকে সম্মানও করে। বর্তমান কাল হল এন্টারটেইনমেন্টের যুগ, একমাত্র যারা এন্টারটেইনার তারাই এই যুগে সুপ্রিম। এখন চাকা ঘুরে গেছে, আগেকার দিনে সমাজে যাদেরকে কোন সম্মান দেওয়া হত না, তারাই আজ সম্মান পাচ্ছে, তারাই সমাজের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্য এখন ঈশ্বর, অবতার, অধ্যাত্ম, ধর্ম এই ধরণের কথাগুলো নেওয়া কঠিন। এমনিতেও সার জিনিসকে গ্রহণ করাটা খুব কঠিন। অনেক দিন যদি এই লাইনে না লেগে থাকে, অনেক দিন ধরে না ঘষলে সার জিনিস গ্রহণ করার ক্ষমতা তৈরী হয় না। বাড়িতে যদি একটা পরম্পরা থাকে, আর বাচ্চা বয়স থেকে যদি ট্রেনিং থাকে, তার সাথে ঠাকুরের খুব কৃপা হলে তবেই কেউ ঈশ্বরীয় কথা নিতে পারে। ভোগবিলাস, ছ্যাবলামো, নোংরামো এই জিনিসগুলি যখন যে সমাজে ঢুকে গেছে, সেই সমাজের পক্ষে ঈশ্বরীয় কথা নেওয়া খুব কঠিন। আজ থেকে তিরিশ, পঞ্চাশ বছর আগেও ভারতে যে পরিবারগুলি ছিল, তাদের এমন সংস্কার ছিল, যে সংস্কার সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রাখত। কিন্তু এখন সব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে, তাই ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা এদের পক্ষে নেওয়া খুব কঠিন হয়ে গেছে।

কথামৃতে খুব objectively তাকালে দেখতে পাবেন, কথামৃতের পাতায় পাতায় শুধু একটাই কথা, ঈশ্বর সত্য। আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তি কালের স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয় আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? ঠাকুর তাঁকে বললেন, আমি দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি। কথামৃত পড়ার সময় প্রথম অনুভূতি ঠিক এটাই হয়, শুধু তিনি যে ঈশ্বর দেখেছেন তাই না, ঈশ্বর কি, ঈশ্বর কতটা সত্য, এটাকে একেবারে পরিষ্কার করে আমাদের সামনে রেখে দিচ্ছেন। আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, সেটা আমাদের দুর্বলতা, আমাদের মধ্যে সেই ক্ষমতা নেই বলে পারছি না। কিন্তু এটা মনে হয়, যদি চেষ্টা করি আমরাও পারব। বেদ, উপনিষদ পড়ার সময়, আমরা সন্ন্যাসীরা এখনও যখন বেদ উপনিষদ পড়ি, মনে হয় যেন অনেক দূরের, হ্যাঁ আমাদের ঋষিরা ছিলেন, তাঁরা সাধনা করতেন, ভাল; আমাদের কি সৌভাগ্য এই রকম ঋষিদের মাটিতে জন্ম নিয়েছি, এই রকম বংশে জন্ম নিয়েছি, এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কথামৃত পড়ার সময় সেটা হয় না, আরে এই জিনিস তো আমার হাতের মুঠোয়, চেষ্টা করতে গেল যে পারব না জানি।

আগেকার দিনের বড় বড় মিউজিশিয়ানরা, বেটোফেন, মোজার্ট এনারা মিউজিকের নোটেশানগুলি লিখতেন, ফলে যে কোন লোক ওটা দেখে বাজিয়ে দিতে পারত। এখন ধরুন একজন বাজাতে জানেন, কিন্তু স্ক্রিপ্টগুলি সব হারিয়ে গেছে। হঠাৎ কেউ ওর পুরোটাই খুঁজে পেয়ে গেল, এবার সে আনন্দে নাচতে শুরু করে দেবে, নোটেশান দেখে পুরো মিউজিকটাই দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে, কারণ পুরো স্ক্রিপ্টাই পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ বাজাতে গেলে হয়ত বাজাতে পারবে না, বাজাতে গেলে তার পক্ষে কঠিন হবে ঠিকই, সেটা আলাদা জিনিস; কিন্তু যে জিনিসটা অসম্ভব ছিল, হতে পারে না, সেটা হঠাৎ সম্ভব হয়ে গেল। বেদ, উপনিষদ যেন হারানো স্পিরিচুয়ালিটি, হ্যাঁ আমাদের এগুলো ছিল, আমাদের পূর্বজরা এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করতেন, আমরাও তার কিছু কিছু পালন করি, বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ পূজা করি, এর বেশী না। কিন্তু কথামৃত পড়ার পর সে-রকম কিছু মনে হয় না, শুধু মনে হয় সবটাই সত্য।

আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে যে কথাগুলো আছে, এগুলোকে অনেক সময় প্যাটার্নে ফেলা যায় না। যেমন পুরাণে এক রকম কথা বলছেন, স্মৃতিতে আরেক রকম কথা বলছেন, তন্ত্রে আবার অন্য রকম কথা বলছেন, কেমন যেন খাপছাড়া লাগে। ঠাকুর সবটাই নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিনা, আর সবটাকে একটা জায়গাতে নামিয়ে রেখে দেওয়া হল, ফলে একবার পড়ে নেওয়ার পর কোন কিছুকেই আর খাপছাড়া বলে মনে হয় না। নিজের থেকে যদি কথামৃত পড়েন তাহলে অতটা খাপছাড়া লাগবে না যতটা বেদ উপনিষদ পুরাণ নিজে থেকে পড়লে মনে হবে। অনেকে চেষ্টা করছেন বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, পুরাণকে এক জায়গায় নিয়ে আসার, কিন্তু বোঝা যায় যে পুরোপুরি এক জায়গায় নিয়ে আসা যাচ্ছে না, কারণ যাঁরা এই কাজগুলো করছেন, তাঁরা সেই ভাবে প্রত্যক্ষ করেননি।

হিন্দু ধর্মের এই যে বিশাল আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি বিভিন্ন শাস্ত্রে, সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই হিন্দু ধর্মের সব কিছুকে তিনজন তিনটি যুগসন্ধিক্ষণে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। প্রথম এক জায়গায় নিয়ে এলেন ব্যাসদেব। পরে সেখান থেকে আবার হিন্দু ধর্মের সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে শুরু করল। দ্বিতীয় এলেন শঙ্করাচার্য, তিনিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া হিন্দু ধর্মের সব কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। তৃতীয় বার হিন্দু ধর্মের শুদ্ধ অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলিকে একটা জায়গায় নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। আবার এখান থেকে নূতন নূতন ভাবধারা, নূতন নূতন মত বেরোবে। ভবিষ্যতে আবার নূতন কোন অবতার আসবেন, তিনিও আবার ওটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসবেন। কারণ যত মন তত রকমের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধিগুলো অনেক সময় সাধারণ স্তরে হয়, কিন্তু বিশেষ মন যদি হয়, তখন আধ্যাত্মিক উপলব্ধিটাও বিশেষ হবে, অর্থাৎ গভীর হবে। আর সব উপলব্ধিই যে আগের আগের ঋষিদের উপলব্ধির সাথে কাঁটায় কাঁটায় মিলবে, সে রকম কিছু নয়। ঈশ্বর অনন্ত, তাই তাঁর উপলব্ধিও অনন্ত।

যাঁরাই সাধনা করেন, তাঁরা আগে যে কথাগুলো ছিল তার থেকে আলাদা দেখেন। যখনই আলাদা দেখছেন, তখন ওটা যেন একটা নূতন অনুভূতি হয়ে যাচ্ছে। আর যখন বিশেষ ভাবে আলাদা দেখছেন, তখন ওটা বেদ হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য বেদের রচনা এখনও হয়ে চলেছে, সেই স্তরের ঋষি হলে নূতন বেদ আসবে। তবে আমরা টেকনিক্যাল যে অর্থে বেদ বলি, সেই অর্থ ওটাকে আমরা বেদ বলতে পারব না। স্বামীজী বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের যে নিয়মাবলী দিয়ে গেছেন, তাতে তিনি বলেছেন, পরে পরে আমাদের ভাইয়েরা যদি নূতন নূতন আধ্যাত্মিক সাধনার পথ বার করেন, সেটাকেও ঠাকুরের অনুমোদিত মনে করেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের এখানে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বেদ, ঠিক তেমন যত নূতন পথ বেরোবে সেটাকেও ঠাকুরের পথ বলেই মনে করতে হবে। তার মানে আমাদের মধ্যে কোন গোঁড়ামি নেই।

ইদানিং কালে প্রায়ই দেখা যায়, একজনকে দাঁড় করিয়ে বলে দেওয়া হল, ইনি একজন অবতার। আবার কিছু দিন পর আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে বলে দিল, ইনি অবতার। ইনি অবতার কিনা খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে। অবতারের প্রথম যেটা দেখার, সেটা হল তিনি ধর্মকে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তিনি যে নিজে একজন সন্ত-মহাত্মা, তা না। অবতারের শক্তিটাই আলাদা হবে, ওটা আধ্যাত্মিক শক্তি, স্পর্শ মাত্রেই তিনি মানুষের জীবনকে পাল্টে দিতে পারেন। এটাকেই এখন সবাই নকল করতে শুরু করে দিয়েছে। দর্শন করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাড়া করা কিছু লোক আছে, তাদের ছুঁয়ে দিলেই তারা আনন্দে নাচতে শুরু করে দেয় আর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোও বিশ্বাস করে নেয়।

যাই হোক, তখন আমরা বলছিলাম, আমরা ঠাকুরের সময় এলে ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না, কারণ তখন আমাদের মধ্যে সার থাকত না। আর এমন দূরেও পাঁচশ বছর কি ছশ বছর পরেও জন্মায়নি, যখন জন্মালে এগুলোকে গালগল্প বলে মনে হত। যত বড় সন্ত-মহাত্মা হন, কিছু দিন পরে তিনি যে অনুভূতিগুলি করেছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে, সেগুলোকে গালগল্প বলেই মনে হবে। কাউকেই ছাড়া হয়নি, আর কাউকে ছাড়াও হবে না, যীশু হন, মহম্মদ হন, ভগবান বুদ্ধ হন, নিন্দা সবাইকে নিয়েই করা হয়। কিছু দিন গেলে ঠাকুরেরও নিন্দা হবে, তখন মনে হবে, কে জানে এগুলো কেউ মনগড়া কথা লিখেছে কিনা। কিন্তু আমরা এমন একটা জায়গায় আছি মনে হয়, এই তো সেদিন ঠাকুর ছিলেন, আমাদের কত পরিচিতরাই তাঁকে দেখেছেন। আবার এতটা দূরে জন্ম নিয়েছি, যেখানে এসে দেখছি ঠাকুরের ভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। সাধারণ যাঁরা মহাত্মা হন, নিজেদের যাঁরা অবতার বলে প্রচার করেন, দেখা যায় জীবিত অবস্থাতেই তাঁর অনেক বদনাম হয়ে যায়, অনেক দুর্নাম রটে যায়; আর তা নাহলে, মারা যাওয়ার কিছু দিন পর দেখা যায় লোকেদের মন থেকে তিনি হারিয়ে গেছেন। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।

আমরা যে সব সময় ঠাকুরের অনুভূতির কথা বলছি, ঠাকুর এই অনুভূতি করেছেন, ওই অনুভূতি পেয়েছেন, বা অনেক সময় ভুল করে আমরা বলে থাকি, ঠাকুর এই জ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই জ্ঞান ঠাকুরের নয়, এগুলো সব চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্য, আগে আগে এই জ্ঞান ঋষিরাও উপলব্ধি করেছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে এই উপলব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ ছিল, কিন্তু আমরা জানতাম না এগুলো কতটা সত্য, কতটা সাহিত্য, কতটা কবিতা, কতটা কি, ইত্যাদি। ঠাকুর এসে দেখালেন এগুলো কিভাবে সবটাই সত্য। এই যে সত্য, আর এই সত্যকে অপরকেও সঞ্চারিত বা প্রেরিত করা যায়। সেইজন্য যে পরম্পরায় আমরা সত্যটাকে পাচ্ছি, এটাকে ধরে রাখার জন্য দরকার খুব উচ্চমানের শিষ্য। গীতা ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন, উত্তম শিষ্য হলে তবেই বিদ্যা প্রচার প্রসার পায়। যখন বেদে বলছেন, *বেদাহং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসাপরস্তাদ্, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা*, এটা একজন ঋষি অনুভাব করেছেন। তিনি ধ্যানের গভীর থেকে উত্থিত হয় উদাত্ত কন্ঠে তাঁর অনুভূতির কথা বলছেন যাতে দুটো উত্তম শিষ্য হয়ে যায়, যাতে তাঁর এই উপলব্ধ সত্যটা লিপিবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে। কিন্তু ঠাকুর ঠিক ঋষি পরম্পরার মধ্যে আবদ্ধ নন। যদিও ঠাকুর অন্যান্য ধর্মের যেমন ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মেরও সাধনা করেছিলেন, সেটার বিস্তারে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু হিন্দু ধর্মে যা আছে এটা যে সত্য, আর শুধু সত্য না, বৃহৎ সত্য, এটাকে তিনি প্রমাণিত করে দিলেন।

আমাদের শাস্ত্রে প্রমাণ শব্দের অর্থ হল, method of knowledge, যেটা দিয়ে আমরা জানতে পারি। তার মধ্যে একটা শব্দ হল, শাস্ত্র প্রমাণ, শাস্ত্র প্রমাণ মানে, শাস্ত্র দিয়ে জানা। আচার্য শঙ্কর শাস্ত্র প্রমাণের উপর খুব জোর দিতেন। ধর্মের ব্যাপারে শাস্ত্র প্রমাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার এল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ। আমরা অনেক সময় বলি, তুমি এই রকম দেখেছ? কি প্রমাণ? ঠিক তেমনি, ধর্ম যে সত্য কি প্রমাণ? শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ। আপনি বলবেন, আমি মানি না। মানছেন না ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে ঠাকুরের জীবনীটা একবার খুলে দেখুন। দেখার পর, আপনার ভিতরে যদি একটুও সারবস্তু থাকে,

তাহলে বলবেন, হ্যাঁ রামকৃষ্ণ প্রমাণ। আর সারবস্তু যদি না থাকে, স্বভাবেই যদি নিন্দুক হন, তাহলে তো ভগবানও এসে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারবেন না। এগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না।

এবার এই প্রমাণটা ঠাকুরের মধ্যে থেকেই যেন হারিয়ে না যায়, সেইজন্য এবার দরকার একটা শিষ্য পরম্পরা, এমন এক পরম্পরা, যাতে এই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ, শাস্ত্র প্রমাণ, এটা যেন চিরস্থায়ী ভাবে থেকে যেতে পারে। এসে গেলেন ঠাকুরের দুই দিকপাল শিষ্য, একজন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ রূপে নূতন ধারার এক সাহিত্য দিলেন, আরেকজন এলেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি শ্রীম রূপে আরেকটি ধারার সাহিত্য দিলেন।

রামকৃষ্ণ প্রমাণ, এর অর্থ হল, ঠাকুর সব রকম সাধনা করে প্রমাণিত করে দিলেন যত শাস্ত্র আছে, যত ধর্ম আছে, সব সত্য। অনেক আগে আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, খুব নামকরা মহারাজ, উনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'তুমি কিছু লিখতে শুরু করো'। তখন আমি ব্রহ্মচারী, বয়স কম, যদিও ওনার বলার অনেক বছর পর আমি লিখতে শুরু করলাম। ওনাকে শুধু একটা কথাই বললাম, 'কি লিখব মাথায় আসে না'। তখন উনি বলছেন, 'তুমি লেখ, Relevence of Sri Ramakrishn in my life'। উনি তখন ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝালেন, যেমন ধর হিমালয় পাহাড় আছে, হিমালয় নিজের মত আছে, সেখান থেকে নদী গুলি বেরিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের কত উপকার হচ্ছে। কিন্তু হিমালয় হিমালয়। আমরা যদি অন্য একটা উপমা নিই, আমেরিকাতে বিল গেটস্ আছেন, তাঁর নাকি প্রচুর টাকা। তাতে আমার কি। আপনি তাঁর যত তথ্য জেনে নিন, তাঁর বায়োগ্রাফি জেনে নিন, তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স জেনে নিন, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আমরা যেভাবে ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করি, বলতে খারাপ লাগছে, ইয়ং ছেলেরা আজকাল বিল গেটস্, স্টিভ জকস্, এদের কথা যেভাবে খবর রাখে, আমরাও কিন্তু ঠাকুর, স্বামীজীকে ওই ভাবেই নিই। শুধু একগুচ্ছ ইনফরমেশান। Relevance মানে হল, ঠাকুর ছিলেন, তাঁর অনেক উপলব্ধি হয়েছে, তাতে আমার কি এলে গেলো? কুবের রাজার অনেক ধনরত্ন আছে, তাতে আমার, তিনি তো আমাকে এক পয়সাও দেবেন না, বিল গেটসও আমাকে একটা পয়সা দেবেন না। মহারাজ বলতে চাইছেন, এই জিনিসটাকে নিয়ে কেউ আলোচনাও করে না, কেউ লেখালেখিও করে না। মহারাজের কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর আমি ভাবতে শুরু করলাম। অনেক পরে গিয়ে আমার জিনিসগুলো পরিষ্কার হল, কিন্তু এখনও আমার লেখাটা হয়নি।

কিন্তু এর মধ্যে একটা যেটা Relevance আমার কাছে বড় মনে হয়েছিল, সেটা হল, পড়াশোনা করতে গিয়ে বা ক্লাশ নিতে গিয়ে যখনই উপনিষদের, গীতার কোন মন্ত্র পাই বা যোগদর্শনের কোন সূত্র পাই, তখন প্রথমেই আমার মাথায় আসে, ঠাকুর এই মন্ত্রকে এই ভাবে দেখেছিলেন। তার মানে শাস্ত্র যে কিভাবে সত্য সেটা ঠাকুরের জীবনের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার পর স্পষ্ট হয়ে যায়। ঠাকুরের Relevanceএর একটা পয়েন্ট বললাম। শাস্ত্রের যে সার্থকতা, তার যে সত্যতা, এটা আমার কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। যদি ঠাকুরের জীবনী জানা থাকে, কথামৃত ভাল ভাবে জানা থাকলে শাস্ত্র পড়ার সময় দেখবেন কেন স্বামীজী বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন living commentry, আচার্য শঙ্কর যেমন ভাষ্য রচনা করে শাস্ত্রের একটা অর্থ বার করার চেষ্টা করছেন, তার সাথে তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাটাও করছেন, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন living commentry, যেটা সত্য সেটাই তিনি করছেন।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ভাগবতের রাসলীলা আমরা ছোটবেলা থেকে জানি। লোকেরা ওটাকে নোংরা অর্থে ব্যবহার করে। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের লীলাপ্রসঙ্গে মধুর ভাবটা পড়ার পর রাসলীলা জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ওটাকে নিয়ে আরও গভীরে যাওয়ার পর দেখছি, রাসলীলা তো পুরো অন্য জিনিস, তার মানে মহারাজ কত গভীরে নিয়ে গিয়ে বলছেন। তেমনি ঠাকুর যখন মধুর ভাবে সাধনা করছেন, তখন সেটা কি উচ্চমানের সাধন ছিল ভাবাই যায় না। গীতগোবিন্দে

কবি জয়দেব রাধাকৃষ্ণের এই মধুর ভাব নিয়ে কত সুন্দর কথা লিখলেন। তার যে ভাব, কিভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের স্বামী রূপে দেখছেন, রাসলীলার ভাব নিয়ে গভীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। ভাগবতে যে রাসলীলার বর্ণনা, সাধনা রূপে এটা যে আক্ষরিক সত্য, এটা আমরা ঠাকুরের কাছে শিখেছি। অন্য কেউ রাসলীলার ভাব নিয়ে কিছু করলে আমাদের কাছে পাগলামো, বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে হবে, কিন্তু ঠাকুরের কাছে এগুলো আর কিছুই মনে হয় না। ঠাকুরের সময় যাঁরা ঠাকুরকে দেখেছিলেন, ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখে তাঁরা ঠাকুরকে পাগল মনে করতেন। আমরাও ঠাকুরের কিছু জিনিস দেখলে আমাদের কাছে ঠাকুরকে পাগল মনে হবে। কিন্তু সামগ্রিক ছবিটা নিতে পারলে তখন পুরো জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, অবাক হয়ে ভাবব, এতো পুরো অন্য জিনিস। এই যে relevance, ঠাকুরের জ্ঞান লাভ হল বলাটা যেন অনেক ছোট হয়, ঠিক ঠিক ভাবে বলতে গেলে একটাই বলা যেতে পারে, তিনি শাস্ত্রকে প্রমাণিত করে দিলেন। নারদ ভক্তিসূত্রে এই কথাই বলছেন, এনারা শাস্ত্রকে সৎ শাস্ত্র বানিয়ে দেন।

যাই হোক, এবার এই শাস্ত্র প্রমাণকে শিষ্যদের দিতে হবে। আমরা জানি ঠাকুরের ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্য, তাঁদের সাথে আরও অনেক গৃহী শিষ্যরা এলেন। লীলাপ্রসঙ্গে আমরা দেখি, দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ির ছাদে উঠে তিনি চিৎকার করে ডাকতেন, ওরে আমার ত্যাগী ভক্তরা কে কোথায় আছিস আয়। তারপর এক এক করে ভক্তদের আগমন হতে শুরু হল। নরেনও ঠাকুর কাছে আসতে শুরু করলেন। নরেন তখন এক অতি সাধারণ ছাত্র। আমরা যতই ওটাকে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করি না কেন, বাহ্যিক দিক থেকে যদি আমরা ভাল করে দেখি, সেই সময় নরেনের মত ছেলে কলকাতায় শত শত ছিল। তাঁর যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য, তাঁর যে বাহ্যিক আচার ব্যবহার, তাঁর দুষ্টুমির স্বভাব, এই রকম ছেলে কলকাতা শহরে প্রচুর দেখা যেত, এখনও দেখা যায়। কিন্তু তাঁর ভিতরে একটা অন্য জিনিস ছিল, আর পরে কথামৃতে যেটা আমরা পাই, ঠাকুর নিজেই বলছেন, সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে তিনি নরেনকে নিয়ে এসেছিলেন। সত্য যেটাই হোক, ঠাকুরের ভিতরে আধ্যাত্মিক ভাব কি আমরা তো আর সেভাবে জানি না, এটা জানছি যে, ঠাকুর নরেনকে সঙ্গে করে এনেছেন। নরেনের সাথে ঠাকুরের মিলন হল। এরপর আপনি পরিবর্তন বলুন, বা আধ্যাত্মশক্তির অনাবরণকরণ বলুন, যার যে রকম আধ্যাত্মিক ভাব, সে সেই ভাবানুসারে বলবেন। যিনি বলবেন, নরেনকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে আনা হয়েছে, তাহলে ঠাকুর নরেনের আধ্যাত্মিক শক্তিকে অনাবৃত করছেন। আর যদি মনে করেন, নরেন একজন যোগী, জন্মজন্মান্তর সাধনা করে ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তাঁর এবার transformation হচ্ছে। যেভাবেই নিন না কেন, কারুর কোন অসুবিধা নেই। এখন নরেন যে মন ও বুদ্ধির শক্তি নিয়ে এতদিন চলছিলেন, transformed হয়ে যাওয়ার পর এবার তিনি চৈতন্যের শক্তিতে চলতে শুরু করলেন। আমাদের ভিতরে যে চৈতন্যের শক্তি, আত্মার যে শক্তি, আত্মার যে জ্ঞান, সেটাই খুব গভীর ভাবে বা আলোছায়া রূপে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বেরোয়। সাধনা করে ঘষে মেজে যখন মন, বুদ্ধিকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, তখন ভিতরে আত্মার যে শক্তি আছে, সেটাই বাইরে ফেটে পড়ে। একটা লণ্ঠন কোন দিন সার্চলাইট হতে পারবে না, কিন্তু একটা সার্চলাইটের উপর একটা আবরণ দিয়ে ওর আলোটাকে লণ্ঠনের আলোর মত করে দেওয়া যায়। এবার যে সার্চলাইট, যার থেকে আলোটা লণ্ঠনের আলোর মত বেরোচ্ছে, আবরণগুলি এক এক সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সবাই দেখছে, ওরে ব্বাস্ কত আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর যদি চটপট করে আবরণ গুলি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সবাই অবাক হয়ে ভাববে, আরে এতো লণ্ঠনের মত আলো দিচ্ছিল, সার্চলাইট কি করে হয়ে গেল? নরেন হলেন সেই সার্চলাইট। শুধু নরেন না, প্রত্যেক মানুষই এক একটা সার্চলাইট। আমি, আপনি, আমরা সবাই তাই, আমাদের উপর আবরণটা পড়ে আছে আছে বলে কখন লণ্ঠন, কখন মোমবাতির মত এত ক্ষীণ আলো বেরোয় যে, চোখেই পড়ে না।

সেই সময় ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছালেন মাস্টারমশাই, মহেন্দ্রনাথ দত্ত। মাস্টারমশাই আসার আগে থেকেই ঠাকুরের কাছে গৃহী ভক্তরা আসছিলেন। গৃহী ভক্তরা অবাক হয়ে ঠাকুরের কথা শুনতেন। অনেকেই বাড়িতে ফিরে ঠাকুরের কথাগুলো স্মরণ করে লিখে রাখতেন। কথামৃতের প্রেক্ষাপটকে নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ, প্রচুর লেখা আছে, কথামৃতের সাথে অন্যান্য গৃহী ভক্তদের লেখা বিভিন্ন বই নিয়েও অনেক গবেষণামূলক লেখা আছে। গিরিশ সেন নামে একজন গৃহী ছিলেন, উনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন, তিনি ঠাকুরের কথাগুলো সংগ্রহ করে একটা বই লিখেছিলেন। গিরিশ সেন ছাড়া, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন, রামচন্দ্র দত্ত লিখলেন, তার সাথে ঠাকুরের মানসপুত্র রাখালও ঠাকুরের কথাগুলোকে সঙ্কলন করে একটা বই লিখলেন। এই চারটে বই খুব নামকরা, কিন্তু সবাই লিখছেন – পরমহংসদেবের উপদেশ। ওনারা যে কথাগুলো শুনছেন, তার মধ্যে যে কথাগুলো ভাল লাগছে, সেগুলোকে তাঁরা নোট করে রাখছেন।

এই ধরণের কিছু বই ছাড়া, তৎকালীন সংবাদপত্রে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লেখা, তাঁর উপদেশাবলী ছাপা হচ্ছিল। আমরা যদি লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃতকে সরিয়ে রেখে শুধু যদি ১৮৮০ সালে থাকি, ইণ্ডিয়ন মিরর বা অন্যান্য সংবাদপত্রে যে লেখালেখি শুরু হয়েছিল আর আগে যে বইগুলির কথা বলা হল, ছোট ছোট কয়েকটা উপদেশাবলীকে নিয়েই থাকতাম, তাহলে ওই দিয়ে মানুষের উপর ঠাকুরের খুব একটা প্রভাব পড়ত না। পড়ে মনে হত, একজন ভাল মানুষ এসেছিলেন, ভাল ভাল কিছু কথা বলেছেন, এই পর্যন্ত। মহাভারত লেখার সময় ব্যাসদেব বললেন, তিনি এমন ভাবে মহাভারত রচনা করবেন যে, তিনি দ্রুত সব শ্লোক বলতে থাকবেন, কেউ সেটাকে কলম চালিয়ে দ্রুততার সাথে লিখে নেবে। কিন্তু অত দ্রুততার সাথে কারুর কলম চলবে না। সেইজন্য আরাধনা করে গণেশকে আনা হল, কারণ গণেশই পারবেন ব্যাসদেবের গতিকে সামলাতে। গণেশ আবার শর্ত আরোপ করে দিলেন, আমার কলম যেন না থামে। ব্যাসদেবকে তো সামান্য একটু চিন্তা করার সময়ে দিতে হবে, গণেশজী অতটুকু সময়ের জন্যও কলম থামাতে রাজী নন। ব্যাসদেব সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য তৈরী করলেন কূট শ্লোক। গণেশকে বলে দিলেন, আপনি মশাই আমার শ্লোকের অর্থগুলি বুঝে তারপর লিখবেন, না বুঝে দুমদাড়াক্কা লেখা যাবে না। এই ঘটনার সাথে কোথাও যেন কথামৃতের একটা মজার সম্পর্ক পাই। ঠাকুর অনেক কথা বলছেন, কথামৃতকার শুনে যাচ্ছেন, আর থেকে থেকে ঠাকুর শুধু ওনার দিকে তাকিয়ে বলছেন, ওটা তুমি বুঝেছ? যদি বুঝতেন, কথামৃতকার ওটা বোঝেননি, তিনি আবার শুধরে দিয়ে বলতেন, না ওই রকম না, এই রকম হবে।

Coincidence আর corelation দুটো আলাদা জিনিস, প্রথমটা হল কাকতালীয় ব্যাপার, কিভাবে লেগে গেছে জানা নেই, আর পরেরটা হল কার্য-কারণের সম্পর্ক, এটার জন্য এটা হয়েছে। আমরা যদি গায়ের জোরে বলি, যেভাবে ব্যাসদেবের গণেশ ছিলেন, ঠিক সেই ভাবে ঠাকুরের মাস্টারমশাইর সাথে একটা coincidence ছিল। কিন্তু মূল কথা হল এই বুঝে লেখার ব্যাপারটা। যখন অবতার বা কোন সিদ্ধ পুরুষের কথা যিনি লিখবেন তাঁকে খুব উচ্চমানের হতে হয়। এসব নিয়ে অনেক রকম লেখা হয়েছে, তার মধ্যে একটা হল, ঈশ্বরীয় শক্তিই যেন মাস্টারমশাইকে তৈরী করছিল। যাঁদের ইমোশান আছে, তাঁরা ওই ভাবে দেখেন। আমাকে আপনাকে সবাইকে ঈশ্বরের শক্তিই তো তৈরী করছেন। কোথাও দেখা যাবে না যে, ঠাকুর বলছেন, একে ঈশ্বর তৈরী করছেন, আর একে ঈশ্বর তৈরী করছেন না। সবাইকে ঈশ্বরই তৈরী করছেন। যখন কোন কিছু লেগে যায়, তখন আমরা এই রকমই বলি, ঠাকুর আমাকে তৈরী করছেন। এগুলো কিছু না।

ছাত্রাবস্থা থেকেই কোন ভাবে মাস্টারমশাইএর ডাইরি লেখার অভ্যাসটা ছিল। ঠাকুরের কাছে তিনি এলেন। প্রথম দিন কিছু আলাপচারী হল, বাড়িতে এসে তিনি ওটাকে ডাইরিতে নোট করলেন। তারপর থেকে যত দিন তিনি ঠাকুরের কাছে এসেছেন, বাড়ি ফিরে তিনি সব নোট করতে লাগলেন। এরপর যখন তাঁর সময় হত, তখন তিনি ডাইরির এক-একটা পাতা খুলে সেদিনকার পুরো দৃশ্যটাকে

মানসপটে দেখতেন। দেখার পর তিনি ওই দিনের পুরো ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে লিখতেন। যার জন্য তিনি যে বর্ণনাগুলি দিচ্ছেন, দক্ষিনেশ্বরের বর্ণনা, ঠাকুরের ঘরের বর্ণনা এবং অন্যান্য সব কিছুর যে বর্ণনা দিচ্ছেন, বর্ণনাগুলি এত গ্রাফিক বর্ণনা যে পাঠকের মনে হবে যেন তিনি সেখানে নিজে উপস্থিত হয়ে গেছেন, আশেপাশের প্রতিটি মানুষের সাথে যেন তাঁর একটা একাত্ম বোধ হয়ে যায়, আর মনে হয় পাঠক যেন ঠাকুরের সঙ্গেই আছেন, ঠাকুরের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একজন পাঠকের কাছে এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি। ঠাকুরও যেন জানতেন মাস্টারমশাই মায়ের এই কাজের জন্যই নির্দিষ্ট। ঠাকুরও মাঝে মাঝে মাস্টারমশাইকে একটু যেন যাচাই করে নিচ্ছেন – আচ্ছা সেদিনের কথাগুলো কেমন হল, আচ্ছা আমি কি বললাম? আপনি তখন এই কথা বললেন। আবার কোন সময় শুধরে দিয়ে বলছেন, না, ওটা ওই রকম না, ওটা এই রকম, এর অর্থ এই।

মাস্টারমশাইয়ের জীবনীতে আমরা যাচ্ছি না, ধরে নিচ্ছি তাঁর জীবনী মোটামুটি আমাদের সবারই জানা আছে। ওনার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। উনি ঘরে ধ্যানে বসে যেতেন, এখানে ধ্যান মানে ওই চিন্তনে চলে যেতেন। চিন্তনের গভীরে গিয়ে তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে একেবারে আক্ষরিক ভাবে, এমনকি ওই চিন্তনে ঠাকুরের চোখের পাপড়ি পড়াটাও তখন তাঁর কাছে সজীব হয়ে যেত। যতক্ষণ ওই দিনকার দৃশ্যটা পুরোপুরি সজীব হয়ে তাঁর মনের পর্দায় না ভেসে উঠত, ততক্ষণ উনি ওই চিন্তনে ডুবে থাকতেন। মাস্টারমশাই একদিন রাস্থায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর সেটা জানতে পেরেছিলেন। পরে দেখা হলে তিনি মাস্টারমশাইকে বললেন, অত রাত জেগে লেখালেখি করবে না। মাস্টারমশাই কখনই বলেননি যে উনি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে লেখেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করছেন। আবার অন্য দিকে আমরা মনে করি ঠাকুরের কাজের জন্য মাস্টারমশাই যেন নিজে থেকেই আধ্যাত্মিক ভাবে উজ্জিবীত। ঠাকুরের সন্তান স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, উনি শুনেছেন মাস্টারমশাই ডাইরি লেখেন, তাঁরও ইচ্ছা হল ঠাকুরের দৈনন্দিন কথাবার্তাগুলোকে লিপিবদ্ধ করবেন। একদিন ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে ঠাকুরের কথাগুলো শুনে যাচ্ছেন, ঠাকুর তাঁকে ধরেছেন, এই কাজের জন্য তুমি না, ওই কাজের জন্য আরেকজন ঠিক করা আছে। ঠাকুরের এই কথা শোনার পর, উনি এতদিন ধরে যা কিছু লিখেছিলেন, সব লেখাগুলিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলেন।

অনেক পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ একদিন মাস্টারমশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো অনেক দিন আগে এই ডাইরিগুলো লিখেছিলেন, এতদিন পরে এসে কি করে আপনি সেগুলোকে আবার উদ্ধার করছেন'? কারণ, উনি একটা একটা দিনের দৃশ্যকে ধরে লিখতেন, আর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওনার শরীর যাবার তিন মাস পর কথামৃতের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ডাইরিগুলো এখনও ওনার বংশধরদের কাছে রাখা আছে, যেগুলি পড়ে কিছু বোঝা যায় না। স্বামী চেতনানন্দ ও অন্য কয়েকজন এগুলোকে নিয়ে অনেক রিসার্চ করেছেন। দেখা যায় ডাইরির একটা দিনের পাতায় দুটি শব্দ মাত্র আছে, আর কথামৃতে সেই দিনকার বিবরণে দুটো পাতা হয়ে গেছে। স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও আরও তৎকালীন সন্ন্যাসীরা মাস্টারমশাইর সাথে দেখা করতে যেতেন। প্রভু মহারাজ তখন এটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত বছর পর কিভাবে আপনি একটা দুটো শব্দ থেকে ওই দিনের পুরো দৃশ্যটাকে পুনোরদ্ধার করছেন? পরে পরে সমালোচকরা যখন নিন্দা করতে শুরু করবে, তখন এই পয়েন্টসগুলিকে নিয়েই নিন্দা হবে। মাস্টারমশাই আবার এগুলোকে অন্ রেকর্ড রেখে দিয়ে গেছেন।

যাই হোক, উনি দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলছেন, প্রথম কথা বলছেন, একটা বিশেষ দিনের কথা যখন তিনি লিখছেন, তার আগে ডাইরিতে দেখে নিলেন কি হয়েছিল, কি কথা বলা হয়েছিল, একটা দুটো শব্দ দেখে নিলেন, দেখে নিয়ে তিনি ধ্যানে বসে যেতেন। ধ্যানের গভীরে কি হত, সেটা বলার জন্য তিনি প্রভু মহারাজকে বলছেন, 'আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা চল্লিশ বছর আগে হয়েছে, কিন্তু আমি যখন ওই ভাবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, তখন আমি সাক্ষাৎ দেখছি, ঠাকুর বলছেন, তাঁর সামনে কারা কারা বসে আছে সব দেখছি। তখন আমার কাছে সব কিছু এক্ষুণি হচ্ছে'। ভাব জগৎ সম্বন্ধে

একটা দুটো কথা আমাদের এখানে জেনে রাখা দরকার। কোন জিনিসকে নিয়ে গভীর চিন্তন করে করে কোন মানুষ যখন তাঁর অন্তর্জগতে চলে যান, ওখানে তখন একটা ভাবরাজ্য তৈরী হয়, ওই ভাবরাজ্যের যে সত্যগুলিকে তাঁরা যখন দেখছেন, তখন সেই সত্যগুলি অন্য ধরণের সত্য হয়। বহির্জগতের সত্য আর ভাবরাজ্যের সত্য পুরো আলাদা। অন্তর্জগতের যে সত্য, ভাব জগতের যে সত্য, সেখানে সময়ের প্রবাহ অন্য রকম, তার যে দূরত্ব সেটা পুরো অন্য রকম। সেইজন্য বহির্জগতের দিকে যাঁরা তাকিয়ে আছেন, তাঁদের কাছে মনে হচ্ছে এই ঘটনা চল্লিশ বছর আগে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁরা ওই চল্লিশ বছর আগের ঘটনাকে একেবার সাক্ষাৎ দেখছেন যেন সেই মুহুর্তে তাঁর সামনে ঘটে চলেছে। আর উনি যেমনটি দেখছেন তেমনটি লিখে রাখছেন।

যে সময় তিনি কথামৃত লিখতে শুরু করেন, সেই সময় শ্রীশ্রীমার শরীর ছিল। কয়েক পাতা লিখে মাস্টারমশাই গিয়ে মাকে শোনালেন, মা শুনে অবাক হয়ে গেলেন, মাস্টারমশাইকে বলছেন, ‘বাবা, ঠাকুরের কাছে যা শুনেছ সব সত্য’। আর স্বামীজী থাকতে থাকতেই কথামৃতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। স্বামীজী তো হতবাক। এখানে একটা বাক্য বলা দরকার, আমরা আগে যেটা বললাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা শ্রী রামচন্দ্র দত্তর, এনারা যেটা লিখেছিলেন, সেটা ছিল উপদেশ রূপে। মাস্টারমশাই কিন্তু প্রত্যেকটা দিনের দৃশ্যকে হুবহু তৈরী করে দিচ্ছেন, এটাই কথামৃতের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কেউ যদি মন শান্ত করে, নিষ্ঠা নিয়ে কথামৃত পড়েন, তাঁর মনে হবে যেন ওই শ্রোতৃমণ্ডলে তিনিও বসে আছেন, কথাগুলো যেন ঠাকুর তাঁকে বলছেন। কথামৃত পড়ার পর মাস্টারমশাইকে স্বামীজী লিখেছিলেন, ‘আমাদের ঠাকুর ছিলেন original, ঠাকুরের প্রত্যেক শিষ্যকে original হতে হবে, আপনার এই কাজ পুরো original’। Original হল, এটা একটা original style। কথামৃত হল একটা unique style, যেখানে মাস্টারমশাইও ঢুকছেন, পারিপার্শ্বিকতাও ঢুকছে, ঠাকুরও থাকছেন, ঠাকুরের কথাও থাকছে। যারা নিন্দুক তার পাঁচটা কথা বলতে পারে, যেমন গীতাকে নিয়ে বলে।

দেখতে গেলে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থগুলো ভগবান বুদ্ধের শরীর যাবার অনেক দিন পরে শিষ্যরা মিলিত হয়ে ওগুলো রেকর্ড করলেন। ইসলামে প্রফেট মহম্মদকে আল্লা যে কথাগুলো বলতেন, সেগুলোকে পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, সেই কথাগুলো দিয়ে রচিত হল কোরাণ। বাইবেলেও তাই, যীশুর অন্তর্ধানের অনেক বছর পর ওগুলো রেকর্ডিং হয়েছিল। এগুলো কিছু না, যে কোন শাস্ত্রকে নিন্দা করতে চাইলে নিন্দা করা যায়। স্বামীজী এক জায়গায় গীতার উপর বলতে গিয়ে বলছেন, গীতা যদি শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সংবাদ নাও হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না, কারণ এটা একটা thought processকে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরের কথামৃতের ক্ষেত্রে আমরা এই জন্য thought process বলতে পারি না, কারণ আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা evidences আছে। কথামৃত পড়ার পর যদি স্বামীজীর রচনাবলী পড়েন, তখন অবাক হয়ে দেখবেন, কথামৃতে যে কথাগুলো ঠাকুর বলছেন, একই কথা অন্য আকারে যেন স্বামীজী বলছেন। ঠাকুর থাকতে থাকতে যে বইগুলো শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ রূপে বেরিয়েছিল, সেখানেও একই কথা পাচ্ছি। আর ঠাকুরের সন্তান স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ রচনা করলেন লীলাপ্রসঙ্গ। লীলাপ্রসঙ্গের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, তার সাথে কথামৃত বলুন, কি এই বইগুলির কথা বলুন, কোন তফাৎ নেই। গীতাকে নিন্দা করে যখন বলা হয় গীতা authentic বই নয়, তখন আমরা এটাই বলি, মহাভারতের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আর গীতার যে দৃষ্টিভঙ্গী, দুটো এক। যদি গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত মনে করে গীতাকে যদি ফেলে দিতে চান, তাহলে আপনাকে মহাভারতকেও ফেলে দিতে হবে। কথামৃতকে যদি বলা হয়, এটা তো মাস্টারমশাইএর নিজের মন থেকে তৈরী, তাহলে স্বামীজীর রচনাবলী, লীলাপ্রসঙ্গ সবটাই ফেলে দিতে হবে। এভাবে ধর্মশাস্ত্র চলে না, সবটাই সত্য। এখন কোন কারণে এক আধটা ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে সামগ্রিক ঘটনায় বা মূল বক্তব্যে কোন প্রভাব পড়ে না।

পরের দিকে মাস্টারমশাই বলছেন, তিনি কোর্টে গিয়ে দেখতেন সাক্ষ্য কিভাবে দেওয়া হয়। তিনি দেখতেন, সাক্ষী যদি একটা কোন কিছু ভুল বলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে উকিল বলে দেবেন, হুজুর, এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করা যায় না। উনি সেইজন্য প্রাণপন চেষ্টা করে গেছেন, যাতে একটা কোন ভুল না হয়ে যায়। আবার অন্য দিকে এটাও দেখা যায় যে, লীলাপ্রসঙ্গে এক রকম কথা আছে, কথামৃতে আবার অন্য রকম কথা আছে। কথামৃতকার এটা কোথাও বলছেন না যে, আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক। উনি বলছেন, আমি যেটা শুনেছি, সেটাকে এভাবেই আমি উপস্থাপন করেছি। এখন যিনি বলেছিলেন, তিনি যদি ভুল বলে থাকেন, তাতে আমার কিছু বলার নেই। এই ধরণের অনেক কিছু নিয়ে বিতর্ক আছে, পরে গবেষণা করে আরও অনেক বিতর্কের বিষয় আবিষ্কার হবে, এগুলো আমাদের বিষয় না।

প্রথম দর্শন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এতটুকু আলোচনা করার পর আমরা এবার কথামৃত গ্রন্থের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। সমগ্র কথামৃতের আলোচনা করা সম্ভব না, তবে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই আমাদের লাভ। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮২ সালে মাস্টারমশাই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। অনেকে বলেন তারিখটা আসলে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ছিল। আমাদের কাছে তারিখের কোন গুরুত্ব নেই। তবে ১৮৮২ সাল মানে, অনেক দেরীতে মাস্টারমশাই এসেছেন, ঠাকুরের আর বেশী দিন নেই। ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও মাস্টারমশাই আরও কিছু দিন ডাইরি লেখাটা চালিয়ে যান, ১৮৮৭ সালের মার্চ মাস অবধি তিনি ডাইরি লেখাটা টেনে নিয়ে গেছেন। এই কয়েক বছরে মাস্টারমশাইর কাছে এত ডাইরি হয়ে গিয়েছিল যে, সেগুলোর সবটাই যদি লিখতে পারতেন, যদিও সম্ভব ছিল না, এত খণ্ড হয়ে যেত যে কল্পনাও করা যায় না। ওই কথাগুলো চল্লিশ বছরের উপর হয়ে গেছে, আর এক একটা দিনের দু-একটা কথার উপর ধ্যান করে করে পুরো দৃশ্যকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার কাজটা খুবই কঠিন ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। ঠাকুরের যে ভাব মোটামুটি আমরা তার সবটাই কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ এবং স্বামীজীর রচনাবলীতে পেয়ে যাই। এরপরেও নূতন কিছু সংযোজিত হলে ঠাকুরের ভাবের ব্যাপারে বিরাট কিছু হেরফের হবে না। কথামৃতকে স্বীকৃতি শ্রীশ্রীমাও দিয়ে গেছেন, স্বামীজীও দিয়ে গেছেন। পরের দিকে মা নিয়মিত কথামৃত শুনতেন।

প্রথম দর্শনের যে বর্ণনা মাস্টারমশাই দিচ্ছেন, তাতে তিনি দেখাচ্ছেন, বরানগরে তাঁর বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাড়ি ছিল, তাঁর সাথে বেড়াতে বেড়াতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। কথামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি যে কথাগুলো লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনা দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি ও উদ্যানের বর্ণনা করছেন। আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করছি। বলছেন, বরানগর থেকে ওনারা কিভাবে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, সিধুই মাস্টারমশাইকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার কথা বলেন। এর মধ্যে বলা হয় যে, মাস্টারমশাইর বিবাহ হয়েছিল, বিবাহিত জীবন তাঁর খুব একটা ভাল ছিল না, স্ত্রীর মানসিক রোগ ছিল। সমগ্র কথামৃতে মাস্টারমশাই নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রেখে দিয়েছিলেন। কোথাও তিনি মাস্টার বলছেন, কোথাও মণি নাম আনছেন, আবার কোথাও জনৈক ভক্ত বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আরও কোন ছদ্মনাম তিনি ব্যবহার করেছেন কিনা জানা নেই, তবে এই তিনটে নামের ব্যবহার আমাদের নজরে আসে। কথামৃতের প্রচ্ছদের উপর লেখা আছে শ্রীম-কথিত। ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, ঠাকুর যে কথাগুলো ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে বলছেন, সেখানে তো আর নামের উল্লেখ করার দরকার নেই।

যাই হোক তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, জানেন না ঠাকুর কে। তিনি ঠাকুরের দরজার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখলেন, বলছেন, "একঘর লোক নিস্তব্দ হইয়া তাঁর কথামৃত পান করিতেছেন"। এখানেই তিনি কথামৃত শব্দটা প্রথম আনলেন, আর ভাগবতের দশম স্কন্দে রাসলীলার গোপীগীতাতে আমরা কথামৃত শব্দটা পাই, যেখানে গোপীরা বলছেন, *তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্*। *কবিভিঃ* মানে ঋষিগণ, *ঈড়ীতং* মানে পূজা করছেন। পরে এটাকেই তিনি কথামৃতের প্রণাম মন্ত্র রূপে গ্রহণ করলেন। কথামৃত লেখার সময় মাস্টারমশাই জেনে গেছেন, ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর অবতার। তারপর ভাগবত থেকে প্রণামমন্ত্র নিয়ে আসা, এগুলো খুব ভাল, কারণ একদিকে এই ভাব যে, আগে শ্রীকৃষ্ণ যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলোই ভাগবতে স্থান পেয়েছে। তার মানে ভাগবত যা, আমাদের কথামৃতও তাই। ঠাকুর বারবার বলতেন, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান। আচার্য শঙ্করও গীতাভাষ্য লেখার সময় তার প্রণাম মন্ত্র তিনি পুরাণ থেকে নিয়েছেন। আচার্য শঙ্কর নিজেই একজন খুব উচ্চমানের

কবি ছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে খুব সহজেই একটা প্রণাম মন্ত্র রচনা করতে পারতেন। কিন্তু এটা দেখানো যে, একই ভাব, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

তাঁরা কথামৃত পান করিতেছেন, ইত্যাদি বর্ণনাদি করে, মাস্টারমশাই দেখছেন এক ঘর লোকের সামনে ঠাকুর কথা বলছেন, তিনি ভাবলেন, আমরা বরং মন্দিরাদি দর্শন করে আসি। এখানে বলে রাখা ভাল, আমরা খুব বেশী বর্ণনাতে যাব না।

এক পাতার পর তিনি আবার শুরু করছেন। দক্ষিণেশ্বর বৃন্দে বলে একজন দাসী ছিল। পরে পরেও বৃন্দের নাম আসবে। মাস্টারমশাই মন্দিরাদি দর্শন করে আবার ঠাকুরের ঘরের সামনে এসেছেন। বলছেন, এখন ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে। ধুনো দেওয়ার প্রচলন ভারতবর্ষে খুব পুরনো। বলে যে, ধুনো দিলে মশা মাছি কম হয়, কিন্তু তার থেকে বেশী, ধুনোর গন্ধে ভিতরে একটা পবিত্র ভাব আসে। মাস্টারমশাই ইংরেজী শিক্ষায় বড় হয়েছেন, সরাসরি ঘরে প্রবেশ করাটা তাঁর কাছে অভদ্রতা। বৃন্দে ধুনো দিয়ে ঠাকুরের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্টারমশাই কিছু জানেন না, এগুলো খুব mysterious। একদিকে কেমন একটা রহস্যময়, আবার খুব মিষ্ট, তা নাহলে তিনি ঘুরে দ্বিতীয়বার কেন এলেন, লোকেরা বলে যে তিনি নাকি suicidal ছিলেন। ওই প্রবণতা নিয়েই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিধুর বরানগরের বাড়ি এসেছিলেন, সিধুই নাকি ওনাকে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানবাড়ি দেখাতে এখানে নিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে কিভাবে ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের ঘরের সামনে এসে হাজির হয়েছেন। অর্জুনের বিষাদযোগ থেকে যেমন গীতা বেরিয়েছে, ঠিক তেমনি কথামৃতকারও বিষাদে ভরে আছেন, ওই বিষাদ থেকেই এক নূতন গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটল। অনেক সময় বিষাদ থেকেই আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়। গীতাতেও তাই দেখা যায়।

যাই হোক, মাস্টারমশাই আবার ঠাকুরের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখছেন ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে। তিনি বৃন্দেকে জিজ্ঞেস করছেন, "হ্যাঁ গা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন"? বৃন্দে জানিয়ে দিল, উনি এই ঘরের ভিতরই আছেন। বৃন্দে অনেকদিন ধরেই, দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন থেকে, সেই ১৮৫৩ সাল থেকে আছেন, প্রায় তিরিশ বছর ওখানেই আছেন।

এবার মাস্টারমশাই নিজস্ব ধারণার বশবর্তি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন"? মাস্টারমশাইএর এই প্রশ্ন করার মধ্যে দোষের কিছু নেই, কারণ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। আগেকার দিনেও পণ্ডিত মানেই তাঁর কাছে অনেক বই থাকবে। ঠাকুর সাধু যদি হয়ে থাকেন, যদি পণ্ডিত হয়ে থাকেন, সবারই মনে হবে তিনি অনেক বইপড়া লোক। এমনকি ঠাকুরও বলছেন, সাধুর কাছে আর কিছু না থাক, একখানা গীতা অবশ্যই থাকবে। স্বামীজী যখন ভারত ভ্রমণ করছেন, তখন একটা গীতা আর Imitatation of Christ, এই দুটো বই তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকত। বই যে রাখা হয় না, তা নয়, কিন্তু পরমহংস যখন হয়ে যান, যিনি শুধু নিজের অনুভূতির কথা বলেন, তখন আর বইয়ের দরকার হয় না। কিন্তু স্বামীজী যখন বিদেশে ছিলেন, তখন তিনি প্রায়ই নিজের লোকেদের চিঠি লিখছেন, অমুক বই পাঠাও, তমুক বই পাঠাও। তাছাড়া ঠাকুরের ঘরেও কিছু বই ছিল। মাস্টারমশাই ভাবছেন, একজন সাধুর কথা এত লোক যখন শুনছে, তখন নিশ্চয়ই ওনার অনেক বই পড়া আছে।

কিন্তু বৃন্দের যে উত্তর ওটা আরও খুব সুন্দর, "আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে"! এটা খুব মজার এইজন্য, বৃন্দে একজন সাধারণ মহিলা, আমরা যে অর্থে আধ্যাত্মিক উন্মেষের কথা বলি, সেটা বৃন্দের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনে মানুষজন একেবারে মুর্খও থাকত না, অনেকেই অনেক কিছু জানত। আসতে যেতে ঠাকুরকে দেখছেন, ঠাকুরের কথা কানে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন, এখানে অনেক ধরণের লোকেরা আসছেন, বড়লোকেরা আসছেন, ঠাকুর তাঁদের কথাগুলো বলছেন, বৃন্দে অবাক হয়ে শুনছেন। বৃন্দের কথার মধ্যে একটা প্রশংসা সূচক দৃষ্টিভঙ্গীও আছে। বৃন্দে যে খুব শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে

বলছেন, তাও না, কিন্তু যেটা সত্য সেটাকে যেমন আছে তেমন ভাবে মাস্টারমশাইর সামনে রেখে দিলেন। বৃন্দের কথা শুনে মাস্টারমশাই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কথামৃতেই ঠাকুর পরে বলবেন, পরমহংসের আরেকটি লক্ষণ, কোন বই থাকবে না।

মাস্টার অবাক হয়ে বলছেন, "আচ্ছা ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? - আমরা কি এ-ঘরের ভিতর যেতে পারি? – তুমি একবার খবর দিবে"। বৃন্দে বলছেন, "তোমরা যাও না বাবা। ঘরে গিয়ে বসো"। বৃন্দে জানেন, উনি সন্ধ্যা আদি করেন না।

যাঁরা বৈদিক ধর্ম পালন করেন, তাঁদের বেদের বিধি নিষেধ পালন করতে হয়। বিধি হল, বেদে যেটা আদেশ করা হয়েছে সেটাকে পালন করা। নিষেধ হল, যেগুলো বারণ করা হয়েছে, সেগুলো না করা। মানুষ যখন পরমহংস অবস্থায় চলে যান, এমনকি যাঁরা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে নেন, তাঁরা এই বিধি নিষেধের পারে চলে যান, বেদের পারে চলে যান। গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, অর্জুন বেদ তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা, তুমি তিনটে গুণের পারে চলে যাও, অর্থাৎ বেদের পারে চলে যাও। এই ভাবের কথা কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বলবেন। যতক্ষণ দূরত্ব আছে, ততক্ষণ আমি তুমি ভেদ থাকা আর তার জন্য অনেক কিছু করা। যখন মিলন হয়ে গেল, আমি তুমির ভেদটা মিটে গেল, তখন আর কিছু করার থাকে না।

শেষ পর্যন্ত দোনোমোনো করার পর মাস্টারমশাই এবার ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন। ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের সাথে কথা বলতে লাগলেন, তুমি কে, কোথা থেকে এসেছো। কয়েকটা কথা বলতে বলতে মাস্টার দেখছেন, ঠাকুর থেকে থেকে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। শব্দটা এখানে 'অন্যমনস্ক' বলছেন, পরে যাতায়াত করতে করতে মাস্টারমশাই জানতে পারলেন, এটাকে ভাব বলে। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সময় ফাতনাটা যখন একটু নড়তে শুরু করে, তখন যে মাছ ধরছে তার মনটা ওই ফাতনার উপর যেমন একাগ্র হয়ে যায়, ঠাকুর ঠিক সেইভাবে একাগ্র হয়ে আছেন। এই ধরণের বর্ণনা পরে পরে আরও আসবে, ঠাকুর সেখানে বলবেন, মন যখন একটা জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে যায়, তখন বাইরের সব কিছু, কথাবার্তা, দেখাশোনা সব বন্ধ হয়ে যায়। অথচ ঠাকুর কুঠি বাড়ির ছাদ থেকে ভক্তদের চিৎকার করে ডাকতেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আর মাস্টারমশাইকে ঠাকুর এই কাজের জন্যই ঠিক করে রেখেছেন, যাঁকে দায়ীত্ব দিয়ে রেখেছেন, তিনি প্রথম এসে ঠাকুরের সামনে দাঁড়ালেন, ঠাকুর ভাবের ঘোরে চলে যাচ্ছেন, কথা বলতে পারছেন না। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন কথা বলতে চাইছেন না বা কথা বলতে পারছেন না।

মাস্টারমশাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না ঠাকুরের ভিতর কি হচ্ছে। তিনি বলছেন, "আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে আমরা এখন আসি"। ঠাকুর তখন আরও অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছেন, বলছেন, "না – সন্ধ্যা – তা এমন কিছু না"। ঠাকুর কোন রকমে শেষ কথাটা বলতে পারলেন, "আবার এসো"। প্রথম সাক্ষাৎ, মাস্টারমশাইয়ের সেভাবে কোন কথাই হল না। সাধারণ ভাবে কারুর সাথে প্রথম দেখা হওয়ার পর যদি সেভাবে কথা না হয়, সচরাচর মানুষ হয় তাকে ভুলে যাবে নয়তো তার কাছে আর যাবে না। কিন্তু যেখানে কোন ভাবে আগে থেকেই জুড়ে আছে, সেইজন্য প্রথম দেখাতেই এমন একটা ছাপ মনের মধ্যে পড়বে, যেটা তাকে আবার টেনে নিয়ে আসবে তার কাছে।

প্রথম দর্শনেই মাস্টারমশাইয়ের মনে ঠাকুর একটা জোর ছাপ ফেলেছেন। কথা-কাহিনী, নাটক, সিনেমায় সাধারণত প্রেম নিয়ে যে জিনিসগুলো দেখানো হয়, এক অপরকে দেখে কিভাবে আকর্ষিত হয়ে যায়, এখানে কিন্তু জিনিসটা পুরো অন্য রকম – ভক্ত আর ভগবানের প্রথম মিলন। ঠিক এক অপরকে চিনে নিচ্ছেন। এরপর একটু খোঁজ-খবর নেওয়া হবে, তারপর দুজন দুজনের সাথে মিলে গেলেন। নরেনের সঙ্গেও ঠাকুরের এই ভাব।

যদি আমরা একটু বিচার করে দেখি, জীবনে শুধু দুঃখ আর দুঃখই আছে। মুণ্ডকোপনিষদে দুটো পাখির কথা বলা হয়েছে। একটা পাখি গাছের নীচের ডালে থাকে, অপর পাখিটা গাছের একেবারে উপরে চুপচাপ বসে আছে। নীচের পাখিটা গাছের যে ডালে বসে মিষ্টি মিষ্টি ফল খায় তখন সে ওখানেই থাকতে চায়, তিক্ত ফল যখন খায় তখন বিরক্ত হয়ে ওই ডালটা ছেড়ে উপরে ডালে উঠে যায়। মানুষেরও তাই, তিক্ত ফল আমরা সব সময়ই খাচ্ছি, সকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সারা দিন আমরা শুধু তিক্ত ফলই খেয়ে যাচ্ছি, দুঃখ আর দুঃখ, দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। তিক্ত ফল খাওয়ার পর দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। একটা প্রতিক্রিয়া হয় – ভাবছে, এই যে তিক্ততা এলো এই এই কারণে এসেছে, এই এই দোষ করেছিলাম, এই এই ভুল করেছিলাম, কিন্তু এবার এমন করব যে আর অমনটি যেন না হয়। স্কুলে বাচ্চা ছেলে যদি দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, কখনই সে মনে করে না যে আমি কোন দোষ করেছি, মনে করে যে, বোকামো করে ফেলেছি বলে আজ ধরা পড়ে গেলাম, আগামীবার এমন ভাবে দুষ্টুমি করতে হবে যে, যেন ধরা না পড়ি। আমরাও ধরা পড়লে কক্ষণ মনে করতাম না যে আমি কোন দোষ করেছি, আর দুষ্টুমি করব না। স্যারকে বলে যাচ্ছে, স্যার ভুলেও আর এই কাজ করব না, কিন্তু মনে মনে ভাবছি, পরের বার এমন ভাবে দুষ্টুমি করতে হবে যাতে ধরা না পড়ি।

আমাদের জীবনেও যখন কষ্ট আসে, দুঃখ আসে আমরাও তাই ভাবি, ভাবি যে, কি আর করা যাবে এই দুঃখ এসে গেছে, পরের বার এমন ভাবে করতে হবে যে, দুঃখটা যেন না আসে। কদাচিৎ কখন সখন মানুষ দেখে যে, এই জগতে কিছু নেই, এখান থেকে আমার দুঃখ ছাড়া কিছু পাওয়ার নেই, তখন সে তার দৃষ্টি বাইরে থেকে ঘুরিয়ে এনে ভিতরের দিকে ফেলে। অর্জুনকেও ভগবান এই কথা বলছেন, *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, এই জগৎটা অনিত্য, এখানে কোন সুখ নেই, এটাকে ভাল করে বুঝে নিয়ে তুমি সব ছেড়ে আমাকেই ভজনা কর।

মহাভারতে মাঙ্কিগীতা নামে খুব সুন্দর একটা অধ্যায় আছে। মাঙ্কি নামে একজন লোক ছিল। বেচারীর এমনই দুর্ভোগ যে, যে ব্যবসাতেই সে টাকা ঢালে সেই ব্যবসটাই ডুবে যায়। মাঙ্কি চেষ্টা কিন্তু ছাড়ছে না। নানান ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে আমার জীবনে সুদিন আসে। কিন্তু সুদিন তার আসে না। শেষে ওর যাবতীয় যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দুটো বাছুর কিনল, এই পরিকল্পনা যে, দুটোকে বলদ করে লাঙল চালানোর কাজে চাষীদের কাছে ভাড়া খাটাবে। বাছুর দুটোকে এবার ট্রেনিং দিতে হবে। গ্রাম দেশের লোকেরা জানবেন, ট্রেনিং দেওয়ার জন্য দুটো বাছুরের কাঁধে একটা ডাণ্ডা বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে একসাথে চলতে পারে। মাঙ্কি মনে মনে খুব খুশী, ভাবছে এবার একটা কিছু করতে পারলাম। বাছুর দুটোর কাঁধে ডাণ্ডা লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্থা দিয়ে যাচ্ছে, দেখা গেল রাস্থার মাঝখানে একটা উট বসে আছে। বাছুর দুটো দৌড়াতে দৌড়াতে উটের কাছে পৌঁছে গেছে, হঠাৎ উটের কি মনে হল, উট দাঁড়িয়ে গেল। উটটা উঠে দাঁড়াতেই মাঙ্কি দেখতে পাচ্ছে, বাছুর দুটো উটের কাঁধে ঝুলছে। উটের কাঁধের উপর একটা ডাণ্ডা আর ডাণ্ডার দু-দিকে দুটো বাছুর, সেটা দেখে উট ঘাবড়ে গিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় মারল। উট দৌড়ে পালিয়ে কোথায় যে চলে গেল, মাঙ্কি আর কোন হদিশই পেল না। মাঙ্কির সব কিছু চলে গেল, হা হুতাশ করছে। তখন তার পুরো জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেল, বুঝল যে, এই জগতে কোন দিন কিছু পাওয়া যাবে না, তখন তার ভগবানের দিকে মনটা পুরোপুরি চলে গেল।

ভাগবতে পিঙ্গলা বারবণিতার কাহিনী আছে। সেও একদিন একজন খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করে আছে। যখনই রাস্থা দিয়ে কোন লোককে আসতে দেখছে, ভাবছে, এ হয়ত আজকে আমার খদ্দের হবে। কিন্তু লোকটি অন্য দিকে চলে গেল। পিঙ্গলা এইভাবে খদ্দেরের আশায় বসে আছে, রাত শেষ হতে চলল, কোন খদ্দের এলো না। ভোর হল, ভোরের আলো ফুটতেই পিঙ্গলার মোহ ভঙ্গ হয়ে গেল। আমি সারা জীবনটা কি করলাম। যে পুরুষ মানুষগুলো নোংরা, মনটা যাদের লালসায় পূর্ণ, এদের জন্য আমি

আমার সব দিয়ে দিলাম! আমার ভিতর ভগবান নারায়ণ আছেন, তাঁর দিকে কোন দিন ফিরে তাকালাম না, তাঁর জন্য কিছুই করলাম না। এখান থেকেই পিঙ্গলার আধাত্মিক যাত্রা শুরু হয়।

হিন্দু ধর্ম খুব প্রাচীন ধর্ম, জীবনকে তাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তার থেকেও বেশী এনারা ধর্মের খুব গভীরে গিয়ে প্রচুর অন্বেষণ করে ধর্মকে দেখেছেন। তাঁরা দেখলেন, মানুষের জীবনে দুঃখ সব সময় আসতে থাকে, এই দুঃখ মানুষকে দু-দিকে নিয়ে যায়। একটা হল, হয় তাকে বিষয়ী বানিয়ে দেবে, নয়তো ধর্মের দিকে ঠেলে দেবে। আমরা হিন্দুরা পুনর্জন্ম মানি, আমরা এও জানি এই বিষয়ী ভাব জন্ম জন্ম ধরে চলবে। কত জন্ম চলবে? স্বামীজী আমেরিকাতে থাকার সময় প্রচুর ক্লাশ নিতেন। একদিন একটা ক্লাশে তিনি ব্রহ্ম, মায়া, আত্মা এগুলোকে নিয়ে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, জগৎটা হল মায়া, এই জগৎ দুদিনের জন্য, যেমন আমরা স্বামীজীর রচনাবলীতে দেখতে পাই। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা উঠে বলছেন, 'আপনি এ-সব যা বলছেন শুনতে ভাল লাগছে, কিন্তু আমার কাছে সোনা-গয়না, আমার কাছে মান-যশ এটাই আসল, এটাই আমার কাছে আসল বস্তু'। স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলাকে বলছেন, 'অবশ্যই এগুলো আপনার কাছে আসল, আপনি এগুলো নিয়েই থাকুন, হাজার হাজার জন্ম এগুলো থেকেই আপনি আনন্দ পেতে থাকুন। পরে কোন জন্মে এগুলোর প্রতি আপনার যেদিন বিতৃষ্ণা আসবে, সেদিন আপনি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবেন।

অন্যান্য যে ধর্মগুলি আছে, যখনই অন্যান্য ধর্ম বলা হয়, তখন সেমেটিক ধর্মকে লক্ষ্য করেই বলা হয়, সেমেটিক ধর্ম মানে জুহুদি, খ্রীশ্চানিটি ও ইসলাম, এর সাথে পার্সিদের ধর্ম জরুথ্রিষ্ট ধর্মকেও নেওয়া যায়, যদিও জরুথ্রিষ্ট ধর্ম সেমেটিক রিলিজিয়ান নয়, এই চারটি ধর্ম ইরান, ইজ্রায়েল একই অঞ্চল থেকে বেরিয়েছে। এদের কাছে মনুষ্য জন্ম একবারই হয়, একবার জন্ম নিল, এবার মৃত্যুর পর যেখানে যাওয়ার সেখানে যাবে। আমাদের কাছে শুদ্ধ আত্মা আছেন, শুদ্ধ আত্মা কোন কারণে শরীর ধারণ করে নিয়েছেন, কেন নিয়েছেন আমাদের জানা নেই, এর কি হবে সেটাও জানা নেই। কিন্তু এটা আমরা জানি, আমি আছি, এই জগৎ আছে, এখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে আর এই সুখ-দুঃখের পারে যাওয়ার পথ আছে।

একটা বৃত্ত আছে, বৃত্তের কোথায় শুরু কোথায় শেষ কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনাকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে আপনার চারিদিকে একটা বৃত্ত টেনে দেওয়া হল। আপনাকে যদি বলা হয়, এই বৃত্তের কোথায় শুরু আপনাকে বার করতে হবে। আপনি কি করে জানবেন, এই বৃত্তের কোথায় শুরু, কোথায় শেষ? কোথাও শেষ নেই, শুরুটাও জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু আপনি বৃত্তকে অতিক্রম করে বৃত্তের বাইরে চলে যেতে পারেন। আধ্যাত্মিক জীবন মানে এটাই। আধ্যাত্মিক জীবন কখনই আপনাকে বলবে না সৃষ্টি কবে শুরু, কেন শুরু হল, কবে ও কোথায় এর শেষ। এর উত্তর একটাই, অনাদি কাল থেকে চলছে, অনাদি কাল ধরে চলবে। 'কেন এই রকম'? 'কেন এই রকম আমরা কি করে বলব, ঠাকুরের ইচ্ছা'। 'ঠাকুরের কেন এই ইচ্ছা হল'? 'আমি যদি ঠাকুরের ইচ্ছা আপনাকে বলে দিই, তাহলে আমি তো ঠাকুরের মনকে জেনে গেলাম। একটা উচ্চতর মন নিম্নতর মনকে জানতে পারে। কারুর মনকে জানা মানে আপনি তার থেকে উচ্চতর হয়ে গেলেন। আপনি যদি ঠাকুরের এই রকম ইচ্ছা কেন যদি জেনে যান, তাহলে তো আপনি ঠাকুরের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন বা সমান সমান হয়ে গেলেন। আপনাকে সবাই এসে প্রণাম করবে, কারণ ঠাকুরের মনের সাথে আপনি এক হয়ে গেছেন, আপনার মন আর সাধারণ মন থাকল না। আমরা এটাই মনে করি আর পুরো দমে মানি'।

ঠাকুরও পরে বলবেন, জন্মজন্মান্তরের মাঝখান দিয়ে মানুষের ভোগান্তি চলতেই থাকে। আর যখন 'আমি' 'আমি' থেকে 'তুঁহু' 'তুঁহু'তে যায়, এবার সে মুক্তির পথ ধরে নিল। মাস্টারমশাইও এই ধরণের ছিলেন, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিষাদগ্রস্ত ছিলেন। ঠাকুরের কথা কোথাও তাঁর এই বিষাদগ্রস্ত

মনকে স্পর্শ করেছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন, অনেক জন্ম ধরে একটু একটু করে যখন পূণ্য সঞ্চয় হয়, তখন সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ করাটাও একটা পূণ্য। ঠাকুর কথামৃতে বারবার সাধুসঙ্গের কথা বলবেন। প্রথমবার সাধুর কথা শুনে কিছু বুঝতে পারবেন না, শুনতে শুনতে আপনার বার বার মনে হতে থাকবে, আপনিও যেন কিছু বলতে চাইছেন, হয়ত একটু তর্ক করতে চাইবেন, এ-জিনিস সবারই হয়। কাঁচা মন মানেই তাই। যদি প্রথমে সাধুর সঙ্গে আপনি তর্ক করতে না চান, বুঝতে হবে আপনার ভিতর কিছু গোলমাল আছে। কথামৃতেই এক জায়গায় আছে, একজন তর্ক করছিল, তার সাথে যে বন্ধু এসেছে সে তাকে বলছে, 'আরে তর্ক করছেন কেন, মেনে নিন না'। ঠাকুর বন্ধুটির উপর প্রচণ্ড রেগে গেছেন, 'তুমি তো দেখছি বড় ছ্যাঁচড়া, ও মানছে না, বলতে হবে হ্যাঁ মেনে নিলাম'!

আমাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারগুলি, জন্মজন্মান্তর ধরে যে জিনিসগুলিকে বুঝে রেখেছি, জন্মজন্মান্তর ধরে যত ধারণা হয়ে আছে, হঠাৎ একটা উচ্চতর স্তর থেকে যখন কোন একটা জিনিস আসতে শুরু হয়, প্রথমে মন ওটা কিছুতেই নিতে চাইবে না। তখন প্রশ্ন করতে শুরু করে, আপত্তি জানাতে শুরু করে। করতে করতে একটা জায়গায় বিশ্বাস আসে যে উনি একজন সাধু, উনি একজন আচার্য, আমি বুঝি আর নাই বুঝি, উনি নিশ্চয় ঠিক কথাই বলছেন। তখন কি হয়? ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, কিন্তু শুনে রাখতে হয়। তখন যে কথাটা আপনি একেবারেই নিতে পারছেন না, ওই জায়গাতে আপনি আপত্তি করলেন। তখন তিনি আপনাক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন বা বলবেন, এখন শুনে রাখ, পরে হবে। আধ্যাত্মিক অভিযান সবারই এ-ভাবেই হয়, কোথাও এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। সেইজন্য সাধুসঙ্গকে ধরে রাখতে হয়।

কথামৃত যে কত মূল্যবান গ্রন্থ, এ বোঝান অসম্ভব। একটু আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ না হলে এবং বেদ, উপনিষদ, গীতা তার সাথে অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলির একটু ধারণা না থাকলে, কথামৃত যে কত মূল্যবান গ্রন্থ, এই কথার ধারণা হবে না। বিশ্বের যে আধ্যাত্মিক সাহিত্য, সেখানে কোথাও মনে হবে না যে এই শাস্ত্র হল একটা জীবন্ত শাস্ত্র। নিজের ধর্মের গ্রন্থকে সবাই শ্রেষ্ঠ বলবে। আমরা গীতা, উপনিষদ পড়ি, গীতা, উপনিষদকে আমরাও লিভিং শাস্ত্র বলব। কিন্তু কথামৃত শুধু যে জীবন্ত শাস্ত্র তা না, একেবারে টগবগ করে জীবন যেন ওর মধ্যে ফুটছে। লোকেরা কথা বলছেন, সেটাকে তিনি লিপিবদ্ধ করছেন, মানুষের যে দৈনন্দিন সমস্যা, ধর্ম নিয়ে, অধ্যাত্ম নিয়ে মানুষের মনে যে প্রশ্ন আসছে, যে সংশয় আসছে, সব কিছুকে একটা জায়গায় এনে মাস্টারমশাই দাঁড় করাচ্ছেন। যীশু খ্রীষ্টের কিছুটা দেখা যায়, যেখানে ওরা আপত্তি করছে, কিন্তু সেখানে যীশু হিউমারাসলি উত্তর দেবেন, বাস্তবিক জিনিসটাকে যে উপস্থাপন করবেন, এই জিনিসগুলো সেখানে আসে না। বাইবেলে যীশুর কথাগুলো মূলতঃ আধ্যাত্মিক, সেখানে যে অন্যান্য দিকগুলো, যেমন জগতের একটা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই জিনিসগুলি পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে দেখালে, কথামৃত হল একটা living scripture, alive। সমস্ত ধর্মগ্রন্থই প্রাণবন্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর সমস্ত শাস্ত্রই মানুষের মনে জীবনসুধা ঢেলে দেয়। কথামৃত পড়লে মনে হবে যেন, আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ এক যুবক, কথামৃত যেন এই দৌড়াচ্ছে, এই শান্ত হয়ে বসছে, এই অমৃত কলস ঢেলে দিচ্ছে, কখন ঋষিদের যুগে চলে যাচ্ছে, কখন আবার তৎকালীন সামাজিক ছবিকে তুলে নিয়ে আসছে, তার সাথে কখন সঙ্গীতের মুর্ছনা আবার কখন নৃত্যের ছন্দ সবাইকে এক অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছে। এই জিনিস গীতা, উপনিষদ, বাইবেল, কোরান কোথাও আপনি পাবেন না, সম্ভবই না। কারণ কথামৃতের মত এভাবে কোন শাস্ত্রই রেকর্ডিং হয়নি। যদি প্রত্যেকটি কথা কথামৃতের মত রেকর্ডিং হত, হয়ত ওই শাস্ত্রগুলিও এই রকমই হত।

দ্বিতীয় দর্শন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাস্টারমশাই দ্বিতীয়বার ঠাকুরের কাছে এসেছেন। গ্রন্থে যেভাবে পারিপার্শ্বিক সব কিছুর বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে আমরা বিস্তারে যাচ্ছি না। আমরা শুধু মূল কথাগুলিকে ধরে এগিয়ে যাব। ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই নিত্য কথামৃত পাঠ করেন, যাঁরা পাঠ করেন না, তাঁরা কথামৃতের একটি কি দুটি পাতা অবশ্যই নিত্য পাঠ করবেন। প্রথম দিন মাস্টারমশাই সন্ধ্যার সময় গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় দিন একেবারে সকাল আটটার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হয়েছেন। দেখছেন, নাপিত এসেছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ঠাকুর কামাতে যাচ্ছেন। ঠাকুর মাস্টারকে দেখে মোটামুটি চিনতে পেরেছেন, কারণ গতকালই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার সময় ঠাকুর একটা ভাবের অবস্থায় ছিলেন, একটু একটু যেন সমাধিতে ডুবে যাচ্ছিলেন, এগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি।

"ঠাকুর জানতে চাইলেন, 'হ্যাঁগা তোমার বাড়ি কোথায়'? মাস্টার বললেন, কলকাতায়। 'এখানে কোথায় এসেছ'? 'এখানে বরাহনগরে বড়দিদির বাড়ি আসিয়াছি, ঈশান কবিরাজের বাটী'। ঠাকুর ঈশান কবিরাজকে জানতেন, বলছেন, 'ওহ্ ঈশানের বাড়ি"!

এগুলো দেখার জিনিস, অপরিচিত কেউ এলে তার সাথে কি ভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে পরিচয় নিতে হয়, একটু আগে বলা হচ্ছিল, কথামৃত যেন এক জীবন্ত শাস্ত্র, ছোট ছোট এই জিনিসগুলিই দেখিয়ে দেয় কেন জীবন্ত শাস্ত্র, আমরা যত এগোব তত আরও অনেক কিছু দেখতে থাকব। যাঁরা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে বাইরে থেকে জানেন, তাঁদের কেউ ভক্ত, কিন্তু মঠের সাথে খুব একটা যোগাযোগ রাখেন না, এনাদের মঠের সাধুদের নিয়ে এক বিচিত্র ধারণা, সাধু মানে সে খায় না, সাধু মানে সে রাতে ঘুমায় না, সাধু মানে তাঁর কোন কিছুর দরকার হয় না। আবার সাধু ভাল কিছু করলে বলবে, সাধুর তো এই রকমই করার কথা। তা নয়, সাধুরা এই সমাজেরই একজন, সাধুরও শরীর আছে, শরীরের যত রকম ধর্ম আছে, সব ধর্মই তাঁর শরীরে হয়। বাইরের কোন ভক্ত এসে দেখছেন, সাধুরা ইলেকশান রেজাল্ট নিয়ে কথা বলছেন। লোকেরা শুনে ঘাবড়ে যায়, সাধুরা কেন ভোটের রেজাল্ট নিয়ে কথা বলবেন! কিন্তু একটু ভাবে না যে, সাধুরা বাইরের কোন আলাদা জগৎ থেকে থোরাই এসেছেন, এখান থেকেই এসেছেন, এখানকার কথাই বলবেন। কিন্তু লোকেদের সাধু সম্বন্ধে ধারণা যে, সাধু মানে সব সময় ধ্যানের গভীরে বসে আছেন, কদাচিৎ কখন একটু সময়ের জন্য চোখ খুলবেন, হঠাৎ কারুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠবেন, বোলো ব্যাটা কেয়া চাহিয়ে। সাধু মানে তা নয়, সাধুও হাড়-মাংস-রক্তের মানুষ। ঠাকুর বলছেন, পরমহংস যাঁরা, যাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁরা কেমন বিভিন্ন অবস্থায় থাকেন – জড়বৎ, বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ। বালকের মনে যে জিনিসটা ঘুরবে, ওটাকে সে বার বার বলতে থাকবে। বড় হয়ে যাওয়ার পর, মনে যেটা ঘুরছে, ওটা কাউকে জানতে দেয় না। সাধু-মহাত্মারা কোন কিছু চেপে রাখেন না, মনে যেটা ঘুরবে সেটা বেরিয়ে আসবে।

একটা দুটো কথা বলার পরই ঠাকুর প্রসঙ্গটা পাল্টে দিয়ে বলছেন, "হ্যাঁগা কেশব সেন কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল"। সেই সময়ে কেশব সেন একজন খুব নামকরা লোক, খবরের কাগজে প্রায়ই নাম বেরোয়। মাস্টারমশাই বলছেন – "আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন"। এবার ঠাকুর বলছেন, "আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম"।

স্বামীজীর রচনাবলী যাঁরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা ভাল করে জানবেন স্বামীজী কিভাবে মূর্তি পূজা নিয়ে বলছেন। এখন কথামৃত যদি পড়তে হয়, কথামৃত যদি বুঝতে হয়, আর বর্তমানকালে কথামৃতই এই যুগের গ্রন্থ, যে ধর্মাবলম্বীই হন, যে সম্প্রদায়ভুক্তই হন, কথামৃতই একমাত্র গ্রন্থ। কথামৃত বুঝতে হলে কয়েকটা জিনিস তাঁকে অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রথম হল, ঠাকুরের জীবন ভাল ভাবে না জেনে কথামৃত পড়লে কথামৃত পরিষ্কার বোঝা যাবে না। সেইজন্য লীলাপ্রসঙ্গ ভাল করে পড়া না থাকলে কথামৃত পরিষ্কার বোঝা যাবে না। আপনি হয়ত মনে করবেন, শব্দ মাত্রই তো, যদি কথামৃত পড়া হয় তাতে না বোঝার কি আছে। কোন ভক্তকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'কথামৃত পড়েছেন'? সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'ও! কথামৃত! কথামৃত তো পড়ে ফেলেছি'। 'পড়ে ফেলেছেন, না পড়ে ফেলে দিয়েছেন'? এক-একটা কথার পিছনে কি তৎপর্য আছে, ওটা যদি নাই বোঝা হল, তাহলে আর শাস্ত্র পড়া কেন। উপনিষদ, গীতাতে যে কথাগুলো রয়েছে, যে শ্লোক বা মন্ত্রগুলি রয়েছে, সেগুলোর তাৎপর্য যদি না বোঝা যায়, তাহলে তো শাস্ত্র শব্দ মাত্র হয়ে থেকে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবনে শব্দের কোন দাম নেই, শব্দের পিছনে যে জ্ঞানরাশি আছে, সেটাই আসল। বেদকে পরিভাষিত করতে গিয়ে পতঞ্জলি বলছেন, বেদের শব্দরাশি, ওটা বেদ নয়, সেই শব্দরাশির পিছনে যে জ্ঞানরাশি, সেটাই বেদ। এই শব্দগুলো যে আমরা পড়ছি, এটা কথামৃত নয়, এই কথাগুলো যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে বহন করে আনছে, ওটাই কথামৃত।

আমরা দেখছি, কিভাবে ঠাকুর প্রথমে কালীমন্দিরের পূজারী হলেন, পূজারী হওয়ার পর থেকে তিনি মা কালীর সাধনা করতে শুরু করলেন। আর তারপর একদিন তাঁর মা কালীর দর্শন হল। যখনই আমরা মা কালীর দর্শন বলি, আমরা মনে করি ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হল, সেখান থেকে আমাদের মনে একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে যে, দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর যে বিগ্রহ রয়েছে, সেটাই যেন আলো রূপে, বা চৈতন্য হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। মা কালী একটা প্রতিমা রূপে ছিলেন, তিনি যেন এখন জীবন্ত হয়ে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর ঠাকুর চোখ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। এভাবে কেউ যদি মা কালীকে দেখেন, তাহলে মা কালীও কিন্তু একটা বস্তু হয়ে যাচ্ছেন বা একটা ব্যক্তি হয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বর তো তা নন। কথামৃতে বার বার আসবে, উপনিষদে বার বার আসে, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেও বার বার আসে, ঈশ্বর, ভগবান, সচ্চিদানন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। ইন্দ্রিগ্রাহ্য যদি নাই হন, তাহলে ঠাকুর যেটা দর্শন করছেন, তিনি কি দেখছেন? ঠাকুর কি ভূত দেখার মত মা কালীকে দেখছেন? একেবারেই না। এটা একটা সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা, যেখানে তিনি স্থূল জগৎকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

তারপর ঠাকুর বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতের সাধনা করতে শুরু করলেন। সব শেষে তোতাপুরি এলেন, তোতাপুরির কাছে অদ্বৈত সাধনা করে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তার মানে, সেই সময় কলকাতায় যত রকম ধর্মের কথা ঠাকুর শুনেছিলেন, সব ধর্মের সাধনাই তিনি করেছিলেন, সব ধর্মেরই ইষ্ট দর্শন তাঁর হয়েছে। উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, উপনিষদে যে বলা হয়েছে ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই সেই ব্রহ্মও বলা হয়েছে, এবার এক মুহূর্তের জন্য আমরা যদি ঠাকুরকে অবতার রূপে না দেখে, ঠাকুরের যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানগুলো হয়েছিল, সেটাকেই যদি আমরা দেখি, তাতেও দেখুন, যে মানুষটার সমস্ত জ্ঞান হয়ে গেছে, আর যাঁর কোথাও আমি বলতে কিছু নেই, ঠাকুর অনেকবার বলছেন, আমি খুঁজতে গিয়ে কিছু পাই না, আমি বলতে আমার কিছু নেই। শ্রীশ্রীমা বলছেন, তোমাদের ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা। ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা সবাইকে বলতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী, এমনই সর্বত্যাগী যে, নরেন ঠাকুরকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর বিছানার নীচে টাকা লুকিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর এসে বিছানায় বসতেই বিছে কামড় দেওয়ার মত লাফ দিয়ে উঠে গেলেন। এই রকম একজন মানুষ কেশব সেনের জন্য ডাব-চিনি মানত করছেন। কেন মানত করছেন? 'কেশবের কিছু হয়ে গেলে কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা কব'!

এখানে দুটো জিনিস খুব মূল্যবান। একটা হল, আপনি অবতার হন আর যাই হন, আপনারও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ লোক দরকার, ঠাকুর যাদের বলতেন অন্তরঙ্গ। যীশু খ্রীষ্টই হন, মহম্মদই হন, ভগবান বুদ্ধই হন, যেই হন, এনাদের জীবনী পড়লেই দেখা যাবে, এনাদের কয়েকজন থাকেন, যাঁরা তাঁর বিশেষ, যেখানে এনারা ওই বিশেষদের মনকে আশ্রয় করে থাকেন। তাঁদের সাথে কথা বলা পছন্দ করেন। আমরা বলতে পারি, তাহলে আমাদের সাথে তফাৎ কোথায় থাকল, আমাদেরও তো তাই। ক্লাশ ফাইভের একটা বাচ্চা ছেলে, সেও নিজের মনপসন্দ গ্রুপ খুঁজে বেড়ায়। আপনি অবতার, আপনারও তো মশাই সেই রকম গ্রুপ আছে, আমাদের সাথে তফাৎ কোথায় থাকল? তফাৎ হল, যদি কেউ কাছে গিয়ে শোনে, এনারা কি কথা বলছেন, তখন তফাৎটা বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ নিজের গ্রুপের লোকের কাছে আড্ডা মারতে যায়, তাদের আলোচনাতে তারা সংসারের বিভিন্ন ভাল মন্দ জিনিসকে নিয়ে ডুবে থাকে। আর আধ্যাত্মিক পুরুষরা যখন নিজের ঘনিষ্টদের কাছে যান, তখন তাঁরা ঈশ্বরীয় কথা, বা একটা উচ্চমানের ভাব বা কোন আধ্যাত্মিক সত্য বা কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা, এগুলোতে ডুবে থাকেন।

কেশব সেন তখন ঠাকুরের সেই রকম একজন কাছের লোক ছিলেন, তখনও নরেন, রাখাল এনারা ঠাকুরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেননি। ট্রেনে যাচ্ছেন, কি কোথাও কোন পার্টিতে গেছেন, আপনার সাথে তিন চার বছরের ছোটা বাচ্চা আছে, দেখবেন, ওখানে যদি তিন চার বছরের বাচ্চা থাকে, ওরা ঠিক এক অপরের কাছে চলে যাবে। এমনকি ভাষারও কোন সমস্যা হয় না, একটা তামিল আর একটা বাঙালী বাচ্চা যদি মিলে যায়, একজন তামিল ভাষায় গড়গড় করে বলতে থাকবে, আর বাঙালী বাচ্চাও গড়গড় করে বাঙলায় বলতে থাকবে। সারা ট্রেন নিজেদের সঙ্গে কথা বলবে, মজা করবে, ওরা কি করে এক অপরকে বোঝে যে, এ আমারই স্যাঙাৎ, আমারই দলের লোক, সত্যিই বিরাট রহস্য। আমাদের মনের মিল যেখানে হয়, সেখানে অনেক কিছুর ব্যবধান মুছে যায়। কথামৃতে ঠাকুর সংসারে কিভাবে থাকতে হয়, এটাকে নিয়ে যখন আলোচনা করবেন, সেখানে তিনিও সঙ্গী, অন্তরঙ্গ এসব নিয়ে বলবেন।

আপনি একটা ভাব ধরে নিলেন, আমি এই ভাব নিয়ে জীবনে উঠতে চাই, এবার আপনি দেখবেন কোথায় আমার মনের ভাবের সাথে মিল পাওয়া যায়। ঠাকুর বলছেন, ভক্তের স্বভাব হল গাঁজাখোড়ের স্বভাব, মনের মত লোক খুঁজতে থাকবে, যখন পেয়ে যায়, তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। আমাকেও যখন কোথায় ইনভাইট করে, আমি খোঁজ নিই, আচ্ছা ওখানে আর কে কে থাকবে, উদ্দেশ্য এমন কেউ আছেন কিনা যার সাথে গল্পগুজব করা যাবে। আমরা তো আর ঈশ্বরীয় কথা নিয়ে থাকব না, পাঁচ রকম কথা নিয়ে থাকব। সবারই কথা বলার লোক চাই। অনেক সময় মনে হয় কথা বলা মানে পরনিন্দা পরচর্চা, এগুলোর জন্য মনের মিল দরকার লাগে না। মূল হল, মনটাকে কোথাও রাখতে হয়। এই রাখাটা কোথায় হবে? মনকে রাখার জন্য সবাইকে পাত্র খুঁজতে হয়। আমাদের জীবনে বেশীর ভাগ সমস্যা হয় এই কারণে, মনটাকে রাখার জন্য পাত্র বা লোক খুঁজে পাই না। এমন একটা আলম্বন যেখানে মনকে রাখা হবে, এই আলম্বন না থাকাতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। এটা গেল প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশ হল, ঠাকুর ডাব-চিনি মানছেন, ঈশ্বরের কাছে কেশবের জন্য প্রার্থনা করছেন। অনেক দিন পর দ্বিতীয়বার কেশবের যখন অসুখ হয় তখন সেখানে তিনি বলছেন, এবার কেশবের জন্য ততটা ব্যাকুলতা হল না। এই ভাবটাও একটা সময় পাল্টায়, তত দিনে নরেনাদি সবাই এসে গেছেন, এখন একটা অন্তরঙ্গদের দল তৈরী হয়ে গেছে। যতই হোক কেশব সেন অন্তরঙ্গ ছিলেন না, বহিরঙ্গ ছিলেন। কিন্তু ওই সময় ঠাকুরের কথা বলার মত লোক দরকার, কেশব সেন সেই জায়গাটা নিয়েছিলেন। এ-জিনিস সব মানুষেরই হয়। আপনার যদি এ-ধরণের পাঁচজন লোক না থাকে, যার সাথে কথা বলে সুখ পাবেন, কথা বলা মানে একটা উচ্চস্তরের কথাবার্তা বলা, যদি না থাকে তাহলে আপনার জীবনে কষ্ট আছে বা জীবনে কোন গোলমাল আছে।

আরেকটা হল মূর্তি পূজা নিয়ে যেসব কথা বলা হয়, সেখানে কোন দোষ নেই। আমরা অনেক সময় মজা করে বলি, বাচ্চারা কত নিষ্ঠার সাথে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে পরীক্ষায় যাতে পাশ করে যায়, শিক্ষকের আজ যেন অসুখ করে যায় ইত্যাদি। কিন্তু কিছুই তো হয় না। যদি সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করলেই ভগবান শুনবেন, বাচ্চাদের মত এমন সরল হৃদয় আর কার আছে, ভগবান তো তাদের প্রার্থনা শোনেন না। ভক্তিমার্গ নিয়ে যাঁরা অনেক কথা বলেন, বিশেষ করে খ্রীশ্চানিটিতে powers of prayer নিয়ে অনেক কথা আছে, তাঁরা বলেন যে ভগবান rational prayers দেখেন, আরে ভাই rational prayer আর irrational prayer বলে কিছু হয় নাকি, prayer মাত্রই rational হয়। আমার এটা দরকার, আমার অস্তিত্ব এর উপর দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে বাঁচতে হবে। পরীক্ষায় একটা ছেলে যদি ফেল করে যায়, ক্লাশে তাকে যে মাথা নীচু করে থাকতে হবে, বাড়িতে সবার কাছে মাথ নীচু করে থাকতে হবে, সে কিছুতেই এই জিনিস নিতে পারবে না। সেখানে rational prayer আর irrational prayerএর কি আছে! প্রার্থনা করলে হবে না যে, কে জানে, হতেও তো পারে, হয়ও।

কিন্তু ঠাকুরের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠাকুর এই জগতের সবার উপরে মন রাখতেন, সে নরেন হোক, রাখাল হোক, লাটু হোক আর কেশব সেন হোক, যেই হোক, বাকি সবার উপরে তিনি মন রাখতেন। কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব যেটা, নিজের যে আমিত্ব, সেটা মা কালীর সাথে জড়িয়ে ছিল। কথামৃতে পাতায় পাতায় আমরা দেখি, কিছু হলেই তিনি দৌড়ে মাকে গিয়ে বলছেন। আবার বলতেন, এর ভিতর এক তিনি আছেন আর তাঁর ভক্ত আছে, উনি সেই ভক্তের সাথে নিজেকে identify করছেন, সারা জীবন তিনি মাকে নিয়ে সাধনা করেছেন কিনা। একটা বাচ্চা ছেলে, তার ভাল মন্দ যাই হোক, সে মার কাছেই দৌড়ে যায়। মা তার কথা শুনবে কি শুনবে না তার জানা নেই, মানতে পারে, নাও মানতে পারে। মা যেটাই করুক, বাচ্চা আবদার মার কাছেই গিয়ে করবে। ঠাকুরও ঠিক তাই। তিনি আবদার কার কাছে করবেন? মার কাছেই করবেন। প্রত্যেক আবদারেরই একটা বিধি হয়, বিধি হল ডাব-চিনি, তিনি মা কালীর কাছে কেশবের জন্য ডাব-চিনি মেনেছেন।

সেখান থেকে আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে আসছেন। আমরা আগে দেখলাম মাস্টারমশাই ধ্যান করে এক-একটা দিনের পুরো দৃশ্যটাকে পুনরায় মনের মধ্যে কিভাবে বসিয়ে নিতেন, সেখানে যেমন যেমন ঠাকুর কথা বলেছিলেন, তেমন তেমন তিনি লিখে গেছেন, আমরা তাই ধরে নিচ্ছি ডাব-চিনি মানা থেকে দুম্ করে অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন, এখানে কোন ফাঁক নেই।

টমাস কুককে নিয়ে ঠাকুর বলছেন, "হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক সাহেবও ছিল"। ঠাকুর নিজের মত কথা বলে যাচ্ছেন। "মাস্টার – আজ্ঞা, এইরকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ কিছু জানি না"।

সেখান থেকে আবার ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের অজানা আরেকজনের কথা বলছেন। প্রতাপচন্দ্র হাজরার ভাইয়ের কথা বলছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ – প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুড়বাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলো ছেলেপিলে। আমি বললুম, দেক দেখি ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আরেকজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুড়বাড়ি ফেলে রেখেছে। অনেক বকলুম, আর কর্মকাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়"।

আমরা যদি একশ বছর পিছিয়ে যাই, এমনকি পঞ্চাশ বছর আগেও দেশে খাওয়া-পরার খুব অভাব ছিল। কাজকর্মেরও খুব অভাব ছিল। সারা বিশ্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল, শুধু ভারতবর্ষেই না।

যে ইউরোপিয়ান সভ্যতা এতো এগিয়ে গিয়েছিল, তাদেরও এক সমস্যা ছিল। এরা তখন বিশ্ব জুড়ে লুটপাট করে বেড়াত। ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে ঢুকে সেখানে লুটপাট করত। পুরো ইউরোপিয়ান সভ্যতা লুটাপাটের দেশ ছিল, ইউরোপের সব কটা দেশ জড়িয়ে ছিল। যেমনি নিজের দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিত, অমনি অন্য দেশে গিয়ে লুটপাত করতে শুরু করে দিত। ভারতবর্ষ চিরদিনই ছিল ধর্ম প্রধান দেশ, এদের সেই কালচারটাই ছিল না যে, অন্য দেশে গিয়ে লুটপাট করবে। ফলে যখন অভাব হত তখন মানুষ দেখত কিভাবে একে সামাল দেওয়া যায়।

ভারতবর্ষে কয়েকটা সম্পর্ককে খুব সম্মান দেওয়া হয়, তার মধ্যে একটা হল জামাই, আরেকটা হল সন্তান। এখানে মানুষ নিজে কষ্ট করে থাকবে, কিন্তু সন্তানকে, জামাইকে, নাতিকে কষ্ট পেতে দেবে না। আমাদের এখানে অনেক বড় বড় নামজাদা বক্তারা নারীদের উপর অত্যাচার নিয়ে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু এরা না জানে ইতিহাস, না পড়েছে কোন শাস্ত্র, শুধু বড় বড় কথা বলে যাবে। এরা জানে না যে, মেয়ের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর তাকে বাড়িতে যা সম্মান দেওয়া হয়, অন্য দেশের লোকেরা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। মেয়ে বাড়িতে এসে যা পছন্দ করবে, যেটা নিতে চাইত, পুটলি বেঁধে নিয়ে চলে যাবে, তার বাবা-মা আটকাবে না, ভাই-বোনেরা আটকাবে না, কেউ আটকাবে না। এই ধরণের সুযোগ নিয়ে অনেকে তখন নিজের সন্তানকে শ্বশুড়বাড়িতে রেখে দিত। মহাভারতে নল-দময়ন্তি কাহিনীতে দেখি, নল দময়ন্তিকে এমন ভাবে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন যে, দময়ন্তি বাধ্য হয়ে নিজের বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। মহাভারতেই আবার বিশ্বামিত্রের কাহিনীতেও দেখা যায়, একবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা হয়েছিল, ওই আকালের সময় বিশ্বামিত্র নিজের স্ত্রী-পুত্র সবাইকে শ্বশুড়বাড়িতে রেখে দিয়ে এলেন।

আমরা যেটা জানি, যেটা মানি সবার উপরে আমরা সেটাই চাপাই। যারাই উপদেশ দেয়, সে সন্ন্যাসীই হোক, খ্রীশ্চান ফাদার হোক, পার্টির নেতা হোক, যে যেটা জানে, যেটা করে, যেটাকে ঠিক মনে করে, সেটারই উপদেশ সবাইকে দেয়। ঠাকুর একদিকে ত্রিগুণাতীত, অন্যদিকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, প্রতাপের ভাইকে তিনি এটা বলছেন না যে, তুমি খুব ভাল করেছে, নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করা কি চাট্টিখানি কথা! তুমি এবার সন্ন্যাসী হয়ে যাও। উলটে তিনি প্রতাপের ভাইকে ভর্ৎসনা করছেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এটা খুব unusual, যেমন একদিকে নরেনকে ত্যাগ-বৈরাগ্যের উৎসাহ দিচ্ছেন, অন্য দিকে যাদের মর্কট বৈরাগ্য, অভাব পড়ে বৈরাগ্য হয়েছে, অভাব মিটে গেল বৈরাগ্য চলে গেল, এদেরকে ঠাকুর একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তোমার যে দায়ীত্ববোধ রয়েছে, এটাকে তুমি অবহেলা করে বৈরাগী সাজতে পারো না। গার্হস্থ্য ধর্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর উপর কয়েকটা দায়ীত্ব এসে পড়ে। স্ত্রী-পুত্র, বাবা-মা এদের ভরণ-পোষণের দায়ীত্ব গৃহস্থকে পালন করতে হয়। পরে এক জায়গায় ঠাকুর আবার হাজরার কথায় বলবেন, সে মাকে দেখছে না, মা চিঠি লিখছে, খুড়োকে বলবে প্রতাপকে যেন তিনি একবার দেশে পাঠিয়ে দেন।

ঠাকুর এখানে দেখাচ্ছেন, একদিকে অভাব আছে ঠিকই, অন্য দিকে মানুষ কি রকম দায়ীত্ববোধ শূন্য হয়ে যেতে পারে, তারও বর্ণনা এমনিতেই এসে যাচ্ছে। তার সাথে প্রতাপের ভাইয়ের প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি – দায়ীত্ব তোমাকে পালন করতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাস্টারমশাই এবার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঢুকে গেছেন। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, "তোমার কি বিবাহ হয়েছে"? মাস্টারমশাই বলছেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ"।

এটা হল মাস্টারমশাইর বিশেষ বিশেষত্ব, আমরা যখন কোন কিছু লিখি, লেখার মধ্যে আমাদের ইমোশানস্‌গুলি বাদ চলে যায়। ইংরাজী বলুন, বাংলা বলুন, হিন্দি বলুন, ফ্রান্স বলুন, ভাষার শব্দ

কখনই ইমোশানকে প্রকাশ করতে পারে না। যদি আপনি বলেন, 'আচ্ছা', এই 'আচ্ছা' শব্দের পিছনে দাড়ি আছে, নাকি বিস্ময়বোধক আছে, নাকি প্রশ্ন আছে, এগুলো বোঝা যায় না। আরও মুশকিল হল, ইংরাজী punctuation বা আমাদের হিন্দি, বাংলায় punctuation পরে থাকে। আপনি পুরো বাক্যটা পড়ার পর বুঝতে পারবেন, আরে এটা তো exclamation, আরে এটা তো প্রশ্ন চিহ্ন, স্প্যানিস ভাষায় তাও ওটা প্রথমেই রেখে দেয়। ইমোশানকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে না বর্ণনা করা হয়, তাহলে অনেক কিছু বোঝা যায় না। মাস্টারমশাই এখনে বর্ণনা করছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া) – ওরে রামলাল (ঠাকুরের ভ্রাতষ্পুত্র ও কালীবাড়ির পূজারী) যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে"।

মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে কোথাও ওই আকুতিটা জেগে গেছে, ঠাকুরকে তিনি আপন করে নিতে চাইছেন। ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি নিজেকে যেন অপরাধী মনে করছেন।

ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করছেন, "তোমার কি ছেলে হয়েছে"? মাস্টারের এখন বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে, তিনি বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করে বলছেন, "যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে"।

মাস্টারমশাই বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এখানে দুটো জিনিস দেখার। মাস্টারমশাইকে ঠাকুর এ-ভাবে বলছেন ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য ভক্তদের তিনি এই জিনিসগুলিকেই অন্য ভাবে বলছেন। একজনকে ঠাকুর ভাদ্র মাসের জলের কথা বলছেন, মানুষের ভিতরে যে কাম ভাব থাকে, যদি সেই ভাব প্রবল হয়ে যায়, আর সেটাকে যদি বার না করে দেওয়া হয়, ডিনামাইটের মত বাঁধকে উড়িয়ে দেবে। আবার কাউকে বলছেন, একটা দুটো সন্তান হয়ে যাওয়ার পর ভাই বোনের মত থাকতে হয়। কারণ প্রকৃতি এটাকে নিয়েই চলছে। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে যাবেন, এখানে এই termটা খুব দরকার, কথামৃত উপনিষদের সমান গ্রন্থ, কথামৃত আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে চান, তাঁদের জন্য কথামৃত। কথামৃতে আধ্যাত্মিকতার বাইরেও অনেক কিছু কথা আছে, সংসারে কিভাবে থাকতে হয় এবং আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু মূলত কথামৃত হল, কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম শর্ত হল, you should be free from carrying baggage। বাংলায় খুব সুন্দর বলে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

যাঁদের প্রায়ই প্লেনে যাতায়াত করতে হয় তাঁরা জানবেন, প্রত্যেক প্লেন ছাড়ার আগে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে একই ধরণের কিছু ঘোষণা করা হয়, আবার বলে, আপনারা হয়ত অনেকবার ফ্লাইটে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু তাও আপনারা শুনুন। বলা হয়, যদি প্লেনে কোন গোলমাল হয়, আগে আপনি নিজে নামুন, আগে নিজের প্রাণটা বাঁচান, কোন ব্যাগেজ সঙ্গে নিয়ে নামবেন না। ফ্লাইটের ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্ট সারা বিশ্বে একটা স্টাডি করেছিল, বিপদের সময় নির্দেশিকাগুলি সবাই মানছে কিনা। যত নির্দেশিকা দেওয়া হয় তার মধ্যে একটা থাকে জুতো পরে থাকবেন না, জুতো যেন খোলা থাকে, ইত্যাদি। সত্যিই যখন কোন আপদ বিপদ হয়, প্লেনে আগুন লেগেছে, কিংবা ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করেছে, কেউই একটি নির্দেশিকাও মানে না। সেই জুতো পরে নামে, সেই আপনজনকে সাথে করে নামে, আর নিজের যে ব্যাগ সেটাকে অবশ্যই নিয়ে নামবে, ওটাকে কিছুতেই ছাড়বে না। কত ভাবে ওরা নির্দেশিকা দেয়, এগুলো করবেন না, যাত্রীরা আসল সময়ে কোনটাই মানবে না।

আধ্যাত্মিক জীবনেও আপনাকে প্রথমেই বলবে, যদি তোমাকে বাঁচতে হয়, কোন ব্যাগ যেন না থাকে। মহাবীর জৈনের যে ধর্ম, তাঁরা তো এটাকে চরমে নিয়ে যান, তাঁদের কাছে জামা-কাপড়টাও বন্ধন, সেটাকেও ফেলে দেন। সন্ন্যাস মানেই আমি বিবাহ করব না, সন্তান থাকবে না, যদি ভাই-বোন থাকে তাদের দায়ীত্ব আমার না। কিন্তু মা-বাবার ক্ষেত্রে দেখে নেয় তাঁদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, আর মা-বাবাকে তো নিজের মত দেখি না, তাঁরা বড় করেছেন, তাঁরা তো আমাকে জানেন, তা হলেও মা-বাবার সুবিধা-অসুবিধাটা দেখে নিতে হয়, দেখে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। দেখতে হবে আমি বোঝা মুক্ত কিনা, বোঝা মুক্ত যদি না হয় তাহলে সে নড়াচড়া করতে পারবে না। অনেক সময়

লোকেরা এসে আমাদের প্রশ্ন করেন, ঠাকুরকেও অনেকে প্রশ্ন করতেন, ত্যাগ কি সবাইকেই করতে হবে? আপনি যদি ত্যাগ না করেন, এই যে প্লেনে বলছে, আগে তুমি নিজে বাঁচো, পরেরটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে, সবাইকে মিলিয়েই আমি, সবাইকে নিয়েই চলব, সেটা তার চয়েস। থিয়োরেটিক্যালি আপনি দশটা কথা বলতে পারেন, ঠাকুরও বলছেন, সংসারে কেন হবে না। কিন্তু যে সমাধানগুলি দিচ্ছেন, দেখবেন সেই সমাধনগুলি সব ত্যাগ কেন্দ্রিত সমাধান।

তাহলে সংসারীদের ধর্ম নিয়ে যে কথাগুলো বলছেন, সেগুলো কি? সেগুলো হচ্ছে, ত্যাগ তো তোমার হল না, বিবাহ তুমি করে নিয়েছ, সন্তান হয়েছে, এখন তো এদের ফেলে দেওয়া যাবে না। এখন কি করবে? এরপরে যেটা সব থেকে ভাল পরবর্তি ধাপ, সেটা বলছেন। যে কোন শাস্ত্রের যদি খুব গভীরে যাওয়া হয়, আর যেগুলি সত্যিই আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, সেখানে দেখা যাবে শুধু ত্যাগ, ত্যাগের কথা। বৌদ্ধ ধর্মেও তাই, খ্রিশ্চানিটিতেও তাই, জৈন ধর্মেও তাই। যেগুলো core spiritual religion, তাঁরা সবাই ত্যাগের উপর জোর দেন। ত্যাগ মানেই, আগে তোমার স্ত্রী-পুত্রকে ছাড়তে হবে। কিন্তু এখন তো আর ছেড়ে দেওয়া যাবে না, তুমি বিবাহ করেছ, সন্তান হয়েছে; একটু আগেই বললেন, বিবাহ করেছে এখন কি হবে? তখন ওর মধ্য দিয়েই যতটা ম্যানেজ করা যায়। কিন্তু যদি তুমি বিবাহ না করে থাক, যদি তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে যেতে চাও, তাহলে আর বিবাহ করো না। যদি বলেন, না, আমার আধ্যাত্মিক, ধর্ম এসব ব্যাপারে আগ্রহ নেই, তাহলে ভাই এই গ্রন্থ তোমার জন্য নয়।

অনেকে আবার বলেন, সবাই যদি ত্যাগ করে তাহলে সৃষ্টি কিভাবে চলবে? প্রথম কথা, সৃষ্টির দায়ীত্ব তোমাকে কেউ দেয়নি। দ্বিতীয় কথা, তোমার মন ভোগে, যতই তোমাকে ত্যাগের কথা বলা হোক, তুমি ভোগ করবেই। এখন সবাই ভোগের কথাই বলছে, ভোগ করার জন্য শিক্ষা দিতে হয় না, মানুষ স্বভাবেই ভোগের দিকে যায়। উপদেশ দিতে হলে ত্যাগের উপদেশ দিতে হয়, কারণ মানুষ ওদিকে যাবে না। একটা জিনিসকে ফেলার জন্য ট্রেনিং দিতে হয় না, কিন্তু একটা জিনিসকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। জল নিজে থেকেই নীচের দিকে চলে যাবে, কিন্তু রকেটকে মহাকাশে পাঠাবার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। উপদেশ কখন ভোগের জন্য করা হয় না, সংসারধর্ম করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয় না, মানুষ নিজেই জানে তাকে কি করতে হবে। মানুষের কথা ছেড়ে দিন, একটা কাক, একটা পায়রাও সব জানে, তাদের মস্তিষ্কে সব কিছু instinct এমন ভাবে করা আছে যে, যখন মেটিংয়ের সময় আসে ওরাও দুজনে মিলে বাসা বানাতে শুরু করে। বাসা তৈরী করে সেখানে ডিম পাড়ে, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা বার করে, এগুলো করার জন্য ওদের কারুর কাছে ট্রেনিং নিতে হয় না, instinctly জাগিয়ে দেয়।

এরপরে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ – এসব দেখলে বুঝতে পারি"। এটাকে বলে phrenology, অর্থাৎ মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেখে, তার চোখ কেমন, হাত কেমন, নাক কেমন দেখে লোকটির স্বভাব বলে দেওয়া। এটাকে বলে pseudoscinec, এর মানে হয় ধাপ্পবাজী। বৈজ্ঞানিকরা অনেক ভাবে phrenologyকে প্রমাণিত করে বলছেন, এটা হল pseudoscience। কিন্তু ভারতবর্ষে লক্ষণ দেখে বিচার করার একটা দাম আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কিছু নির্দিষ্ট মাপদণ্ড আছে, যেটাকে অনুসরণ করে তাঁরা চলেন। আমাদের ভারতবর্ষে আমরা অন্য আইডিয়া নিয়ে চলি, একটা পারসেন্টেজ পর্যন্ত আইডিয়া নিয়ে চলি, মোটামুটি যদি এ-রকম থাকে, তাহলে এভাবে হবে। যেমন জ্যোতিষবিদ্যা, যাঁরা খুব উচ্চমানের জ্যোতিষি তাঁদেরও সব কথা মিলবে না, মিলতে পারে না। ওনারা সেইজন্য বলেন, এগুলো হল impelling force, compelling force না। Compelling force হলে Newtonian mechanism এসে যাবে, Newtonian mechanism মানে নিউটনের যে গতির সিদ্ধান্ত, মাধ্যাকর্ষণের যে সিদ্ধন্তগুলি আছে, যেখানে বলা হয়, এভাবেই এটা হবে। Impelling force মানে হয়, গতিপ্রকৃতি এই রকম, মনে

হচ্ছে মোটামুটি এদিকেই যাবে। বিচার করে দেখলে দেখা যাবে সত্তর কি আশি শতাংশ মিলে যাবে। কোন জ্যোতিষি যদি বলে তার শতকরা আশি ভাগ মিলে যায়, বুঝতে হবে সে পরিষ্কার ধাপ্পা মারছে।

ঠাকুর শরীরের লক্ষণ খুব মানতেন। কথামৃতে অনেক জায়গায় আসবে যেখানে ঠাকুর বলবেন, যোগীর শরীর এমন হয়, বিষয়ীর লোকের শরীর এমন হয়, কেউ এলে উনি তার হাত ওজন করে দেখতেন হাত ভারী কিনা, হাত ভারী হলে বলতেন, এ বিষয়ী। এই কথাগুলো বলা হল ভারতের দিক থেকে। দ্বিতীয় কথা, আধ্যাত্মিক জীবন মানেই এই স্থূল জগৎ সব কিছু নয়, স্থূল জগতের যে বিজ্ঞান, এটা শেষ কথা নয়, স্থূল জগতের সত্যগুলো শেষ সত্য নয়। এর সব কিছুর পিছনে এক সূক্ষ্ম জগৎ আছে, এই সূক্ষ্ম জগৎ মানে ইলেক্ট্রন প্রোটনের জগৎ না, এই সূক্ষ্ম জগৎ মনের জগৎ এবং বাস্তবিক জগৎ, যেখানে দেশ ও কালের যে সম্পর্ক, সেটা পুরো অন্য ভাবে চলে।

এই সূক্ষ্ম জগতের পিছনে আছে অন্য আরেক জগৎ, যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে আবার এগুলোর কোনটাই চলে না। এগুলোকে কোন দিন ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, প্রমাণিত করা যাবে না। যেটাকে প্রমাণিত করে দেওয়া যাচ্ছে, তার মানে এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হয়ে গেলেই এটা স্থূল জগৎ হয়ে যাবে। সূক্ষ্ম জগতের পিছনের যে জগৎ, এই জগৎকে একমাত্র ধ্যানের গভীরেই জানা যায়। কিন্তু একবার জানা হয়ে যাওয়ার পর তখন সূক্ষ্ম জগৎটা উচ্চ সত্য হয়ে যায়, আর এই স্থূল জগৎটা তখন নিম্ন সত্য হয়ে যায়। তার মানে, আমাদের এই যে শরীর চলছে, এই শরীরের পিছনে আরও বড় শক্তি চলছে, যে শক্তির ব্যাপারে আমরা জানতে পারি না, শুধু ধ্যানের গভীরেই জানা যায়। ধ্যানের গভীরে গিয়ে ঋষি-মুনিরা সেটা জানার পর আমাদের জানান। শরীরের লক্ষণ, যেটাকে পাশ্চাত্য জগতের বিচারে pseudoscience বলে, কিন্তু আমাদের কাছে এটা পুরো বাস্তবিক। যদিও এটাকে নিয়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে, বইটই ঘাটলে পেয়ে যাবেন, কিন্তু বিজ্ঞান রূপে নয়, বিজ্ঞান রূপে মানে যেখানেই লাগাবেন সেইখানেই এটা খাটবে, ওই অর্থে এখানে আসবে না।

তাছাড়া এর একটা intuitive দাম আছে, intuitive মানে যার মন যত শুদ্ধ, তিনি সেটাকে তত ভাল জানতে পারেন। বিজ্ঞান মানেই হয় objective science, অর্থাৎ বিজ্ঞান বলে, তোমার মন যেমনই থাকুক, জিনিসটা এই রকম। নিউটনের গতির উপর সিদ্ধান্তগুলি ভাল লোকের জন্যও তাই, মন্দ লোকের জন্যও তাই। কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এসে যায় বা কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আধ্যাত্মিক দিক থেকে হয়েছে, সেখানে তখন ওটা ও-ভাবে চলে না। ঠাকুর এখানে লক্ষণের কথা বলছেন, আমরা পরে পরেও দেখি যে, ঠাকুর যার নামে যেটা বলেছেন, সেটাই সত্য হয়ে গেছে।

মাস্টারমশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বিবাহ হয়েছে কিনা, সন্তানাদি হয়েছে কিনা। মাস্টার বললেন, বিবাহ হয়েছে, একটি ছেলে হয়েছে। এরপরে ঠাকুর বলছেন, "আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি"?

এই যে পর পর তিনটে কথা গেল, বিয়ে হয়েছে কিনা, সন্তান হয়েছে কিনা, পরিবার বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যা শক্তি। যদি আমরা কথাগুলোকে ভাসা ভাসা দেখি, তখন মনে হবে, ঠাকুর যেন মাস্টারের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ে টানাটানি করছেন, ঘরের খবর নিচ্ছেন। ইদানিং কালে অনেকের কাছেই এই ধরণের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করাটা ঘোরতর আপত্তিকর। এই দৃশ্যটা আরও বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় যে, মাস্টারের সাথে ঠাকুরের এই দিনেই প্রথম সরাসরি কথাবার্তা শুরু হয়েছে। প্রথম কারুর সাথে দেখা হওয়ার সময় আমরা ভদ্র থাকার চেষ্টা করি, নিজেকে ভদ্র ভাবে সামনের লোকটির কাছে নিয়ে যাই। ঠাকুর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখতে যাচ্ছেন, তিনিও তখন ভদ্র হয়ে যাচ্ছেন, মাস্টারমশাইকে আবার জিজ্ঞেস করছেন, জামার বোতামগুলো ঠিক আছে কিনা। কিন্তু ঠাকুর ওই ভাব বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারতেন না। দু-এক মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি স্বাভাবিক হয়ে যেতেন।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়, বাচ্চাকে যদি কোন মিটিং বা পার্টিতে নিয়ে যান, কিছুক্ষণ ঠিকঠাক থাকে, কিন্তু তারপরে বাচ্চাদের যা স্বভাব, সেই স্বভাবে চলে যায়। একটা মজার কাহিনী আছে।

রাম-রাবণের যুদ্ধের পর সব দলবল নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। মা সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, সুগ্রীব, হনুমান, বানররা আমাদের জন্য এত কিছু করল, এদেরকে একদিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করাতে হবে। সুগ্রীব, হনুমানকে খবর দেওয়া হল। সবাই এবার শ্রীরামচন্দ্রের দেওয়া ভোজ পার্টিতে যাবেন। হনুমান ভাবছেন, এই চঞ্চলমতি বানরগুলিকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি, এদের যা স্বভাব, আমাদের বদনাম না হয়ে যায়। হনুমান তাই সব বানরদের একত্রিত করে বলছেন, দেখ আমাদের বানরজাতির খুব দুর্নাম, আমাদের মন চঞ্চল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চঞ্চল। তোমরা সব সময় আমার দিকে লক্ষ্য রাখবে, আমি যেমনটি করব, তোমরাও সবাই তাই করবে। সবাই গেছে, ওদের সবাইকে ফল, মূল খেতে দেওয়া হয়েছে, বানর কিনা। হনুমান যেভাবে কলা ছাড়িয়ে খাচ্ছেন, বানরগুলোও সেইভাবে কলা ছাড়িয়ে শান্ত ভাবে খাচ্ছে। এরপর হনুমান একটা সবেদা ফল নিয়েছেন। সবেদ ফলটা টিপতে গিয়ে কি করে বীচিটা বেরিয়ে গেছে। বানরগুলো ভাবল, তাহলে আমাদেরও সবেদার বীচিটা কোন রকমে বার করতে হবে। একজন একটু জোরে টিপেছে, সবেদার বীচিটা একটু লাফিয়ে উপরের দিকে গেছে, এটা করে সে একটু হাসি দিয়ে অন্য বানরদের দিকে তাকিয়েছে। ওই দেখে আরেকটা বানর আরও জোরে টিপেছে, তাতে সবেদার বীচিটা আরও উপরে গেছে। আর যতক্ষণে হনুমান কিছু ইঙ্গিত দেবেন, ততক্ষণে বানরগুলো নেমে গেল কে কত জোরে টিপে বীচিকে উপরে পাঠাতে পারে। ওরা মনে করছে এটাই আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা, আমাদের এটাই করতে হবে। সবাই টিপছে আর বীচিগুলি উপরের দিকে গিয়ে ছিটকে পড়ছে। সীতা ও শ্রীরাম অবাক হয়ে দেখছেন। হনুমান আর ওদের আটকাতে পারছেন না। ততক্ষণে সব বানররা ফ্রী মুডে এসে গেছে, ওরা বুঝে গেছে এটাই আজকের উদ্দেশ্য, ফলটাকে টিপে বীচিটাকে কত উপরে পাঠানো যায়। এরপর শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি, হৈচৈ, এ বলছে আমার বীচি সবার উপরে গেছে, আরেকজন বলছে, না, আমার বীচি বেশী উপরে গেছে। ব্যস্, ওই থেকে নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি, ধস্তাধস্তি থেকে মারামারি শুরু হয়ে গেল। বাচ্চাদের যদি কোন পার্টিতে, বিয়েবাড়িতে নিয়ে যান, বেশীক্ষণ ওরা শান্ত থাকতে পারবে না, কিছুক্ষণ পরেই নিজের ফর্মে চলে আসে। ঠাকুরেরও তাই হত, কিছুক্ষণ পরেই তিনি তাঁর স্বরূপে চলে আসতেন। স্বরূপে চলে আসা মানে, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব কিছু অবস্তু, মিথ্যা। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওদের ছেলেমানুষীটা সত্য, বাকি বাবুগিরিটা মিথ্যা। ঠাকুরের কাছেও বাবুগিরিটা মিথ্যা।

কিন্তু তারপরে যেটা হত, তা হল – সংসারে যাবতীয় যা কিছু আছে সব অনিত্য, এর কোন দাম নেই, আর দ্বিতীয় ঈশ্বর বৈ ঠাকুর কিছু জানতেন না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলতে পারতেন না। একটা কি দুটো সাংসারিক কথা বলার পরেই তিনি ঢুকে যেতেন ঈশ্বরীয় কথায়। আর ব্যবহার কালে সে যত বড়লোক হোক, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বভাবে চলে যেতেন। যাঁরা সত্যিকারের নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁদের এই স্বভাবটা হয়। ইংরাজীতে Ayan Rand এর একটা নামকরা উপন্যাস আছে, The Fountain Head। Objectivism একটা ফিলজফি, সেটাকে আধার করে এই উপন্যাস লেখা হয়েছে। সেখানে হাওয়ার্ড রোয়াক প্রধান চরিত্র, একজন আরকিটেক্ট, কিন্তু সে বিদ্যাটাকে জানতে চায়, ডিগ্রীতে তার কোন ইন্টারেস্ট নেই। সেখানেই তার সাথে আরেকজন পড়ত, তার আবার বিদ্যার থেকে ডিগ্রী ইত্যাদিতে খুব আগ্রহ।

একবার হাওয়ার্ড রোয়ককে একটা কোম্পানী থেকে একটা বাড়ির ডিজাইন তৈরী করতে বলা হয়েছে, সে খুব সুন্দর ডিজাইন বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোম্পানীর লোকেরা নিজের মত ডিজাইনটাকে পাল্টে দিয়েছে। যে ভদ্রলোক বাড়ি বানাবার জন্য আদেশ দিয়েছে, সে বার বার খালি আপত্তি করছে, এটা ঠিক হচ্ছে না, ওটা ঠিক হচ্ছে না। হাওয়ার্ড রোয়ককে কোম্পানী থেকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, তুমি কখন মুখ খুলবে না, যে অর্ডার দিয়েছে সে যেন জানে কোম্পানীর লোকেরাই ডিজাইন বানিয়েছে, তুমি

এর মধ্যে জড়িয়ে নেই। কিছুক্ষণ হওয়ার পর হাওয়ার্ড রোয়ক আর নিজেকে চুপ করে রাখতে পারল না। সে উঠে পেনসিল আর ইরেজার নিয়ে ওখানে গিয়ে যেগুলো পালটানো হয়েছিল, তার সব কটাকে মুছে নূতন করে লাইন এঁকে বলছে, This is the real। যিনি বাড়ি বানাবেন, তিনি দেখে অবাক, তিনি নিজেও ডিজাইনের ব্যাপারে খুব talented ছিলেন, বলছেন যে, 'আমি তো ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম'। On the spot কোম্পানি তাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিল। আর সেই ভদ্রলোক ওর কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে চলে গেল, 'এ-রকম জায়গার জন্য তুমি ফিট নও'। বিদ্যাতে যখন কেউ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকে যদি বলা হয়, তুমি চুপ করে থাকবে, তুমি কিছু বলতে যাবে না। কিছুক্ষণ ভদ্র সেজে থাকবে, কিন্তু কতক্ষণ, একটু পরেই সে তার স্বরূপে চলে আসবে। তখন ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে যেমন ভাবে বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে, ওই ভাবে বলবেন। সে তুমি সাহিত্য সম্রাট হও আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হও, ঠাকুরের কাছে এগুলো তখন খড়কুটোর মত মনে হবে।

এখানে ঠাকুর একজন লোক, যার লক্ষণগুলি ভাল, আধ্যাত্মিক জীবন যার খোলা, তার খুঁটিনাটি ব্যাপারে জানতে চাইছেন। বিবাহ তো হয়ে গেছে, একটা দিক বরবাদ হয়ে গেল, সন্তানও হয়ে গেছে, এই লোকটার পুরো শক্তিটা এখন স্ত্রী-সন্তান সামলাতেই বেরিয়ে যাবে। শেষ একটা সুযোগ, যদি স্ত্রী বিদ্যাশক্তির হয়, ধর্মের সহায় হয়। বিদ্যাশক্তি মানে যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে ঈশ্বরের দিকে প্রেরিত হতে সাহায্য করে। অবিদ্যাশক্তি হল, যে স্ত্রীর কাছে সংসারের সুখ আর সংসার বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কথামৃতে পরে পরে ঠাকুর অনেকগুলো উপমা দেবেন। যেমন এক জায়গায় বলছেন, স্ত্রী খেদ করছে, কেমন লোকের সাথে বাবা-মা আমার বিয়ে দিলেন, না আমি নিজে খেতে পেলুম, না নিজের বাছাদের খাওয়াতে পারলুম! আমি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজনকে জানি, যেখানে ভদ্রলোকের মন ধর্মের দিকে ছিল, কিন্তু স্ত্রীর মনটা সংসারের দিকে এমন আকৃষ্ট ছিল যে, তাদের সম্পর্কটা স্থায়ী হল না। ওরা বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেরা আলাদাই হয়ে গেল। যাদের ঠিক ঠিক ঈশ্বরে মন আছে, কোন কারণে তার স্ত্রী যদি অন্য রকম হয়, সাংসারিক জীবনে তাদের মধ্যে খুব অশান্তি লাগে।

মাস্টারমশাই তখন না বুঝে পরিবার সম্বন্ধে বলছেন যে, "আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান"। কারণ মাস্টারমশাইয় নিজের সংস্কার অনুযায়ী জানেন, লেখাপড়া না জানাটাই অজ্ঞান। ঠাকুর অধ্যাত্ম বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, এখন অধ্যাত্ম বিদ্যার যে পরিভাষা, তার যে ভাব, স্বাভাবিক ভাবেই তার সাথে খাপ খাওয়ার জন্য মাস্টারকে বেশ কিছু সময় দিতে হবে। যাঁরা আমাদের ক্লাশগুলো প্রথম প্রথম শোনেন, এই সমস্যা তাঁদেরও হয়। আপনারা বাইরের জগৎ থেকে এসে শাস্ত্রের কথা শুনছেন। শাস্ত্রের যে শব্দগুলি আমরা ব্যবহার করছি, সেই শব্দগুলি আগে আপনারা কোনদিন শোনেননি। অনেক শব্দ হয়ত আগে শুনেছেন, কিন্তু সেই শব্দের যে প্রকৃত ভাব বা অর্থ সেটা আপনার কাছে এক রকম ছিল, কিন্তু আসলে এটা অন্য রকম। আর তৃতীয় যেটা আরও অসুবিধা হয়, আধ্যাত্মিক জগতে শব্দের একটা অর্থ হয়, কিন্তু বাংলা ভাষায় তার অর্থ অন্য রকম হয়, ফলে বোঝার ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁক তৈরী হয়। মাস্টারমশাইয়ের এই সমস্যাটা ছিল। শুধু মাস্টারমশাইর না, যারাই ঠাকুরের কাছে যাবে বা যারাই কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে যাবে, তাদের সবারই এই সমস্যা হবে।

ফিলজফারদের মধ্যে এম্যুনাল কান্ট খুব বিখ্যাত ছিলেন। বলা হয়ে যে, কান্টের ফিলজফি কেউ বুঝতেই পারবে না। যে প্রফেসাররা কান্টের ফিলজফি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তাঁরাও বোঝেন না। কান্টের বৈশিষ্ট্য হল, উনি একটা শব্দ ব্যবহার করবেন, সেই শব্দগুলি হবে প্রচলিত জার্মান ভাষায়। এরপর উনি ওই শব্দকে ব্যাখ্যা করতে আট দশ পাতা নেবেন, উনি এই শব্দ দিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন। ধরুন বাংলায় একটা শব্দ নেওয়া হল – অমর, আপনি অমর মানে জানেন। কান্ট এবার অমর শব্দকে ব্যাখ্যা করতে দশ পাতা নেবেন অমর বলতে উনি কি বোঝাতে চাইছেন। যতক্ষণ আপনি দশ পাতা পড়ে নেবেন, ততক্ষণে আপনি ভুলে যাবেন, উনি কি বলতে চাইছিলেন। এরপর ওনার ফিলজফিটা নূতন শব্দাবলী দিয়ে চলবে, এই শব্দগুলি তাঁর মাতৃভাষা জার্মান থেকেই এসেছে, কিন্তু তার

অর্থ আলাদা। এরপর তিনি যেটা লিখবেন, সেটা আর আপনি বুঝতে পারবেন না, সেইজন্য বলা হয় কান্টকে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু ফিলজফিত তাঁর যে অবদান, কল্পনাই করা যায় না।

কারুর কাছ থেকে যদি কেউ বিদ্যা নিতে যায়, তখন প্রথমে তাঁরা ভাষাটা শিখতে হয়। যাঁরা আচার্য হন, তাঁরা কখন শিষ্যের ভাষায় শিক্ষা দেবেন না, শিষ্যকে আচার্যের ভাষা শিখতে হয়। স্বামীজী বলছেন, আচার্যকে শিষ্যের স্তরে নামতে হয়। আচার্যরা শিষ্যের স্তরে নামছেন ঠিকই, কিন্তু ভাষাটা সব সময় থাকে আচার্যের। সেইজন্য কেউ যদি মনে করেন, উপনিষদ, বেদ সব বাংলায় শিখে নেবেন, কোন দিন তাঁর বেদ, উপনিষদ শেখা হবে না, ওটার জন্য আপনাকে সংস্কৃতই জানতে হবে। ঠিক তেমনি, কথামৃতের বিদ্যাকে যদি আয়ত্ত করতে হয়, তাহলে তাকে বাংলা শিখতে হবে, বাংলা না জানা থাকলে, কথামৃতের যত ভালই অনুবাদ থাকুক, বোঝা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুরের ভাবে না আসা পর্যন্ত, ওই শব্দের যে বিশেষ অর্থ বোঝা যাবে না, মাস্টারমশাই যেমন অবিদ্য আর অজ্ঞানকে গুলিয়ে ফেলছেন। ঠাকুর যখন অবিদ্যা বলছেন, সেখানে ঠাকুরের ভাব হল, তার মধ্যে বিষয়বুদ্ধি আছে কিনা, সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে কিনা।

ঠাকুর তখন বিরক্ত হয়ে বলছেন, "আর তুমি বুঝি জ্ঞানী"? বলতে চাইছেন, তুমিও একই অবস্থায় আছ। এই কথাগুলো বলাতে মাস্টারমশাইয়ের মনে একটু একটু লাগছিল। ঠাকুরই বলে যাচ্ছেন।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে"? এই জায়গায় কথামৃতে একটা প্যারাগ্রাফ আছে, যেখানে বলছেন, মাস্টার (অবাক হইয়া স্বগত)। আমি প্রথম যখন কথামৃত পড়েছিলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল, এই প্যারাগ্রাফটা ভুলে এখানে বসানো হয়েছে, একটু পরে আসার কথা। ম্যাচ করাবার জন্য মাস্টার কি বলছেন, আমরা একটু পরে বলছি।

মাস্টার বলছেন, "আজ্ঞা, নিরাকার – আমার এইটি ভাল লাগে"। এই বাক্যটাতে আমার খুব হাসি পায়, মাস্টারমশাই কিছু বই পড়েছিলেন ঠিকই, শাস্ত্র কিছু জানতেন ঠিকই, কিন্তু তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁর মধ্যেও ছিল, সেই প্রভাবে বললেন, নিরাকার – আমার এইটি ভাল লাগে। কে নিরাকার, কিসের নিরাকার, কিসের সাকার, কিছুই জানা নেই, আমরাও একটা বলতে বলেছেন বলে দিলাম। ঠাকুর পরে তাঁতিদের নামে বলবেন, কামারপুকুরের ওদিকে তাঁতিরা থাকত, ঠাকুর হয়ত সেখানে তাঁত বোনা দেখতে যেতেন। ঠাকুর বলছেন, ওদেশে তাঁতিরা আছে, তারা তাঁত বোনে আবার বলে উনি কোন কৃষ্ণ মানেন। ঠাকুর বিদ্রুপ করে বলছেন, এদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। আমাদেরও তাঁতিদের মত অবস্থা, আপনি নিরাকার মানেন, না সাকার মানেন।

ঠাকুর একটা দুটো কথা বলতেন, সেই কথার জবাবে সামনের লোক দুটো কথা বলল, সেই কথার সূত্র ধরে ঠাকুর এরপর কথা চালিয়ে যেতেন। মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে ঠাকুর বলছেন, "তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে"।

যে প্যারাগ্রাফটা আমরা ছেড়ে এসেছি, ওই প্যারাটা এখানে ম্যাচ করে। ওই প্যারাতে মাস্টারমশাই বলছিলেন, (অবাক হইয়া স্বগত) – "সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ-বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ-বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস – দুধ, কি আবার কালো হতে পারে"?

ধর্মের বড় দুশমন অধর্ম নয়, ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু objectifyersরা, যারা ধর্ম মানে না, তাদেরকে বরং ধর্ম বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ধর্মকে যারা objectify করে দেয়, objectification মানে, জিনিসটা এই এই, যেমন এই পেন আছে, এটা গরু না, ছাগল না, এটা পেন। এই ভাব নিয়ে যারা ধর্মে আসে, এরা হল ধর্মের বড় শত্রু, এদের আর কোন মতে কিছু বোঝান যাবে না। দক্ষিণ ভারতের ধর্মের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবেন, সেখানে ওরা ধর্ম নিয়ে সব সময় মারামারি করে যাচ্ছে। শৈবরা, শিবের ভক্তরা বৈষ্ণবদের সহ্য করতে পারে না, শৈব রাজারা হয় তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিত, নাহলে হাতি দিয়ে পিষে দিত, নয়তো চোখ উপড়ে নিত। সাধুরা কখন এসব করতে যাবেন না। বৈষ্ণবরা যখন ক্ষমতায় আসত তখন তারাও শৈবদের উপর এই একই কাজ করত। আর এই সমস্যা দাক্ষিণাত্যে এখনও চলেছে। কর্ণাটকে নির্বাচনের সময় এখনও শৈব ও বৈষ্ণব নিয়ে প্রচুর ঝামেলা চলে, প্রার্থি ঠিক করার সময় বলবে ওরা শৈব কম্যুউনিটি, ওরা বৈষ্ণব কম্যুউনিটি।

স্বামীজী ঘন্টাকর্ণের কাহিনী বলতেন, একজন লোক সে শিবের ভক্ত। লোকেরা তাকে হরিবোল হরিবোল বলে খেপাতো। শেষে সে কানে দুটো ঘন্টা লাগিয়ে দিল। কেউ হরি বললেই সে মাথাটা দুলিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে দিত, যাতে হরির নাম পর্যন্ত কানে না যায়। শিব তখন ঠিক করলেন একে শিক্ষা দিতে হবে। শিবের একটা মূর্তি তৈরী করা হল যার অর্দ্ধ শিব, অর্দ্ধ বিষ্ণু। শিব ভক্ত তখন শিবের যেটা পা সেখানে ফুল দেয়, বিষ্ণুর পায়ে দেয় না। উপরে তাকিয়ে দেখে, যে ধূপটা জ্বলছিল তার সুগন্ধপূর্ণ ধুয়ো দুটো নাকেই যাচ্ছে। লোকটি তখন উঠে বিষ্ণুর দিকের নাকের ছিদ্রে তুলো গুঁজে দিল, যাতে বিষ্ণুর নাকে ধূপের সুগন্ধ না যায়। তখন শিব যেন জীবন্ত হয়ে গেলেন, তিনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন, ঘন্টাকর্ণ! তুমি একটা অসুর, এক্ষুণি তুমি অসুর হয়ে যাও। এটাই হল objectification, ভগবানকে objectify করে দিয়েছে। আমরাও নিজেদের objectify করে রেখেছি, বলছি, আমরা মানুষ। জিনিসটা তিনটে স্তরে চলে, সবার উপরে আসে সিদ্ধান্ত, তার নীচে আসে ব্যক্তিত্ব, সেখান থেকে আসে আমরা একজন ব্যক্তি। যখন একজন ব্যক্তি হয়ে গেল, তার মানে তাকে আমরা objectify করে দিলাম।

ঠাকুরের গল্প আছে, বৈষ্ণবরা বলে, কৃষ্ণ হলেন সবার কাণ্ডারী, তিনি আমাদের ভবসাগর পার করান, যারা শাক্ত, তাদের কোন দিন উদ্ধার হবে না। শাক্তরা আবার বলে, আমাদের মা হলেন রাজরাজেশ্বরী তিনি কেন নৌকা চালাতে যাবেন, নৌকা চালাবার জন্য তিনি কৃষ্ণকে চাকর করে রেখে দিয়েছেন, কৃষ্ণই পার করান, কোন সন্দেহ নেই। এগুলো হল মতুয়ার বুদ্ধি, এগুলো হল ধর্মের গোঁড়ামি। আমরা বড় বড় শব্দ নিয়ে আসি, কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যায় সমস্য ওই একটি জায়গায় - objectification। ধর্মের যে কোন জিনিসকে যদি objectification করে দেওয়া হয়, কি কি, প্রথমে হল ঈশ্বর, ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বরের নাম, এগুলোকে যখন objectify করে দেওয়া হয়, তাহলে বুঝবেন, এবার আপনি ধর্মের শত্রু হয়ে গেলেন, ঘন্টাকর্ণ হয়ে গেলেন। যারাই ধর্মের নামে মারামারি, খুনোখুনি, দাঙ্গা করে, এরা সবাই হল ঘন্টাকর্ণের সন্তান, মানে অসুরের সন্তান। এদিকে বলতে থাকে আমার ঈশ্বর নিরাকার, কিসের নিরাকার তুমি তো আগেই objectify করে দিয়েছ। তোমরা হলে চরমতম পৌত্তলিক, আবার অন্যদের বলে তোমার ধর্ম পৌত্তলিক ধর্ম। তোমাদের জন্য সাকার শব্দ আনা উচিতই না, এত সলিড মূর্তি পূজা তোমরা কর যে, বড় হাতুড়ি মেরেও ওই মূর্তি ভাঙা যাবে না। তোমরা নামেই নিরাকার, আইডিয়াকে তোমরা objectify করে দিয়েছ, personificationও করছ না, আইডিয়াকেই objectification করে দিচ্ছ।

ঠাকুর এই জায়গাতে objectificationএর বিরুদ্ধে বলছেন। ঈশ্বর একেরও পারে, দুইএরও পারে, সব কিছুর পারে, আর কত কি তিনি হতে পারেন, তাঁর ইতি করা যায় না। এগুলো যখন শুনবেন বা পড়বেন, তখন একটা জিনিস বুঝবেন যে, যখনই কেউ ধর্মকে নিয়ে জোর দিয়ে বলে, এটাই সত্য, হয়ত সে ঠিক বলছে, কিন্তু বুঝবেন ধর্মকে সে objectify করে দিল। ধর্মকে objectify করে দেওয়া

মানে, ধর্মকে শেষ করে দিল, সে যে ধর্মই হোক। যখন বলছে, যীশুই একমাত্র ঈশ্বর বা আমাদের বৈষ্ণবরা যখন বলে কৃষ্ণই ভগবান, ধর্মকে objectify করে দিল। যদি আপনাকে জানতে হয়, ধর্মের এটা ঠিক কিনা, এটা সত্য কিনা, তাহলে প্রথমেই আপনি দেখুন ধর্মকে objectify করছে কিনা। Objectify করে দেওয়া মানে, জিনিসটাকে একটা বস্তু বানিয়ে দিল।

বেদান্তে বলছেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি আত্মা এটাই সত্য। অহং আর ব্রহ্মকে পরিভাষিত করার সময় ওনারা বার বার বলেন, তোমার দেহ-ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত আমিত্বটাকে সরাও, আর ব্রহ্ম ওটা কোন বস্তু না, ওটাকেও সরাও, তারপর যে সত্যটা থাকবে, সেটাই সত্য, ওটাকে ওনারা objectify করেন না। ঠাকুর যখন বলছেন, নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য, তখন তিনি কোন রকমেই এগুলোকে objectify হতে দিচ্ছেন না।

আমাদের মন, আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় প্যাটার্ন খোঁজে, আমরা সব সময় একটার সাথে আরেকটাকে মেলানোর চেষ্টা করি, সব সময় কার্য-কারণের সম্পর্ক দেখতে চাই, আমরা সবাই হলাম নিউটোনিয়ান ফিজিক্সের ভক্ত। নিউটোনিয়ান ফিজিক্স মানে, এত এনার্জি দিলে এর এত ভেলসিটি হবে, সে এতটা দূরত্ব যাবে। এটা হল objectification of science। কার্য আর কারণ, এটা করলে এটাই হবে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি দেখতাম, ওখানকার ক্লাশ ফাইভ সিক্সের ছেলেদের মধ্যে একটা সরলতার ভাব থাকে। কোন একজন ছেলে হয়ত বলল তার নাম অমুক, আরেকজন ছেলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে বলল যে ওর নাম এই। যদি নামের মিল হয়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলবে, আরে বাঃ। একবার বিদ্যালয়ে বড় এক কোম্পানির ম্যানেজার এসেছেন, তাঁর নাম ধরুন প্রণব ছিল। ক্লাশ সেভেনের একটি ছেলের সাথে পরিচয় করলেন, পরিচয় হতেই ছেলেটি নিজের নাম বলেছে, ভদ্রলোক বললেন, আমি প্রণব, বলেই ছেলেটির হাত মেলালেন। ছেলেটি হাত মিলিয়ে খুব দুঃখ করে বলছে, কিন্তু আমার নামের সাথে ওনার নামটা মিললো না তো। নাম যদি মেলে তবেই হ্যাণ্ডশেকিং হবে, নাম না মিললে হ্যাণ্ডশেকিং হবে না। পরে ভদ্রলোক আমাকে এসে বললেন, এরা কি কিউট না! বাচ্চারা এই রকম কিউট, কি কিউট, প্যাটার্ন খোঁজে। সেইজন্য বাচ্চা হাত মেলাচ্ছে, কিন্তু ঠিক জমল না। কারণ মন সব সময় প্যাটার্ন খোঁজে, প্যাটার্ন যদি না থাকে, আমাদের মস্তিষ্ক এত সীমিত যে, মস্তিষ্ক ছটফট করতে শুরু করে দেয়। খুব সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার পরিচিত জনরা আশা করেন আমি একভাবে আচরণ করব। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন আমি ওভাবে আচরণ করলাম না। এবার এসে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে দেবে, আচ্ছা তুমি এভাবে কেন এই রকম আচরণ করলে, এটা তুমি কেন করলে, এটা তুমি কি করে করলে ইত্যাদি। কারণ ওর প্যাটার্নে মিলছে না। এরপর অনেক বছর পরেও তার এটা হতে থাকবে, আমি ভাবতেই পারছি না, কি করে সে আমার সঙ্গে এই রকম করল। সারা জগতের সঙ্গে করলে আপত্তি নেই, আপনার সাথে করেছে বলে আপত্তি করছেন।

প্যাটার্নে আনা মানেই হয়, objectification, প্যাটার্নে আনা মানেই হয় মার্বেল পাথরের মত বসিয়ে দেওয়া। আপনি যদি বিচার করে দেখেন, জীবনে সবচেয়ে বড় মিথ্যা হল কার্য-কারণ সম্পর্ক। তার মানে, হিন্দুদের কর্মবাদ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তার সাথে নিউটোনিয়ান ফিজিক্স হল সবচেয়ে বড় মিথ্যা, কারণ কার্য-কারণে সত্যিকারের কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক নিতে পারে না, নিতে পারে না বলে আমরা ওটাকে একটা প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে কোন রকমে জীবন চালাই। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একজন মহারাজ কর্মবাদ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ তাঁকে খুব সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলছেন, 'লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, এটা মানছ তো'? 'হ্যাঁ মহারাজ মানছি'। 'তার মানে কোথাও একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। বাকিটা ওই ভাবেই মেনে নাও, কারণ এর যদি উত্তর খুঁজতে যাও কোন দিন এর উত্তর খুঁজে পাবে না, মাঝখান থেকে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে'। জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর লাভ, জীবনের উদ্দেশ্য হল একটা লক্ষ্যে পৌঁছানো। লক্ষ্যে কার্য-কারণের একটা খুব বেসিক রিলেশানশিপ আছে। যার জন্য যখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স এলো, fundamental

perticales যখন বেরোল, বৈজ্ঞানিকদের মাথা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলে অবাক লাগে এরাই আবার নিজেদের বৈজ্ঞানিক বলে। বৈজ্ঞানিক মানেই এনারা সব সময় কার্য-কারণের সম্পর্ক খুঁজবে। আরে ভাই কার্য-কারণের সম্পর্ক না আছে ভগবানের, না আছে ভগবানের জগতে আর না আছে তোমার fundamental perticlesএ।

যারা জিজ্ঞেস করে ধর্ম কি বিজ্ঞান ভিত্তিক, ধর্ম কি যৌক্তিক? এবার ওদের জিজ্ঞেস করুন, আচ্ছা বিজ্ঞান কি ধর্ম মানে, বিজ্ঞান বলতে তোমরা কি বোঝ? বিজ্ঞান বলতে ওরা একটাই জিনিস বোঝে – কার্য-কারণের সম্পর্ক। অথচ বিজ্ঞানের যে বেসিক জিনিস ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন পুরো এ্যটোমিক ফিজিক্সে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। কখন কোনটা মানবে, কোনটা মানবে না, সেটাও তাদের ঠিক নেই। একটা এ্যটম ছোট্ট জিনিস, তার মধ্যে ইলেক্ট্রন ঘুরছে, বলে যে যদি আপনি জানতে পারেন ওই এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন কোন জায়গাতে আছে, তাহলে আপনি তার ভেলসিটি জানতে পারবেন, তার গতি জানতে পারবেন না। আর যদি তার ভেলসিটি জেনে যান, তাহলে সে কোন জায়গাতে আছে সেটা জানতে পারবেন না। আমরা তো এখানে ফিজিক্সের ক্লাশ করছি না, যাঁদের ফিজিক্সের একটু জ্ঞান আছে তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন। তার মানে কার্য-কারণ সম্পর্ক খুব সীমিত একটা জায়গাতে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। জলতেষ্টা পেয়েছে, জল খেলে তেষ্টা মিটে যাবে, লঙ্কা খেয়েছেন ঝাল লাগছে, ব্যস এর বেশী কিছু নেই। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এত সীমিত যে, যতক্ষণ কোন কিছুকে কার্য-কারণে না নিয়ে আসতে পারছি, ততক্ষণ আমরা ওটাকে নেব না। সেইজন্য আমাদের জ্যোতিষ বিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়, হাতের রেখা দেখে বলুন আমার কি হবে? যদি তাতে না হয়, তাহলে কুষ্টি দেখে বিচার করে বলুন আমার কি হতে যাচ্ছে। সব কার্য-কারণ সম্পর্ক। অথচ দেখবেন বেশীর ভাগই মিলছে না। দুটো শালিক দেখলে আমাদের দিন ভাল যাবে, বেড়াল রাস্থা কেটে দিলে খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে, আমরা সব সময় প্যাটার্ন খুঁজি। আমাদের মন, আমাদের মস্তিষ্ক প্যাটার্ন ছাড়া থাকতে পারে না। যেমনি আপনাকে বলা হল, কখনো এটা এই রকম হয়, কখনো অন্য রকম হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনি ধাঁধায় পড়বেন না, আপনার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

বাচ্চারা চায় ওদের জামা প্যান্টে অনেকগুলো পকেট থাকবে। অনেক পকেট দেওয়া জামা দিলে ওরা খুব খুশী হয়। কারণ চকলেট এই পকেটেও রাখতে পারবে, ওই পকেটেও রাখতে পারবে। আর যদি দুটো কি একটা পকেট থাকে, চকলেট দিলেন, সব পকেট ভরে গেল, এরপরে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমাদের মস্তিষ্কও ঠিক তাই। মস্তিষ্ক জিনিসগুলিকে নিয়ে গুছিয়ে নেয়, যখন নিতে পারে না, তখন মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এরপর মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

ধর্মে কোন কার্য-কারণ চলে না। কার্য-কারণে যাওয়া মানেই হল জমাটিকরণ। মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে প্রথম আসছেন, ওনার যে বিচারধারা, সেটা একেবারে জমাট বাঁধা। বিচারধারাগুলো সব objectified, তিনি বুঝতে পারছেন না যে, নিরাকার যদি সত্য হয়, সাকার তাহলে কিভাবে সত্য হবে। নিরাকার-সাকার যখন আবার আসবে তখন আমরা আলোচনা করব – নিরাকারই সাকার কি করে হয়। এটা বলার পর মাস্টারমশাই শেষ একটা চেষ্টা করার জন্য বলছেন, "আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিশ্বাস যেন হল! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন" –

মাস্টারমশাই সাকার থেকে এবার পৌত্তলিক পূজাতে নেমে এলেন। মা কালী আছেন, আচ্ছা ঠিক আছে ব্রহ্মই কালী, কালীই ব্রহ্ম, এটা না হয় মানলাম। কিন্তু মা কালীর প্রতিমা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা তো ঠিক না।

ঠাকুর এবার পুরো আধ্যাত্মিকতায় নামছেন, "মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা"। আমরা বেলুড় মঠের মন্দিরে যাই, সেখানে ঠাকুর আছেন, ঠাকুরের বিগ্রহ আছে। তখন আমরা ঠাকুরকে কিভাবে দেখছি? যখন প্রণাম করছি, তখন কি ঠাকুরকে একজন জীবন্ত মানুষ রূপে দেখি? যদি দেখি, তখন

ওটাই হল চিন্ময় প্রতিমা। এখানে মা কালীকে চিন্ময়ী বলছেন। এই ভাবকে আনার জন্য বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষ করে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরগুলো রয়েছে, ভগবান বিষ্ণুর মন্দির যেখানে যেখানে আছে, বৈষ্ণব পরম্পরায় যে বিগ্রহগুলো রয়েছে সেগুলোকে ওনারা একেবারে জীবন্ত বলে মনে করেন। পুরীধামের জগন্নাথ মন্দিরে সকালে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে ঘুম থেকে তোলা হয়, দাঁত মাজানো হয়, স্নান করান হয়, বস্ত্র, আভূষণ সব পরানো হয়, সব কিছুই মন্ত্রোচ্চারণ করে করে করানো হয়, কারণ তাঁকে একেবারে সাক্ষাৎ জীবন্ত দেখা হচ্ছে।

কিন্তু ঠাকুর এখানে জীবন্ত বলছেন না, বলছেন চিন্ময়ী, চিন্ময়ী মানে চৈতন্যময়ী। চৈতন্য আর জীবন্তে তফাৎ আছে। জীবন্ত হল, যেখানে প্রাণন ক্রিয়া চলছে, আর চৈতন্য হল, যেখানে এমন একটা চেতনা আছে, যে চেতনা থেকে সমস্ত চেতনাগুলো বেরিয়ে আসে। এটা বোঝার পক্ষে একটু কঠিন। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, যিনি চৈতন্য, জীবন সেখান থেকে আসে, আর চৈতন্য অখণ্ড, চৈতন্য কখন খণ্ডিত হয় না। জীবন যেন খণ্ডিত হয়ে যায়। এটাকে বোঝার জন্য আমরা সাধারণ ভাষায় বলে দিই, যেন জীবন্ত। বলতে চাওয়া হচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের যে প্রতিমা রয়েছে, এটা কোন প্রতিমা না, মা সাক্ষাৎ এখানে অবস্থান করছেন। মজার ব্যাপার হল, ঠাকুর যত দিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ভক্তরাও যেন ওটা বুঝতে পারতেন যে, মায়ের বিগ্রহ যেন জেগে উঠেছেন, যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

ভারতে কিছু কিছু মন্দির আছে, আর সেই সব মন্দিরে যত বিগ্রহ আছে, ওখানকার পূজারীরা ও স্থানীয় লোকেরা বলবেন, এই মন্দিরের বিগ্রহ জাগ্রত। জাগ্রত বিগ্রহ মানেই হয়, কোন এক সময় সেখানে কোন এক সাধক ছিলেন, যিনি সাধনা করে ওই বিগ্রহের সাক্ষাৎ করেছেন। বিড়লা মন্দিরের বিগ্রহকে কেউ জাগ্রত বিগ্রহ বলবে না, ওর মন্দিরটাও শোভা, তার বিগ্রহটাও শোভা। অথচ কোন অজ গ্রামে যদি চলে যান, আর সেখানে যদি কোন পোড়ো মন্দির দেখেন, সেখানকার লোকেরা বলবে, এই মন্দিরের দেবতা জাগ্রত। তার মানেই হল, কোন এক সময় কোন একজন সাধক ওখানে সাধনা করেছিলেন এবং তিনি সেই দেবতার সাক্ষাৎ করেছেন। সেইজন্য কোন প্রতিমাকে যে আপনি চিন্ময় বলবেন, খুব উচ্চস্তর থেকে বলতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক ওই ভাবে চিন্ময় বলা যায় না, যখন কেউ সাধনা করে ওই বিগ্রহের দর্শন করেন তবেই সেই বিগ্রহকে ঠিক ঠিক জাগ্রতা দেবতা বলা যাবে। আর যাঁরা এক জায়গাতে সাক্ষাৎ করে নেন এখানকার বিগ্রহ জাগ্রত দেবতা, তাঁরা তখন বুঝতে পারেন সমস্ত বিগ্রহগুলো জাগ্রত, প্রকাশের তফাৎ থাকে। ঠাকুরও পরে পরে প্রকাশের তফাৎ, শক্তির তফাৎএর কথা বলবেন।

তারপর বলছেন, "মাস্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত"। ধর্ম বিশেষের লোকেরা বলে, অন্যান্য ধর্মের যারা তারা নরকে যাবে, নরকে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে ধর্মান্তর করতে হবে। ইউরোপিয়ানরা যেখানেই গেল, তাদের পিছন পিছন খ্রীশ্চান পাদরিরা সেখানে হাজির হয়ে গেল। তার গিয়ে বলতে শুরু করল, এরা সব হিঁদেন, সবাই এরা নরকে যাবে। এদেরকে বাঁচাতে হবে, সেইজন্য এদেরকে খ্রীশ্চান বানাতে হবে। সমারসেট মম্ খ্রীশ্চান ধর্মের উপর এত খাপ্পা ছিলেন যে, তিনি কোন রাখ-ঢাক না রেখে বলতেন যেখানেই খ্রিশ্চানিটি গেছে সেখানেই ওদের সাথে ওদের যৌনরোগ গুলিও গেছে। যারা খ্রীশ্চানিটির উপর বিরক্ত, তারা খ্রীশ্চানিটিকে নিয়ে অনেক নোংরা নোংরা কথা বলে।

ঠাকুর তখন বলছেন, "(বিরক্ত হইয়া) তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া"।

অন্য জায়গায় ঠাকুর বলবেন, কলকাতার লোকগুলি হুজুগে আর লেকচার দেবে। এই লেকচার দেওয়া, এই যে চলছে চলবে, চলবে না চলবে না, এটা আজকের কথা না, ঠাকুরের সময়েও এইসব

ছিল। কলকাতার লোকেরা সব কিছুতেই অন্যদের বোঝাতে শুরু করে দেবে, বিস্তারে বোঝাবে, আর যে কোন বিষয়ে লেকচার দিয়ে দেবে। বেশীর ভাগ সময় নিজেদের কোন কথা বলবে না, অমুকে কি বলেছেন, তমুকে কি বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নেতাজী বলেছিলেন, গান্ধীজী বলেছিলেন, আরে ভাই তোমার নিজের কিছু বক্তব্য থাকলে বলো না। লেকচার দেবে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের কোন বক্তব্য নেই, অপরকে কোট করে চালিয়ে যাবে। স্বামীজী মাস্টারমশাইকে বলছেন, প্রথমের দিকে আমরা এটা উল্লেখ করেছিলাম, তোমাদের ঠাকুর অরিজিনাল ছিলেন, তোমরাও সবাই অরিজিনাল হও। লীলাপ্রসঙ্গ পড়ুন, একটা অরিজিনাল স্টাইল, কথামৃত পড়ুন, একটা অরিজিনাল স্টাইল, অক্ষয় সেনের পুঁথি পড়ুন, একটা অরিজিনাল স্টাইল, সবটাই এক একটা অরিজিনাল। আর ঠাকুরের কথাগুলো পড়ুন, কোথাও কোন কিছুর সাথে মিল পাবেন না। এত ধর্মগ্রন্থ, এত শাস্ত্র, এত আচার্যদের কথা, কারুর সাথে কোন কিছু ঠাকুরের সাথে মেলে না, অথচ সেই একই কথা বলে গেছেন, কথাগুলো সেই এক, অথচ সবটাই অরিজিনাল। সেইজন্য ঠাকুর যেখানে সেখানে লেকচারবাজী, উপদেশ দেওয়া, একেবারেই পছন্দ করতেন না।

ঠাকুর আরও বলছেন, “আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীবজন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, অন্য এ-উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ওই মাটির প্রতিমাপূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না – তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যাথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয় তার চেষ্টা কর”। মাস্টারমশাই বলছেন, “এইবার তাঁহার অহংকার বোধ হয়ে একেবারে চূর্ণ হইল”।

মাস্টারকে ঠাকুর অনেকগুলো কথা বলেছেন। এর মধ্যে যেটা মূল হল যে, ডারউইনের theory of evolution কতটা সত্যি আমরা জানি না, কিন্তু spiritual evolution, এটাকে আমরা পুরোপুরি মানি। আমাদের যোগশাস্ত্র, পুনর্জন্মবাদ এগুলো spiritual evolution এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, not of species of individual। আমরা এটাও জানি, যেমন evolution হয় তেমনি inevolutionও হয়, মানুষ যেমন এগোয় আবার তেমনি পিছোয়। ভাল কর্ম করলে এগিয়ে যায়, মন্দ কর্ম করলে পিছিয়ে আসে।

ঠাকুর পরে বলছেন, “যদি মাটিরই হয়, সে-পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার জগৎ তিনিই এ-সব করেছেন –অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন”। যেমন যারা স্কুলে যায়, কলেজে যায়, সবাই তারা একই ক্লাশে পড়ে না, ঠিক তেমনি যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে আছেন সবার জন্য এক উপায় থাকতে পারে না। খুব মূল্যবান কথা, গীতাতেও বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*। যদিও আধ্যাত্মিক সত্য হল, যেখানে সমস্ত কর্ম খসে পড়ে যায়, কিন্তু এখনও যারা সংসারে আসক্ত, কর্মের প্রতি যাদের আসক্তি আছে, তাদের বুদ্ধিভেদ করতে নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তির উপায়

মাস্টারমশাই খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করছেন, “ঈশ্বরে কি করে মন হয়”? এই টপিকটা কথামৃতে ঘুরে ঘুরে আসবে। ঠাকুর খুব সংক্ষেপে বলছেন, “ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর তার সাথে সৎসঙ্গ – ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়”। ঈশ্বরে কি করে মন হয়, এই ব্যাপারে ঠাকুর আরও কিছু বললেন। কিন্তু মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথা শুনে মনে হয় খুব

একটা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, যেমন সর্বদা ঈশ্বরের নামগুণগান করা লোকেদের পক্ষে সম্ভব না। ঠাকুর দু-চারটে কথা বলার পরই মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করছেন।

"মাস্টার (বিনীতভাবে) – সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে"?

ঠাকুর উত্তরে যেটা বলছেন, এটা ঠাকুরের খুব পপুলার কথা, কথামৃত যাঁরা পড়েন তাঁরাও এই কথা ঠাকুরকে অনেকবার বলতে দেখতে পাবেন। যে কোন ধর্মের দুটি রূপ থাকে – প্রথমটা হয় আধ্যাত্মিক রূপ আর দ্বিতীয়টা হয় ধর্ম রূপ। কিন্তু বলার সময় দুটোকে মিলিয়ে শুধু ধর্মই বলা হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও ধর্মে অনেক তফাৎ আছে। আধ্যাত্মিক হল, মানুষ যখন নিজেকে পুরোপুরি ঈশ্বরে দিয়ে দেয়, ধর্ম হল, যখন একদিকে সংসারকেও রাখছে অন্যদিকে ঈশ্বরকেও রাখছে। ফিজিক্স, কেমস্ট্রি যে কোন সাবজেক্টরই একটা core value থাকে, যেমন বিজ্ঞানকে বলা হয় পিওর সাইন্স, আর যখন ওটাকে প্রয়োগ করা হয় তখন টেকনলজি হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ধর্মকে যখন বিজ্ঞান রূপে দেখবেন, এটা তখন হয়ে গেল আধ্যাত্মিক। Pure scienceএর যেমন কোন practical untility নেই, তেমনি আধ্যাত্মিক দিকে আধ্যাত্মিকতার কোন practical utility নেই। আইনস্টাইন যেমন একজন পিওর সাইন্সের লোক ছিলেন, তেমনি পিওর ফিজিক্সেও প্রচুর লোক থাকবেন, এনারা সব সময় একটা আইডিয়া ওয়ার্ল্ডে ঘুরে বেড়ান। সেখানে তাঁরা নূতন নূতন তথ্য দেখছেন, চমৎকৃত হচ্ছেন, তারপর সেটাকে নিয়ে বলছেন। এরপরে কখন সখন দেখা যায়, তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান যে ওই জিনিসটাকে এই জগতে প্রয়োগ করা যাবে। যখন ওটা প্রয়োগ করার অবস্থায় এসে যায়, তখন ওটার নাম এসে যায়।

মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম তড়িৎ শক্তির আবিষ্কার করলেন। গবেষণা করতে গিয়ে উনি লক্ষ্য করতে লাগলেন তড়িৎ শক্তি এভাবে এভাবে আসছে, সলিউশান এ-ভাবে রাখলে, কয়েলগুলো এ-রকম করে রাখলে মনে হচ্ছে কয়েলের মধ্য দিয়ে একটা শক্তি যেন প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানকার রানী ফ্যারাডের কথা শুনেছেন, তিনি তড়িৎ শক্তির পরীক্ষা দেখতে এসেছেন। সব দেখার পর রানী জিজ্ঞেস করছেন, এ-জিনিস মানুষের কি কাজে লাগবে? রানীর প্রশ্নের দুটো উত্তর পাওয়া যায়। একটা উত্তর হল, নূতন শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কেউ কি বলতে পারে না, বড় হয়ে এই শিশু কি করবে? আমিও তড়িৎ শক্তি কি কাজে আসবে, এক্ষুণি কি করে আমি বলব। এর আরেকটা উত্তর, যেটা ফ্যারাডে মজা করে আরেকজনকে বলেছিলেন, এমন কোন দিন আসবে যেদিন এটার জন্য হয়ত আপনাকে ট্যক্স দিতে হবে? ঠিক তাই হল, আজকে ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়া আমরা আমাদের জীবন-যাপনের কথা কল্পনাই করতে পারি না। মাইকেল ফ্যারাডে নিজের মত গবেষণা করে যাচ্ছেন, তথ্য যেগুলো আসছে, সেগুলোকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন, করতে করতে হঠাৎ একটা জগৎ যেন তাঁর জন্য খুলে গেল। সেটাই পরে পরে ক্রমশ এগিয়েই চলেছে।

একজন খুব নামকরা ঐতিহাসিক বলছিলেন, ভগবান বুদ্ধ ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বে জন্ম নিয়েছেন নাকি ৫৩৪ খ্রীষ্টপূর্বে জন্ম নিয়েছেন, এক বছর আগে বা এক বছর পরে তাতে কি আসে যায়, এর কোন দাম নেই। কিন্তু ওই জিনিসটাকে বার করার পর যদি আপনার মনে হয়, আমি আমার জীবনের পরম আনন্দ পেয়ে গেলাম, তবেই আপনি ইতিহাস বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন। ইতিহাসের বিষয় কার জন্য? শুধু এতটুকু, ভগবান বুদ্ধ ৫৩৬ খ্রষ্টপূর্বে না ৫৩৪ খ্রীষ্টপূর্বে, এটাকে একেবারে ঠিক ঠিক জেনে গেলেন, তাতে ওই যে আনন্দ, এটাকে আপনি আর কাউকে বলে বোঝাতে পারবেন না, এই আনন্দটা শুধু আপনার নিজের।

একজন খুব মজা করে নিউটনকে নিয়ে তাঁর একটা কাহিনীতে লিখেছিলেন, নিউটন তখনও বিবাহ করেননি, আপেল গাছ থেকে পড়ল আর সেটা দেখার পর তাঁর মাথায় অনেক দিন ধরে গাছ

থেকে মাটিতে আপেল পড়ার ব্যাপারটা ঘুরছিল। অনেকে বলেন এই গল্পটা আষাঢ়ে গল্প, আমরা সঠিক জানি না, এই ঘটনাটা সত্য নাকি মিথ্যা। তবে পপুলার যে গল্পগুলো থাকে, তাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে নেই। বলছেন, নিউটন যদি বিবাহ করে থাকতেন, আর গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখলেন, আর ওটা দেখে চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে হতে শুরু হল, যে শক্তি আপেলটাকে গাছ থেকে নীচে নামাচ্ছে, সেই শক্তি সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী সবাইকে ঘোরাচ্ছে; আপেলটা কুড়িয়ে দৌড়ে এসে স্ত্রীকে যদি এই কথাগুলো বলতে শুরু করতেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে কি বলতেন? 'এতো দেখছি একটা বদ্ধ পাগলের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে'। বাস্তবিক ঠিক তাই হয়। যাঁরা ঠিক ঠিক জ্ঞানের প্রতি যান, তাঁদের জীবনটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়।

আর এই জ্ঞানকে যখন জীবনে নামাতে হয়, তখনও ওটা আবার একটু অন্য ধরণের হয়। এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হল, আমাদের বেদান্তের উপনিষদ ঈশাবাস্যোপনিষদ বলছেন, যাঁর এই জ্ঞানটা হয়ে গেছে – আত্মাই আছেন, সে তখন শোক মোহের পারে চলে যায়। এই জ্ঞানের কথা উপনিষদেই বলে দিচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন দিন বেদান্তকে ঠিক ঠিক ভাবে দৈনন্দিন জীবনে নামানো হয়নি। সমস্ত উপনিষদ আজ থেকে ছ-সাত হাজার বছর আগে এই জ্ঞানের কথা বলেছেন, আমাদের জানা নেই বেদ-উপনিষদ কত পুরনো। স্বামীজী এসে প্রথম বললেন, বেদান্তকে জীবনে নামানো যায়, নিয়ে এলেন প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। স্বামীজী বিদেশে লেকচার দিচ্ছেন, ভারতে দিচ্ছেন, যেখানেই লেকচার দিচ্ছেন, শুরু করছেন এই বলে, তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা। আরে ভাই, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' উপনিষদের বুনিয়াদ, স্বামীজী নূতন কি আর বলছেন। প্রত্যেকটি ধর্মের যেমন নিজস্ব একটা প্রাণ থাকে, ইসলাম ধর্মের যেমন প্রাণ হল আল্লাই আছেন, তেমনি হিন্দুদের প্রাণ হল 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমিই সেই ব্রহ্ম। কিন্তু এই জ্ঞানকে একজন হিন্দু নিজের উপর প্রয়োগ করে দেখুন তো কি হয়? আপনি তাহলে শুদ্ধ আত্মা। শুদ্ধ আত্মা মানেই, আপনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তার মানে আপনার জীবনও নেই, মৃত্যুও নেই, তার মানে দাঁড়ায় আপনার মধ্যে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান, আপনার ভিতর অনন্ত জ্ঞান বিদ্যমান। ওই জ্ঞানটাকে আপনিই ঢেকে রেখেছেন। অন্য কে ঢেকে রাখতে পারবে, যিনি অনন্ত শক্তিমান, তাঁকে কে ঢেকে রাখতে পারবে?

বাদশা আকবর একদিন দরবারে এসে তাঁর পার্ষদদের বলছেন, 'আজকে একজন আমার গোঁফ ধরে টেনেছে, তাকে কি করা যেতে পারে, আপনারা ভেবে বলুন'। সবাই এক বাক্যে বলে দিল, এক্ষুণি তার শিরোচ্ছেদ করে দেওয়া হোক। বাদশা দেখছেন, বীরবল কিছু বলল না, চুপ করে বসে আছে। বীরবলকে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি বিচার'? বীরবল বলছেন, 'তাকে কোলে নিয়ে একটা বড় করে চুমু দিতে হবে'। সবাই অবাক, বীরবল এ কি কথা বলছে? কার এত সাহস আছে যে আকবরের গোঁফ ধরে টানবে। কারণ আকবর তাঁর ছোট্ট নাতিকে কোলে নিয়েছেন, নাতি গোঁফ ধরে টেনে দিয়েছে।

স্বামীজীর যে প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, যে applied philosophy, সেখানে এটাই বলা হচ্ছে, তুমি শুদ্ধ আত্মা, তুমি সর্বশক্তিমান, তোমার ভিতরেই সমস্ত জ্ঞান, তুমি যদি নিজেকে আবদ্ধ মনে কর, সেটা তুমি অনুমতি দিয়েছ বলেই আবদ্ধ মনে করছ। তুমি অনুমতি না দিলে কে তোমাকে শাসন করতে যাবে, তুমি তো বাদশা আকবরের থেকেও ক্ষমতাশালী। স্বামীজী যখন আধ্যাত্মিকতাকে পুরো ব্যবহারিকে নিয়ে আসছেন, তখন এটাই পুরো অন্য একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছ। আধ্যাত্মিকতাকে যখন সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তখন আমরা তাকে বলছি ধর্ম। যেখানে বলা হয়ে থাকে, এই এই আচরণ করবে, এই এই কাজ করবে না, সকাল বিকাল ঠাকুরের নাম করবে, স্বাধ্যায় করবে, এগুলো ধর্ম। সাধারণ মানুষ যারা সংসারে আছে, তাদের জন্য শুধু ধর্মের এই ব্যবহারিক দিকটাই না, ধর্মের অন্যান্য জিনিসগুলিকে যতটা সম্ভব তরলিত করা যেতে পারে, ততটা করে তাদের জন্য ছেড়ে দিতে হয়, তা নাহলে ধর্মকে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না। কারণ তাদের মন সংসারে এত আসক্ত হয়ে আছে যে, এদের জীবনশৈলী নিজের স্ত্রী, নিজের স্বামী, নিজের সন্তানাদি, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব এর মধ্যেই কেন্দ্রিত

হয়ে আছে, এর মধ্যেই মনটা ঘুর ঘুর করতে থাকে, ওর থেকে বেরোতে পারে না। কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, সেইজন্য ঈশ্বরকেও ধরার চেষ্টা করে, আবার সংসারকেও আঁকড়ে থাকে, যাতে এটাও না হাতছাড়া হয়ে যায়।

ঠাকুর আর স্বামীজীর মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ আছে। স্বামীজী ছিলেন একেবারে কাঠখোট্টা সন্ন্যাসী, তিনি যখনই কিছু বলছেন, একেবারে ঘোর অদ্বৈতের কথা বলছেন, এটাই সত্য, এতেই তোমরা লেগে যাও। অন্য দিকে ঠাকুর সবাইকে নিয়ে চলছেন। সংসার থেকে মানুষগুলো জীবনের একগুচ্ছ সমস্যা নিয়ে আর মাথায় একটা বিরাট বোঝা নিয়ে যখন ঠাকুরের কাছে আসছেন, তখন ঠাকুর তাদের একটু উৎসাহ দিচ্ছেন। স্বামীজীও লোকেদের উৎসাহ দিচ্ছেন, উৎসাহ দিয়ে সারা দেশকে জাগাচ্ছেন, কিন্তু উৎসাহ দেবার স্টাইলটা তাঁর পুরো আলাদা।

যার জন্য এতগুলো কথা বলা, সেটা এবার বলতে হচ্ছে, যিনি যে ফিল্ডে থাকেন, তাঁর কাছে সেই ফিল্ডকে মনে হয় খুব মূল্যবান। স্বামীজী একটা গল্প বলতেন, যারা সারাংশ হল, nothing like leather। শত্রুরা রাজ্য আক্রমণ করেছে। রাজা জিজ্ঞেস করছেন, কি করা যেতে পারে? যারা লোহার কাজ করে তারা বলল, একটা লোহার প্রাচীর দিয়ে দেওয়া হোক। যারা কাঠের কাজ করে, তারা মজবুত কাঠের কথা বলল। এইভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে এবার চর্মকারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। চর্মকার চামড়া দিয়ে কাজ করে, সে বলল চামড়ার মত জিনিস হয় না, চামড়া দিয়ে মুড়ে দিন। তখন মনে হবে, ঠাকুর ছিলেন, তিনি মায়ের নাম করতেন, ঈশ্বরীয় কথা বলতেন, তিনি যে সবাইকে সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের নামগুণগান করতে বলছেন, ওই কারণেই বলছেন। না, জিনিসটা কামার বা চর্মকারদের মত নয়। তফাৎ হল, যারা উপদেশ দেয়, বা যার অপরকে নিজের দিকে টানতে চায়, মানে নিজের ফিল্ডে, এদের জ্ঞান খুব সীমিত জ্ঞান হয়। ইদানিং কালের ম্যাগাজিন, বইগুলি যদি পড়েন, সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি দেখেন, দেখবেন সবাই সবাইকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। কেমন উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি নিজের মন দিয়ে জগৎকে যেভাবে দেখছেন, জগৎকে যেমনটা বুঝছেন, সেই অনুরূপ তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়ে যাবেন। ঠাকুর কিন্তু জগৎকে যথাবৎ দেখছেন।

ইদানিং দেখবেন পজিটিভ এনার্জি নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে প্রচুর কথা বলা হয়, ইলেক্ট্রিসিটিতে যেভাবে পজিটিভ নেগেটিভ হয়, এনার্জিতেও তাই নিয়ে আসছে। এনার্জির আবার পজিটিভ নেগেটিভ কি, এনার্জি এনার্জি, এনার্জির সাথে পজিটিভ নেগেটিভের কি সম্পর্ক? আমার জানা নেই। অথচ পজিটিভ ইমোশানস্ নেগেটিভ ইমোশানস্ নিয়ে কত লেখা, কত বই, কত লেকচার, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে কোথাও আমরা পজিটিভ ইমোশানস্ নেগেটিভ ইমোশানস্ পেলাম না, emotions are emotions। কাম, লোভ এগুলো ইমোশানস্, ঠাকুর বলছেন এই সংসার চলছে কাম দিয়ে। অন্য দিকে এই কাম যদি সন্ন্যাসীর এসে যায় তাঁর মহাবিপদ, এই কাম যদি বুড়ো বয়সে কারুর এসে যায়, তারও বিপদ ঘটে। ইমোশানস্ কিসের পজিটিভ, কিসের নেগেটিভ! কিন্তু একটু শিক্ষা অর্জন করে নিয়েছে, কোন ভাবে একটু জ্ঞান পেয়ে গেছে, তাতে মনে করছে জগতের সমস্ত জ্ঞান সে পেয়ে গেছে। আর শুধু নিজের উপরেও না, অপরের উপরেও প্রয়োগ করতে শুরু করে দেয়।

ঠাকুর সে-রকম না, জগৎ এই, তিনি যথাবৎ দেখছেন, আর ওটাই বলছেন। সাধারণ শিক্ষক আর সাধারণ জ্ঞানীর সাথে অবতারের এখানেই তফাৎ হয়ে যায়। একজন সাধারণ শিক্ষক আর একজন প্রফেটের প্রধান তফাৎটা হল, সাধারণ শিক্ষক evolve করেন। যেমন আমি এখানে ক্লাশ নিচ্ছি, আমি বলছি আপনারা আমার কথাগুলো শুনছেন, এখানে আমিও যেন evolve করছি। যেমন যেমন ক্লাশ নিচ্ছি, আমার বুদ্ধিরও তেমন তেমন বিকাশ হচ্ছে। ঠাকুরের বা যীশুর বা বুদ্ধের এই জিনিস হবে না। কথামৃতের পাতাগুলিকে যদি উল্টোপাল্টা করে দেওয়া হয়, আপনি বলতে পারবেন না, ঠাকুর কোন

কথাটা আগে বলেছেন, আর কোন কথাটা পরে বলেছেন। কারণ তাঁরা ওই জ্ঞানে বা ওই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন।

এখন মাস্টারমশাই জানতে চেয়েছেন সংসারে কিভাবে থাকতে হয়। ঠাকুরকেও এবার বলতে হবে সংসারে কিভাবে থাকতে হয়। এই সমস্যাকে আমাদের শাস্ত্রকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রের যে core spirituality, যেটা এই আলোচনার শুরুতে বলা হল, এনারা applicationএর দিকে তাকান না, স্বামীজীর মত খুব উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্বের লোকেরা বলে বেরিয়ে যান। আমাদের প্রধান হল উপনিষদ, উপনিষদ হল যেখানে ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম যেটা, আধ্যাত্মিকতা যেটা, সেটাকে বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ শুধু না, বড় বড় জ্ঞানী, পণ্ডিতরাও উপনিষদের কথাকে নিতে পারবে না। মানুষ সব কিছু চাইছে, আমার সংসার আছে, সংসার চালাবার জন্য আমার টাকা-পয়সা লাগবে, আমার সুখভোগও লাগবে। ঠাকুরও অনেকবার বলবেন, এদের যোগ আর ভোগ দুটোই চাই। ভোগটা বেশী চায়, যোগ অল্প একটু, যাতে কোনটাই নষ্ট না হয়ে যায়। সমান সমান হবে তাও না, কারণ সমান সমান বলে এখানে কিছু হবে না। ভোগ আর যোগ যদি সমান সমান করতে যায়, ভোগ পুরোপুরি উড়ে যাবে। যোগের সাংঘাতিক শক্তি, অল্প এক শতাংশও যোগ যদি বেড়ে যায়, সংসারকে উড়িয়ে দেবে। রোমা রোঁলার খুব নামকরা কথা – ভারতের যে পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস, তার মূর্তরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। উপনিষদে যা আছে, বেদে যা আছে, পুরাণাদিতে যা আছে, রামায়ণ মহাভারত ধর্মের যে শিক্ষা দেন, ওনাদের সবার যা বক্তব্য, একই জিনিস কথামৃতে একটা জায়গায় এসে যাচ্ছে। ঠাকুরকে অনেকে সংসার নিয়ে, সংসারে থেকে ধর্ম করাকে নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, ঠাকুরও বলছেন, কেন হবে না।

কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রের যদি গভীরে যান, তাহলে দেখবেন ওনারা বলে দিচ্ছেন, এ-ভাবে হয় না, সংসারে থেকে হয় না। মুণ্ডক উপনিষদে এটাকে খুব সুন্দর দেখানো হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদের শুরুতেই আচার্যদের পরম্পরার কথা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বিদ্যা এই আচার্যের কাছে যায়, ওই আচার্যের কাছ থেকে অমুক আচার্যের কাছে যায়। আচার্য শঙ্কর সেখানে ভাষ্য দিতে গিয়ে বলছেন, ওই পরম্পরার মধ্যে যদিও কয়েকজন গৃহীর নাম আছে, কিন্তু এই বিদ্যাটা সন্ন্যাসীদের জন্যই। আপনাদের কাছে মনে হতে পারে এটা কেমন যেন নেগেটিভ কথা। না, একেবারেই নেগেটিভ কথা নয়। একবার যদি বোঝার চেষ্টা করেন, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ঈশ্বর, আত্মার যে জ্ঞান, এই জ্ঞান জিনিসটা কি, আপনারা দেখবেন সব জায়গাতে এনারা বলবেন, সমস্ত কিছুর ত্যাগ না হলে এই জ্ঞান হয় না। কারণ ঈশ্বর হলেন চৈতন্য আর সংসার হল জড়। জড় আর চৈতন্য কখন মিলতে পারে না, সম্ভবই না। যেমন একটা খুব সাধারণ উপমা, একটা লোহ চুম্বক হয়ে গেছে, ওই চুম্বক যখন অন্য একটা লোহার কাছে যাবে, তখন লোহাটাকে প্রথমে চুম্বক বানিয়ে নেয়, তারপর তাকে টেনে নেয়। অন্যান্য ধাতুর উপর চুম্বক কাজ করবে না। প্রপার্টি গুলি যতক্ষণ সমান না হয়, ততক্ষণ এক অপরকে টানবে না। টানার পর শেষ পর্যন্ত পুরো জিনিসটা এক হয়ে যায়। চৈতন্য আর জড় দুটো বিপরীত ধর্মী, বিপরীত ধর্মী হওয়ার জন্য এক অপরকে আকর্ষণ করতে পারে না। সেইজন্য মানুষ রূপে আমরা কোন দিনই ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারব না। চৈতন্য সত্তা আমাদের মধ্যে আছে বলেই আমরা ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের দিকে এগোতে চেষ্টা করি।

যীশুও যেমন বলছেন, you cannot serve man and God at the same time, এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না। সব ধর্মই একই কথা বলে। ঈশ্বর মানে ঈশ্বর, ওখানে আর কোন আপোষ করা যাবে না। তাহলে বাকি লোকেদের কি হবে? কেশব সেন ঠাকুরকে বলছেন, মনটা যেন ঈশ্বরে ডুবে থাকে। ঠাকুর মজা করে বলছেন, তাহলে চিকের পিছনে যারা আছে এদের কি হবে? অর্থাৎ স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ যারা আছে এদের কি হবে? সংসার আছে কি নেই, এটা প্রধান না, এটা

আমার চোখের সামনে আছে, এটাকে অস্বীকার করা যাবে না, জগতের অস্তিত্ব আছে কি নেই, এটা একটুও গুরুত্বপূর্ণ না। আমি এই সংসার দেখতে পাচ্ছি, আমি সংসার ছাড়তে পারব না।

এখন দুটো পথ খোলা, হয় সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে যাও, আর তা না হলে ঈশ্বরের কথা ভুলে যাও, আধাআধির কিছু নেই। না, শাস্ত্র কখন এই ধরণের কথা বলেন না, শাস্ত্র হল মায়ের মত। মা যেমন সন্তানকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিতে থাকে, শিক্ষাটা একবার দুবার চেষ্টায় না নিতে পারলে মা কখনই সন্তানকে নিরুৎসাহিত করে বলেন না যে, তোর দ্বারা কিছু হবে না। শাস্ত্রও ঠিক সেই ভাবে মানুষকে উৎসাহিত করেন, ঠাকুরও সবাইকে উৎসাহিত করছেন, কেন হবে না, হবে। উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ঠাকুর কি উপদেশ দিচ্ছেন? না, ঠিক সেই উপদেশই দিচ্ছেন, যে উপদেশ উপনিষদ দিচ্ছেন। ঠাকুর নিজের মত যে কিছু বলে দিচ্ছেন, তা না। দেখবেন, আপনারা যখন কোন কিছু পড়বেন, কোন উপদেশ পেলেন, প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেন, আমি আপনার কথা কেন মানব? যে কোন লোক যদি বলে, আপনাকে এটা করতে হবে। প্রথমেই জিজ্ঞসে করতে হয়, কেন করব? দেখবেন তার কাছে এর উত্তর নেই। আগেকার দিনে যারা শক্তি থাকত, ক্ষমতা থাকত, টাকা থাকত, তলোয়ার উঁচিয়ে সে যা বলত লোকেরা সেটাই মেনে নিত। কিন্তু ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়া এসে এমন হাসি-মজা করে, পড়ে হাসিও পায়। তোমার শাস্ত্রকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলছ, আমি কেন তোমার শাস্ত্রকে মানব? স্বামীজীও বারবার বলছেন, যে কোন ধর্ম বলবে, আমার ধর্ম এই, আমার শাস্ত্র এটা বলছে, সেইজন্য এটাই সত্য। কিন্তু আমি তোমার শাস্ত্রকে মানি না। এরপর কি হবে? ঠিক আছে তুমি তোমার তলোয়ার বার কর, ফয়সালা হয়ে যাবে আমার ধর্ম, আমার শাস্ত্র সত্য কিনা। তার মানে যুক্তিতে যেতে চাইছে না। হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্টই হল, এনারা ধর্মের সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

কথামৃতে ঠাকুরের যত কথা আমরা পাই, তার মধ্যে একটাও কিন্তু ঠাকুরের নিজস্ব একটা যে আদেশ, তুমি ওই রকমটি করবে, এই ধরণের কোন কথা নেই। আদালতে যেমন আদেশ দেয়, the Court feels, আরে ভাই তোমার লোয়ার কোর্ট এক রকম ফিল করল, হাইকোর্ট আরেক রকম ফিল করল, ডিভিশন বেঞ্চ আরেক রকম, সুপ্রিম কোর্ট অন্য এক রকম ফিল করল। তোমাদের 'কোর্ট ফিলস' মানেটা কি, কোনটা ঠিক? একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি চলতে তাহলে এই সমস্যা হত না, আপনার deciding factor তো কিছু নেই, কোন principle নেই কিনা। আপনি বলবেন, আপনার আছে? অবশ্যই আছে, man is divine। যুক্তিও তাই বলে, ঋষিরাও তাই প্রত্যক্ষ করেছেন। Man is divine, এরপর তোমাকে যা কিছু করতে হবে, এই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে করতে হবে। আপনি অপরাধীকে সাজা দিচ্ছেন, কেন সাজা দিচ্ছেন? বলবেন, সমাজ চালানোর জন্য আমাকে সাজা দিতে হবে। খুব ভাল কথা, সমাজ আপনি চালান, কিন্তু individualএর কি হবে, কখন ভেবে দেখেছেন? যদি আপনি তাকে দিব্যত্বের দিকে নিয়ে যেতে চান, আপনি তাকে সাজা দিন। মনুস্মৃতিতে যে দণ্ড দেওয়ার কথা বলছেন, সেখানেও ওনারা বলছেন, একদিকে আমার সমাজকে সামলাতে হবে, নাহলে সবাই অপরাধ করতে শুরু করে দেবে। কিন্তু অন্য দিকে এটাও দেখতে হবে, অপরাধীর যেন শুদ্ধিকরণ হয়, অপারাধীরও যেন মঙ্গল হয়। ইদানিং কালে দেখুন পুরো বিচার ব্যবস্থা, যে অন্যায় করেছে শেষ করে দাও তাকে। আপনার যে মায়ের একটা আদর্শ, মা যেভাবে সন্তানকে বড় করে, কোথায় আপনার সেই আদর্শ! আপনি বলতে পারেন, কেন আমি ওই আদর্শ মানব? কারণ ওটাই আধ্যাত্মিক সত্য। কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুর যত কথা বলছেন, কোন কথাই তাঁর নিজস্ব কথা না। শাস্ত্র যদি পড়ে থাকেন, একটু যদি আপনার আইডিয়া থাকে, তাহলে দেখতে পাবেন, ঠাকুরের কথাগুলোর পিছনে হিন্দুদের যে মূল সিদ্ধান্ত, মানুষ মাত্রই অমৃতের সন্তান, কিংবা ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই দুটি কথা বাদে কোন কথা চলে না। ঠাকুরের যে কোন কথাকে যেমনি একটু নাড়াচাড়া করতে শুরু করবেন, একটু গভীরে যাবেন, তখন দেখবেন ওর মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি সব সময় এক, হয় man is divine, কিংবা ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, হয় জ্ঞানকে আধার করে, না হলে ভক্তিকে আধার করে। এটাকে

বলে inner consistency, বিজ্ঞানও কিন্তু এতটা inner consistency বজায় রাখতে পারে না। যার জন্য কিছু দিন পরে পরে ওরাই ওদের থিয়োরিগুলিকে পাল্টাতে থাকে। আমাদের শাস্ত্রগুলি যেভাবে একটা internal consistency নিয়ে চলে, বিজ্ঞানও এতটা নিয়ে যেতে পারে না।

এখন ঠাকুর যখন বলছেন সংসারে কিভাবে থাকবে, সেখানে তিনি ত্যাগ নিয়ে আসছেন। কারণ উপনিষদে ত্যাগেরই কথা বলেছে। ম্যান যদি ডিভাইন হয়, তাহলে এখন আমি যে অবস্থায় আছি এটা কি? আমি তো সংসারে ডুবে আছি, সংসারে ভোগ করতে গিয়ে এত মার খাচ্ছি, সংসারে ভোগ করতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, ভাল কিছু যখন পাচ্ছি তখন মুখে হাসি আসছে, আনন্দ হচ্ছে, আর বেশীর ভাগ সময় মন্দই কপালে জোটে, তখন তো আর কষ্টের শেষ হতে চায় না। ওনারা বলবেন, তুমি এটাকে নিজের উপর টেনে নিয়েছ, তাই এত কষ্ট। একটু আগে আকবরের গল্প বলা হল, আপনি বাচ্চাটাকে ভালবাসেন, কোলে নিয়েছেন, বাচ্চা আপনার গোফে হাত দিয়েছে। আপনার গোফে হাত দেওয়ার দুঃসাহস কার হবে! তার মানে আপনি যেটাকে ডেকে এনেছেন সেটাকে সরিয়ে দিন। সরিয়ে দিলে কি হবে? আপনি যা, আপনি তাই থাকবেন। তাহলে আমি এখন যেটা হয়ে আছি সেটা কে? কিসের আপনি হয়ে আছেন। আপনার একটা হাতের আঙুলগুলি আরেকটা হাতের আঙুলে ঢুকিয়ে চেপে ধরে আছেন, তারপর চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, আমার হাত দুটো বন্ধনে পড়ে গেছে, ছাড়াতে পারছি না। আপনার হাত কে ছাড়াবে? আপনি নিজেই তো নিজের হাতকে চেপে ধরে আছেন। আপনি হাতটা ছেড়ে দিন। তখন হেসে বলবেন, আমি কোন দিন কখন বন্ধনে ছিলামই না। কিন্তু বন্ধনে তো ছিলেন, যখন দুটো হাত ধরে আছেন, তখন বন্ধনেই তো ছিলেন। আপনি যদি নিজে মনে করেন যে, আমি বন্ধনে আছি, আপনাকে কেউ বন্ধন থেকে ছাড়াতে পারবে না। উপায়গুলো যেভাবে বলা হয়, সেগুলো সেভাবেই বলা হয় – পূর্ণ ত্যাগ চাই।

ঠাকুর এবার একটু সহজ করে বলছেন, অল্প একটু ত্যাগ। যাঁরা কাঁচা শিক্ষক, কাঁচা শিক্ষক মানে, যার অল্প একটু জ্ঞান আছে, কিন্তু পুরো জ্ঞান নেই, তাঁরা প্রথমেই বলবেন, সংসারীদের কোন দিন হবে না; ত্যাগ হবে? না হবে না, ইত্যাদি। গীতাতেও দ্বাদশ অধ্যায়ে এই আলোচনা আছে, ভক্তি কিভাবে হয়। সেখানে ভগবান বলছেন, *শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাতাচ্ছানিতরনন্তরম্*। মানুষ যে নানা রকম কাজ যা কিছু করছে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ হল জ্ঞান, জ্ঞান মানে একটা জিনিসকে জানা, আর ওই জিনিসটাকে জানার থেকে শ্রেষ্ঠ হল ধ্যান, ধ্যান হল শেষ কথা। এরপর হঠাৎ গীতায় ভগবান ঘোষণা করে দিলেন, ধ্যানের থেকেও শ্রেষ্ঠ হল কর্মফলের ত্যাগ। এই জায়গাতে এসে গীতায় একটা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। যদি বলা হত *সর্বকর্মফলঃ ত্যাগ*, তাহলে ওটা যুক্তিতে দাঁড়াত। কিন্তু বলছেন, *কর্মফলত্যাগঃ*, ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে বলুন, ঠাকুর আমি ভাল মন্দ যা করলাম সব ফল তোমাকে দিলাম, এটা ধ্যানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলছেন।

শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্য দিতে গিয়ে বলছেন, না, এখানে কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, কারণ যেটা চরম সিদ্ধি হয়, সেই সিদ্ধি হল কর্মত্যাগ, সমস্ত বাসনার ত্যাগ। আর কর্মফলত্যাগ যখন বলা হয়, সেখানে ত্যাগের একটা সমানতা রয়েছে, কিছু তো ছাড়ছে। ত্যাগকে উৎসাহিত করার জন্য ভগবান বলছেন, *ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাতাচ্ছান্তিরনন্তরম্*। যা কিছু হয় ধ্যানের মাধ্যমেই হয়, কিন্তু সবাই তো আর ধ্যান করতে পারবে না। কিন্তু তারা যাতে নিরুৎসাহিত না হয়, সেইজন্য বলছেন, তুমি ধ্যান করতে পারবে না তো, ঠিক আছে তুমি কর্মফলের ত্যাগ করো, কারণ ত্যাগ জিনিসটাই শ্রেষ্ঠ, ত্যাগ না হলে তুমি ধ্যানও করতে পারবে না, এই ত্যাগ হল সমস্ত বাসনার ত্যাগ, কর্মফল ত্যাগকে আসল ত্যাগের সাথে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে।

ঠাকুরও এই একই জিনিস করছেন। যার জন্য কথামৃত প্রথম যখন ছাপা হয়ে বেরোতে শুরু হল, ঠাকুরের কিছু কিছু ত্যাগী শিষ্য এতে আপত্তি করতে লাগলেন। বলছেন, মাস্টারমশাই ঠাকুরের

আর কতটুকু জানতেন, তিনি সপ্তাহে একদিন করে আসতেন। আর ঠাকুর ভক্তদের সামনে এক রকম বলতেন, আর আমরা যখন থাকতাম তখন দরজা বন্ধ করে ভাল করে যখন দেখে নিতেন বাইরে কেউ নেই, তখন তিনি আমাদের ত্যাগের উপদেশ দিতেন। নিশ্চয়ই আপনাদের ঠাকুর উপদেশ দিতেন, কিন্তু আপনারা তো বলে গেলেন না ঠাকুর আপনাদের কি উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের হাতের কাছে যেটা আছে সেটাকে নিয়েই তো আমাদের চলতে হবে। স্বামীজীকে ঠাকুর যা যা উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলোকে তিনি ভাল করে সাজিয়ে আমাদের মত করে তাঁর রচনাবলীতে রেখে দিলেন। কথামৃতে এর পরে পরে যা কিছু আসবে, যেখানে ঠাকুর গৃহস্থদের কর্তব্য, গৃহস্থদের প্রতি উপদেশ, সংসারে কিভাবে থাকতে হবে, পর পর বলবেন। এগুলো পড়ার সময় আপনাদের মাথায় এটাই রাখতে হবে যে, ঠাকুর সেখানে কোন উৎসাহব্যঞ্জক বাণী দিচ্ছেন। তার সাথে এটাও আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে, ঠাকুর সেখানে যা কিছু বলছেন, তার একটা কথাও সিদ্ধান্তের বাইরে না, উপনিষদে যে সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে, সেই সিদ্ধান্তগুলিকেই তিনি সহজ সরল ভাষায় বলছেন, আর দ্বিতীয় কথা হল, মানুষ যখন এরপর প্রথম এক পা চলবে, তখন তার মনে হবে, আমিও পারব, এরপর সে দ্বিতীয় পা দেবে।

একটু আগে আমরা বললাম, যোগ আর ভোগ ফিফটি ফিফটি হয় না, যদি ফিফটি ফিফটি হয়ে যায় যোগ পুরোটাই দখল করে নেবে। খরস্রোতা নদীতে যে বাঁধ দেওয়া হয়, ওই বাঁধের একটু হাফ যদি ফুটো করে দেন, বাকি বাঁধটা জলের তোড়েই উড়ে যাবে। খাল কাটার সময় দেখা যায় যে, খাল কেটে নদীর সঙ্গে জুড়তে হবে, নদীর সঙ্গে জুড়তে যখন একটু বাকি থাকত, তখন তার খাল কাটা বন্ধ করে দিত, কারণ জলই ধাক্কা মেরে বাকি অংশটাকে উড়িয়ে দেবে। ভোগ কখন যোগকে উড়িয়ে দিতে পারবে না, কারণ যোগ মানুষের স্বভাব, যোগই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। যোগে একটু বেশী গেলেই যোগ আপনাকে ধরে নেবে, এবং আপনাকে বাকি পথাটা দেখিয়ে দেবে। ঠাকুর এবারে পর পর বলছেন সংসারে কিভাবে থাকতে হয়, খুব নামকরা কথা।

ঠাকুর বলছেন, সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা- সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। আবার বড়লোকের দাসীর কথা বলছেন, বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আগেকার দিনে লোকেদের টাকা-পয়সা কম ছিল, এখন তো কাজের লোক পাওয়াই যায় না, কিন্তু আগেকার দিনে যে কাজের লোক পাওয়া যেত তা না, লোকেরা কাজ খুঁজে বেড়াত, যদি কোথাও কোন কাজ-টাজ পাওয়া যায়। বড়লোকের বাড়ির দাসী মানে, বা যে কোন দাসী যখন অন্য বাড়িতে কাজ করে, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে। এখন তো শুনি যে বড় বড় শহরে কাজের লোক দু-ঘন্টার জন্য কাজে আসে, দু-ঘন্টার বেশী তারা থাকবেও না। শোনা যায়, এইসব কাজের লোকেরা অনেক অপরাধমূলক কাজের সাথেও জড়িত থাকে, যার ফল বাড়ির মালিককেও পোয়াতে হয়। তখনকার দিকে এসব কিছু ছিল না। বড়লোকরা বাড়িতে দাসদাসী রাখতেন, তারা সেখানেই সারাদিন থেকে কাজকর্ম করত। ঠাকুর বলছেন, তারা সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি', কিন্তু মনে বেশ জানে – এরা আমার কেউ নয়।

আমি যখন এগুলো পড়ি তখন হাসি পায়, ভাবি, হে ঠাকুর, একজন স্ত্রী যদি এই লাইনটা পড়ে নেয়, কিভাবে সংসারে থাকবে, এরা আমার কেউ না, স্বামীকে গিয়ে যদি বলে তুমি আমার কেউ না, তুলকালাম হয়ে যাবে। আমাদের আমেরিকার এক সেন্টারে একজন মহিলা লেকচারে শুনেছেন কথামৃতে বলেছেন, একটা-দুটো সন্তান হয়ে গেলে ভাই-বোনের মত থাকবে। সেই মহিল খুব উৎসাহিত হয়ে স্বামীকে গিয়ে বলেছে, Sri Ramakrishna has said to stay like brother and sister, তার স্বামী বন্দুক নিয়ে সেন্টারে হাজির হয়ে গেছে স্বামীজীকে মারার জন্য, এইসব উল্টোপাল্টা কথা আপনি শেখাচ্ছেন, আমার স্ত্রীকে বলেছেন, আমি আর স্ত্রী ভাই আর বোন? ওদের এতটুকুতেও চলবে না,

তাদের জন্য তাহলে আরও ডাইল্যুট করতে হবে, আচ্ছা পঞ্চাশ কি ষাট বছর পর ভাই-বোনের মত থাকবে। আমেরিকানরা তো তখন আবার বিয়ে করতে যায়। কয়েকজন বন্ধুর কাছে শুনছিলাম, বিদেশে ইয়ং ছেলেমেয়েরা নিজেদের ক্যারিয়ার তৈরী করতেই ব্যস্ত থাকে, ইয়ং বয়সে ওরা এনজয় করার সময় পায় না। বিদেশে প্রফেসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের নাম-যশ, টাকা-পয়সা ষাটের পরেই হয়। সেইজন্য যত আমোদ-আহ্লাদ-আনন্দের ভোগ ওরা ষাটে চলে যাওয়ার পর শুরু করে। আমাদের এখানে যে সময়টা বাণপ্রস্থ সন্ন্যাসের জন্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, ওই সময় থেকে ওদের ভোগ শুরু হয়।

ঠাকুর যে উপমা নিচ্ছেন, এখানে মনে রাখবেন, উপমাকে আধার করে সত্য হয় না, সত্যকে আধার করে উপমা দেওয়া হচ্ছে। সত্য হল ত্যাগ, সত্য হল মন একটা জায়গায় পড়ে থাকে, যেমন ঠাকুর, ঠাকুরের মন সব সময় ঈশ্বরে পড়ে আছে। ঠাকুরকে যখন বলা হচ্ছে নরেন, রাখালের মত ছেলেদের উপর কেন মন দিচ্ছেন? ঠাকুর বলছেন, ঠিক আছে নরেন, রাখালের উপর থেকে আমি মন তুলে নিচ্ছি। মন তুলে নিতেই সবাই দেখছেন, ঠাকুরের চুল, দাড়ি, রোম সব সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে, সমাধিতে চলে গেলেন। ঠাকুর মনটাকে একটা জিনিসে নামিয়ে রাখছেন। কিন্তু আসলটা অন্য জায়গায় আছে, কোন রকমে এখানে মনটাকে একটু নামিয়ে রাখছেন। বড় মানুষের বাড়ির দাসীকে দুটো পয়সার জন্য মনিবের বাড়িতে কাজ করতে আসতে হচ্ছে। ছোটবেলা আমরা যখন দেখতাম লোকেরা কাজকর্ম করছে, ক্ষেতে কাজ করছে, স্কুল, কলেজ, অফিসে কাজ করছে, এরা সবাই একটা ব্যাপারে পরিষ্কার, আমি কাজ করছি কারণ আমার টাকার দরকার। এই যে দুটি টাকা পাব, সেটা দিয়ে সংসার চালাব, ধর্মকর্ম করব, তার কাছে উদ্দেশ্য হল, নিজের উত্থান, নিজের পরিবারের উত্থান, টাকাটা সেখানে উপায়।

বর্তমান কালে একটা নূতন শব্দ এসেছে, job satisfaction। কিসের job satisfaction! তুমি তো চাকরি করছ, চাকরির অর্থ বোঝ না? কথামৃতেই এক জায়গায় বলবেন, সাহেবের বুটের গোঁজা খেতে যাওয়া। তুমি তো চাকর একটা, তোমার আবার job satisfaction কিসের! মেথর মাথায় করে ময়লা নিয়ে যাচ্ছে, সে কি বলবে, এটা ভালো নোংরা, ওটা খারাপ নোংরা, নোংরা মানে নোংরাই। চাকরি মানেই চাকরগিরি, সেখানে আবার তুমি job satisfaction খুঁজছ! তুমি ওখানে কাজ করছ দুটি পয়সা পাওয়ার জন্য। দুটি পয়সা নিয়ে নিজের জীবনে কি করবে, সেটা দেখ। আগেকার দিনে গোলাম ছিল, ভারতবর্ষে স্লেভারি ছিল না, গোলাম মানে তোমাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে, তুমি ক্রীতদাস, তোমার টিকে থাকা হল শুধু আমাকে খুশী রাখার জন্য। যত মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি হয়েছে, এর তো ফোকটে গোলামগুলো পেয়ে যাচ্ছে, বলে দিচ্ছে তোমরা আট ঘন্টা কাজ করগে যাও, আর এরা খুজছে job satisfaction! একটা গোলামের জন্য যে টাকা দেওয়ার, সেটাও তো তোমাকে দিচ্ছে না, তুমি নিজে গিয়ে বলছ, আমি আপনার গোলাম, আমি আপনার গোলাম, আমার job satisfaction চাই, এটাই আমার চাই, আচ্ছা একটু এক্সটেনশান যদি পাওয়া যায়। কি দুর্ভাগ্যের কথা যে তুমি বলতে চাইছ, আমি আরও কিছু দিন আপনার চাকর হয়ে থাকতে চাই। ভিতরের জীবন যখন ফাঁপা হয়ে যায়, তখন এই সমস্যাগুলি আসে। আর তখন কি হয়, শুধু ওই চিন্তা, চেষ্টা করছে কখন আমি কাজ করতে করতে মরে যাব, কারণ একা থাকতে হবে সেই সাহসও নেই। এনারা আবার মনে করেন, মরে গেলেই সব শেষ, চোখ বুজলেই শেষ। কিন্তু যাঁরা আচার্য তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, চোখ বুজলে শেষ হয় না। লক্ষ্য করে দেখুন, ইদানিং কালে ক্রাইম রেট কত বেড়ে যাচ্ছে, সমাজে আত্মহত্যার সংখ্যা কত বেড়ে যাচ্ছে, অসহিষ্ণুতা বেড়ে যাচ্ছে, শীলহানি বেড়ে যাচ্ছে। অবস্থা আরও খারাপ হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। চাকরি হল টাকা পাওয়ার উপায়, টাকা নাও আর নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ কর। এই ভাবটা মানুষের মধ্যে রয়েছে বলেই ঠাকুর দাসীর উপমাটা নিয়ে আসছেন।

ঠাকুর আবার কচ্ছপের উপমা নিয়ে আসছেন। বলছেন, "কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? – আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে"। এই দুটি উপমা

দিয়ে ঠাকুর আবার ওই কথা বলছেন, "ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ – এসবে অধৈর্য হবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে"।

এটা একটা vicious cycle, বেদান্তে বলে অবিদ্যা, কাম, কর্ম। আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, কিন্তু কোথা থেকে একটা অবিদ্যা এসে যায়, আর সে ভুলে যায় যে আমি নিত্য, আমি শুদ্ধ। যখন অবিদ্যা এসে যায় তখন নিজেকে অপূর্ণ বলে বোধ হয়। স্বামীজী বারবার বলছেন, তুমি পূর্ণ তোমার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান ইত্যাদি। অপূর্ণ যখন বোধ হয় তখন পূর্ণ হতে চায়। একটা ইচ্ছা, আমার টাকা-পয়সা হোক, একটা ইচ্ছা, আমার একজন স্ত্রী দরকার, একটা ইচ্ছা, আমার সন্তান চাই, সন্তানের সন্তান চাই। একটার পর একটা ইচ্ছা জাগছে, এই ইচ্ছাটা মিটে গেলে আমি নিজেকে পূর্ণ মনে করব। তোমার সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকে আছে, কোন দিন নিজেকে পূর্ণ মনে করতে পারবে না। যারা এই রকম কথা বলে, তাদের যদি এক কোটি বা পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে দেন, তার সাথে আরও যা যা দরকার দিয়ে দেন, ঠিক দেখবেন আরেকটা ইচ্ছা এসে যাবে। কারণ গোলমালটা রয়েছে অবিদ্যাতে। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নেই, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না থাকার জন্য অজ্ঞানে ডুবে আছে। অজ্ঞানে ডুবে আছে বলে তার অপূর্ণতা বোধ হচ্ছে, অপূর্ণতা বোধ মানে সে এবার পূর্ণ হতে চাইবে। পূর্ণ হতে চাইছে মানে, তাকে এবার কাজে নামতে হবে। যেমনি কাজ করবে, কাজের ফল ভাল হবে, নতুবা মন্দ হবে। ভাল হলে ভালর দিকে এগোবে, মন্দ হলে মন্দ থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করবে। তার মানে অবিদ্যাটা আরও বেড়ে গেল। অবিদ্যা যেমনি বেড়ে গেল, তার সাথে কাম বাড়বে, কাজ বাড়বে। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এমন একটা vicious cycle, তিনটেই বাড়তে থাকবে।

গুরু কৃপা করে যদি বুঝিয়ে দেন, বাপু আগে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে এসো, তখন vicious cycleটা virtuous cycle হয়ে যায়। সেখান থেকে তখন সে উল্টো দিকে যাত্রা শুরু করে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, একটু যদি বোধ না হয় তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। সংসারে যদি আরও জড়িয়ে পড়েন কোন সমস্যা নেই, otherwise এগুলো সব থিয়োরেটিক্যাল। ঠাকুর এখানে বলছেন, বিপদ, শোক, তাপ এগুলো বেড়ে যাবে, আপনাকে অধৈর্য করে রাখবে, আপনার নিজের অনেক সমস্যা হবে। আমেরিকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জার্নালগুলো যদি পড়েন, দেখবেন, ওরা খালি শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমার এক পরিচিত ইউপির ভদ্রলোক, খুব কম বয়সে বিদেশে চলে যান। সেখানে এক বিদেশীনিকেই বিবাহ করেন। বিদেশীনি হলেও তিনি খুব ভাল মহিলা, ভারতকে খুব ভালবাসেন। এখন বয়স হয়েছে। আমাদের এখানেও আসেন। কি একটা কথায় কথায় মহিলা বলছেন, বিদেশে সব আছে, এত বড় বড় বাড়ি, এত উন্নতি, এত পরিষ্কার, কিন্তু soul less, প্রাণহীন। একজনকে জানতাম, প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমাকে বলছেন, মহারাজ সব ছবির মত। আমিও মজা করে বললাম, ছবিই বটে, ছবি ছাড়া কিছু না। কেন প্রাণহীন, কারণ ভিতরটা ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে। বেদান্ত ঠিক এই জায়গায় শুরু হয়, ধর্মও ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু হয়। ধর্ম কিন্তু সবার জন্য নয়। ধর্ম দুই প্রকার – এক প্রকার ধর্ম অপরকে ধর্মান্তরিত করে, আরেক প্রকার ধর্ম হয়, যারা অপরকে ধর্মান্তরণ করে না। হিন্দু ধর্ম, জুহুদি ধর্ম আর পার্সি ধর্ম, এরা ধর্মান্তরণ করে না। এনারা বলেন, আমরা যা আছি তাতেই আমরা ঠিক আছি, আমরা আমাদের বাচ্চাদের ট্রেনিং দেব, সেই ট্রেনিং পেয়ে তারা বড় হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে, একটা ধর্মীয় জীবনধারা।

আধ্যাত্মিকতা কোথা থেকে শুরু হয়? বলছেন, সংসার জ্বালায় যখন সংসারকে মনে হবে *তপ্তোশিরোবৎ*। কারুর চুলে যদি আগুন লেগে যায়, তখন তার কি দুরবস্থা হবে ভেবে দেখুন, সে এখন জলের জন্য দৌড়াতে থাকবে, সে যেমন জলই হোক, নর্দমার জল হোক, ডোবার জল হোক, আমাকে আগুনটা নেভাতে হবে। এই জ্বালা যখন জীবনে আসে, তখনই ঠিক ঠিক ধর্ম শুরু হয়। স্বামীজী এক

জায়গায় ধর্ম কোথায় শুরু হয় বলতে গিয়ে খুব সুন্দর কথা বলছেন Religion begins with tremendous dissatisfaction with the present state of affairs। আমার চারিদিকে যা আছে, এগুলোর কোন কিছুই আমার চাই না, আমার একেবারেই এগুলো ভাল লাগছে না। কোন একটা জিনিস থেকে বিরক্ত হওয়া না, সব কিছু থেকে বিরক্ত হয়ে মানুষ বলে আমার কোন কিছু লাগবে না। অফিসের কাজ থেকে বিরক্ত হয়ে ভাবছেন, কদিন ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসলে হয়, ছুটিতে গিয়ে মানুষ আরও বেশী active হয়ে যায়। দৌড়ে দৌড়ে প্লেনের বা ট্রেনের রিজার্ভেশান করতে যাবে, যেখানে যাবে সেখানে গাড়ির ব্যবস্থা করবে, হোটেলের বুকিং করতে হবে। আরে ভাই অফিসে যেটা করছিলেন, ছুটি নিয়ে সেটাই তো করছেন। আগেকার দিনের লোকেরা যখন চার ধাম যেতেন, হরিদ্বার থেকে যাবেন বদ্রিকাশ্রম, হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। কোথায় বাড়ি, কোথায় অফিস, সব ভুলে পুরো মন এখন হাঁটাতে। এখন হেলিকপ্টার থেকে শুরু হয়ে প্রাইভেট কার এসে গেছে, তার মানে আপনার যা জঞ্জাল ছিল, সেই জঞ্জাল নিয়ে আপনি ওখানে পৌঁছে যাচ্ছেন।

আচার্য শঙ্কর সংসারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে খুব সুন্দর দুটো শব্দ নিয়ে আসছেন – শোক আর মোহ। সংসার মানেই শোক আর মোহ, এই দুটোই সব সময় সংসারে চলতে থাকে। শোক হল আমার কাছ থেকে কিছু চলে গেছে, বা চিরদিনের মত আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, সেটার জন্য একটা ব্যাথা, বেদনা, ওই বেদনার পারে আমি যেতে চাই। আর মোহ হল, আমি এটা পেতে চাই। সংসারে যাবতীয় যা কিছু হয়, এই শোক আর মোহকে কেন্দ্র করেই হয়। শোক আর মোহ যদি একটা সীমাকে অতিক্রম করে বেড়ে যায়, মানুষকে অধৈর্য করে দেবে। তার মানে শোক আর মোহ যদি বেড়ে যায়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে সাংসারিকতা আরও বেড়ে গেল। শোক মোহ বেশী হলে মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়ে, তার মানে সাংসারিকতা বেশী হলে আপনাকে প্রচণ্ড অধৈর্য করে দেবে।

ঠাকুর এটাই বলছেন, ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ – এ-সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে। কেন্দ্রে যদি ঈশ্বরকে না রাখা হয়, সাংসারিকতা অনেক বেড়ে যাবে। আপনি কি করে বুঝবেন আপনার মধ্যে সাংসারিকতা বাড়ছে কিনা? খুব সহজ, আপনার শোক আর মোহ বাড়ছে কিনা দেখা। যে জিনিসটা জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটার জন্য শোক হচ্ছে কিনা, কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করছে, তার মানে মোহ আছে। আপনার শোক আর মোহ যদি বাড়ে, তাহলে আপনার এখন সময় হয়েছে, আপনি সাধুসঙ্গ করুন আর ঈশ্বরে মন দিন, নাহলে আপনি বিপদে পড়বেন। পাঁচটা জিনিস করার ইচ্ছে হচ্ছে, সেটা যাই হয়ে থাকুক, আপনার ইচ্ছে হয়েছে ঠাকুরের জন্য একটা মন্দির নির্মাণ করবেন, জানবেন আপনার মোহ আছে, সেখানে আপনি নিজের কীর্তি হোক চাইছেন। আপনি পাঁচটা লোকের ভাল করতে চাইছেন, জানবেন আপনার মোহ আছে। যখনই আপনার পাঁচটা জিনিস করার ইচ্ছে হয়, পাঁচটা জিনিস পেতে ইচ্ছে করছে, পাঁচটা জিনিস থেকে পালাতে ইচ্ছে করে, বুঝবেন আপনার এখন সময় হয়েছে ঠাকুরের দিকে মন দেওয়ার।

ঠাকুরের দিকে আপনি এখন মন দিতে পারবেন না, তাই প্রথমে একজন ভাল সাধু সন্ন্যাসীকে ধরুন। আর বাড়িতে একটু গীতা পাঠ করুন, কথামৃত পাঠ করুন। জিমনাসিয়ামে যে ট্রেড মিল হয়, সেটার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে, শুধু বাড়িয়েই দেওয়া হয়নি, স্পীড ক্রমশ বেড়েই চলেছে, আপনি এখন ওতে যতই স্টেপ ফেলে দৌড়াবার চেষ্টা করুন না কেন, আপনি পারবেনই না, কারণ স্পীড বেড়েই যাচ্ছে কিনা। আপনি দৌড়াতেই থাকবেন, দৌড়াতে দৌড়াতে একদিন মাথাটা খারাপ হয়ে মরে যাবেন। মরে গেলে তো শান্তি। কিছু শান্তি নেই, আবার জন্মাবেন, যে জায়গাতে ছেড়ে ছিলেন, জন্মে আবার সেই জায়গা থেকেই দৌড়াতে থাকবেন। এখন বাচ্চাদের দেখি, দু বছর, তিন বছর হতে না হতে মোবাইল ফোন কি করে ব্যবহার করতে হয় জেনে যায়। আরেকটু বড় হতে না হতেই কম্প্যুটার চালাতে শুরু করে দেয়। দেখে মনে হয় টেকনলজির জ্ঞানটা নিয়েই জন্মেছে। কারণ এটা থিয়োরি কিছু না, এটাই

সত্য। রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনি ঘরটাকে যেমনটি রেখে বিছানায় শুতে গেছেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরটা সেই রকমই থাকবে। মরার আগে আপনি যেমনটি ছেড়ে গিয়েছিলেন, আবার জন্ম নিয়ে ঠিক তেমনটিই পাবেন, এখানে কোন পরিবর্তন হবে না। অশান্ত মন নিয়ে মরে ছিলেন, অশান্ত মন নিয়ে জন্মাবেন। বাচ্চা বয়স থেকেই এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই দিয়ে জীবন শুরু হয়। বড় হয়ে চাহিদা আরও বাড়বে, তখন নিজে পাগল হবেন, অপরকেও পাগল করে ছাড়বেন। তারপর আবার মরবেন, আবার জন্ম নেবেন আর এই জন্মে তো আপনি একটা অসুর হয়ে জন্মাবেন। দুবার চারবার অসুর হয়ে জন্মাবেন, তারপর শেষে ভস্মাসুর হয়ে জন্মাবেন, নিজেই নিজের বিনাশ করবেন।

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে সংসার করলে অনেক সমস্যা, এই কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর কাঁঠাল ভাঙার উপমা দিচ্ছেন। কাঁঠাল কাঁচা অবস্থাতেই হোক আর পাকা কাঁঠালই হোক, সব কাঁঠালের মধ্যে সাদা রঙের এক রকম আঠা হয়, হাতে লাগলে ছাড়তে চায় না। কিন্তু হাতে তেল মেখে নিলে কাঁঠালের আঠা লাগে না। ঠাকুরের উপমাগুলো একদিকে যেমন খুব সহজ, অন্য দিকে একেবারে অরিজিনাল। পরে পরে ঠাকুর বলছেন, মা রাশ ঠেলে দেন। রাশ ঠেলে দেওয়া মানে, ঠাকুর হয়ত কোন কথা বলছেন, অনেক সময় ঠাকুরের সামনে যেন একটা দৃশ্য ভেসে উঠত, এটা কল্পনা না, বাস্তবিক তিনি ওটা দেখতেন। আবার অনেক সময় বাচ্চা বয়স থেকে তিনি যেটা দেখেছেন, শুনেছেন, সেখান থেকেও উপমা দিতেন। এখানে ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কাঁঠাল ভাঙতে গিয়ে হাতে তেল মেখে ভাঙতে হয় বলেই যে ওটা বলছেন, তা না। জিনিসটা ঠিক তার উল্টো। মন যখন একটা খুঁটি ধরে নেয়, মন মানেই মনকে কোথাও রাখতে হবে, একমাত্র সমাধি অবস্থা ছাড়া মনকে কোথাও না কোথাও রাখতে হবে, সে ঈশ্বরে রাখুন, বিষয়ে রাখুন, জ্ঞানচর্চায় রাখুন, যেখানেই রাখুন, রাখতে হবে। এবার ঠাকুর বলতে চাইছেন, সংসারে যদি রাখেন, তখন কিন্তু সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। সেইজন্য ওটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, অন্তত ঈশ্বরে যদি মনটাকে রাখা যায়, সেখান থেকে একটু যদি ঈশ্বরে বোধ এসে যায়, তখন ভোগের ইচ্ছা কমে, ভোগের ইচ্ছা যদি কমে, তাহলেই কিন্তু মানুষ শান্তিতে থাকে। এইবার ঠাকুর যেটা বলছেন, যেটা ঠাকুর বার বার বলবেন।

ঠাকুর বলছেন, "এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়"।

সেই একই পন্থা, বোঝানর জন্য ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন। একটা নামকরা বিদেশী গল্প আছে, দুই বন্ধুর মধ্যে একা থাকা নিয়ে চ্যালেঞ্জ হয়েছে, একজন বলছে যে, একা কেউ থাকতে পারে না। আরেকজন বলছে, কেন পারবে না, খুব পারে। ঠিক আছে তুমি যদি দশ বছর একা থাকতে পার, তাহলে আমি আমার সব সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে দেব। এরও প্রচুর সম্পত্তি আছে, দশ বছরের একদিন আগে যদি এসে বলে আমি একা থাকতে পারলাম না, তাহলে সে তার সম্পত্তি ওকে দিয়ে দেবে। সে বলল ঠিক আছে আমি রাজী। একটা বাগানবাড়ির একটা ঘরের মধ্যে সে থাকবে, জেলে যেভাবে কয়েদীদের রাখা হয়। তার সাথে সে যা কিছু চাইবে বাইরে থেকে সব পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, শুধু কারুর সাথে কথা বলতে পারবে না। এবার সে একা থাকতে শুরু করল। প্রথম প্রথম ভদ্রলোকের অবস্থা পাগলের মত হয়ে যাচ্ছে। পরে তিনি তাঁর মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, কেমন পাগল পাগল লাগছে। তারপর তিনি নানা রকমের বই, ম্যাগাজিন আনালেন। বেশ কিছু দিন ধরে মনের মধ্যে ছটফটানি চলতে লাগল। ধীরে ধীরে মনটা মেনে নিত থাকল, তিনিও আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেলেন। এইভাবে তার দশ বছর শেষ হতে চলল। দশ বছর শেষ হতে আর যখন দুই কি তিন দিন বাকি থাকল, সে ওই বাগানবাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাবে সবাই মনে করছে, লোকটা হেরে গেল, দশ বছর একা থাকতে পারল না। কিন্তু যে লোক দশ বছর একা একা কাটাল, সে কি আর দুদিন থাকতে পারত না! যাওয়ার সময় একটা চিঠি লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে গেছে। তাতে সে বলছে,

দশ বছর একান্ত বাসে আমি এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমি বুঝতে পারছি বাইরের লোকেদের সাথে আমি আর মেলামেশা করতে পারব না, আমি তাই দুদিন আগে ছেড়ে পালিয়ে গেলাম।

প্রথমের দিকে আলাদা হয়ে একা একা থাকতে গেলে মন ছটফট করতে শুরু করে দেবে। একাকীত্বকে মন মেনে নিতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে মন যখন স্থির হয়ে আসে, তারপর একটা সময়ের পর লোকজনের সঙ্গটাই তার কাছে পীড়াদায়ক মনে হবে। অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলেন, জপধ্যানে মন বসে না, ঈশ্বরে ভালবাসা হচ্ছে না, ইত্যাদি, এর কারণই হল, একা কখন থাকেননি। কিছু দিন যদি একা থাকা যায়, পরে ঠাকুর বলবেন, একদিন, তিন দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, যত দিন থাকা যেতে পারে তত মঙ্গল। ভক্ত সম্মেলনাদি যে হয়, সেখানে ভক্তরা বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে যান ঠিকই, কিন্তু সেখানে ভক্তরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। আর আমি আজ পর্যন্ত কখন দুজন ভক্তকে ঠাকুরের কথা বলতে বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে দেখিনি। সেইজন্য অনেক অরগানাইজেশন যখন কোন ভক্ত সম্মেলন করে বা সাত দিনের রিট্রিট করে, সেখানে বলে দেওয়া হয়, সাত দিন কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, মৌন থাকতে বলা হয়। কথা বলা মানেই, মূলো খেয়েছে এবার মূলোর ঢেকুরই উঠবে, সংসার থেকে এসেছে সংসারের কথাই মুখ দিয়ে উঠতে থাকবে। সাধু সন্ন্যাসীরাও ভক্তদের সাথে কথা বলার সময় পারেন না, কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই সংসারের কথা এসে যায়। আবার অন্য রকমও আছে।

প্রথমে কিছু দিন যদি আলাদা না থাকা হয়, ঈশ্বরে মন বসতে চাইবে না, সেইজন্য ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করাটা কঠিন। ঠাকুরও বার বার নির্জনবাসের কথা বলবেন, একটু আলাদা হতে হয়। আর দিনে দু-বার, তিনবার, দু ঘন্টা করে বা এক ঘন্টা করে সবার থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে হয়। জানবেন, যখনই ভাল কিছু করতে যাবেন, শক্তি সঞ্চয় করতে যাবেন, প্রচণ্ড বাধা আসবে। বাড়ির লোকেরা আপত্তি করবে, বন্ধুরা টিপ্পণি কাটবে, ঝামেলা করবে। ওটাকে কিছু দিন যদি সহ্য করে নেন, তারপর দেখবেন এরাই আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

ঠাকুর বলছেন, "আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন"।

কথামৃতে মনের ব্যবহারিক দিকগুলি নিয়ে ঠাকুরের প্রচুর আলোচনা আছে, কারণ সব কিছু তো মনকে নিয়েই। আপনার মুক্তিও মনকে নিয়ে, বন্ধনও মনকে নিয়ে, পাপ মনকে নিয়ে, পূণ্য মনকে নিয়ে, ভাল-মন্দ যা কিছু আছে সবটাই মনকে নিয়ে। মন এমনই এক জিনিস, যার সাথে থাকবে, তারই রঙ নিয়ে নেবে। বেশী দিন যদি থাকে তখন এমন রঙ নিয়ে নেবে যে পরে ছাড়াতে চাইলে দম বেরিয়ে যাবে। জপ থেকে যদি বেশী ধ্যান করতে শুরু করেন, আমরা মেনেই নিচ্ছি আপনি এক ঘন্টা জপ করে নিয়ে তারপর ধ্যান করছেন, তখন দেখবেন কোথাকার কবেকার কথা, কোথাকার আবর্জনাগুলি আসতে শুরু হয়ে যাবে, অবাক লাগবে কোথা থেকে এই উদ্ভট জিনিসগুলি মনের মধ্যে আসছে। এনারা কালির দোয়াতের উপমা নেন, আগেকার দিনে দোয়াতে কালি রাখা হত, তাতে কলম চুবিয়ে চুবিয়ে লেখা হত। অনেক দিন দোয়াতের ব্যবহার না হলে দোয়াতের কালি শুকিয়ে এমন হয়ে যেত যে, বাইরে থেকে দেখে মনে হবে দোয়াতে কিছু নেই, পুরোটাই ফাঁকা। এবার আপনি যদি দোয়তটাকে পরিষ্কার করার জন্য ওর মধ্যে একটু জল ঢাললেন, দেখবেন একটু রঙ বেরোবে। আরেকটু জল দিন, আরেকটু রঙ বেরোবে। যেমন যেমন জল ঢালছেন, তেমন তেমন জলের রঙটা গাঢ় হচ্ছে। ধ্যান করা শুরু করলে মানুষের এই একই অবস্থা হয়, যত ধ্যান করছে তত আবর্জনা আসতে থাকে।

কোথা থেকে এত আবর্জনা আসছে? কোথা থেকেও আসছে না, ওগুলো আপনার মধ্যেই জমা ছিল। যত দিন যাচ্ছে, ওই আবর্জনা আরও গাঢ় হয়ে গেড়ে বসছে, আর একেবারে খটখটে হয়ে যাচ্ছে। যত ধ্যান করবেন তত নোংরা বেরোবে। কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো সব বেরোতে থাকবে। আতঙ্ক লেগে

যাবে, মনে হবে কেন ধ্যান করতে গেলাম, আমি ভালই তো ছিলাম। সাধু সন্ন্যাসীদের এগুলো আরও বেশী সমস্যার হয়। সংসারে থাকলে হয়ত তাঁদের এত সমস্যা হত না। সন্ন্যাসী হয়ে আসা মানে ট্যাপ কলের মুখে দোয়াতটা লাগিয়ে দেওয়া হল, সব নোংরা আবর্জনা বেরোতে শুরু হয়ে গেল। ধ্যান আপনাকে পরিষ্কার করছে, কিন্তু প্রথমে সবাই আতঙ্কিত হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে যারা দেখছে, তারা বলবে, আপনার থেকে বাইরের লোক অনেক ভাল। তা কি কখন হতে পারে, বাইরের লোকের নোংরাটা আরও শুকিয়ে যাচ্ছে, আরও খটখটে হচ্ছে, আর যাঁরা ধ্যান করছেন, যাঁরা সন্ন্যাসী এনাদেরটা পরিষ্কার হচ্ছে, এই তফাৎ। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর চিন্তন করলে ধীরে ধীরে মনটা ওইদিকে যাবে, "তা নাহলে বিপদ, শোক, তাপ – এ-সবে অধৈর্য হয়ে যাবে"। আর এটাও দেখা যাবে, আপনি যেখানে থাকবেন, আপনি সেখানকার মত হয়ে যাবেন। একটা অফিসে অনেকদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন, সেখান থেকে অফিস পলিটিক্সে জড়াতে শুরু করবেন, অমুকে কি করল, অমুক দাদা কি করল, অমুক দিদি কি করল, দিনরাত ওর মধ্যেই সবাই ঘুরঘুর করছে।

তার সাথে ঠাকুর বলছেন, "এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়"। ঠাকুর এই যে তিনটে জিনিসের কথা বলছেন, এর মধ্যে বৈরাগ্যটা হল ভিত, আর তার ফল হল জ্ঞান আর ভক্তি। যখনই ঈশ্বরচিন্তনের কথা ঠাকুর বলেন, তখনই তিনি বার বার ফলরূপে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের কথা নিয়ে আসেন। জ্ঞান ভক্তিটাই ফল, জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য হলেই সংসার থেকে মন সরে যায়। সংসার থেকে যখন মনে সরে যায়, তখন আগে যেটা বলা হল, শোক, তাপ কমে যায়, অধৈর্য হওয়াটা কমে যায়।

ঠাকুর বোঝানর জন্য উপমা দিচ্ছেন, 'সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ'। শুধু যে সংসার জল তা না, যদি উপমা দিয়ে বোঝাতে হয় তাহলে ঈশ্বরও যেন জল, কিন্তু জল আর দুধের তুলনায় দুধটা সুপিরিয়র বলে ওই উপমাটা আনা যাবে না। আমি যখন বই লেখা শুরু করেছিলাম, একজন মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, 'বেশি বইটই লিখতে যেও না, pervert হয়ে যাবে'। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি pervert বলছেন না divert বলছেন'? 'না, pervertই বলছি'। মহারাজ ইংলিশে অতটা স্বচ্ছন্দ নন। বক্তব্য হল যে, যে চিন্তা নিয়ে আপনি থাকবেন, ধীরে ধীরে মনটা গিয়ে ওখানে বসে যাবে, ওখান থেকে মনকে বার করে আনা খুব মুশকিল হয়ে যায়। যেমন সংসার থেকে মনকে বার করে আনা মুশকিল, তেমনি ঈশ্বর চিন্তা থেকেও মনকে সরিয়া আনা মুশকিল। ঠাকুর এখানে বলছেন, সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। সংসারে মন রাখলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যাবে। যদিও ঠাকুর এখানে উপমা দিচ্ছেন দুধে জলে মিশে যায়। কিন্তু আরও দেখবেন, সংসারে আপনি যত যাবেন, তত দুধের ভাগ কমে কমে জলের ভাগ বেশী হয়ে যাবে, তার মানে আপনি তত sallow হয়ে যাবেন। আমাদের কাছে অনেকেই কথা বলতে আসেন। হয়ত আগে বন্ধুত্ব ছিল, পরিচয় ছিল, দু-মিনিট তিন-মিনিট পর বুঝতে পারি না এনার সাথে আমি কি কথা বলব, এতটাই sallow। একটা কোন কিছু নিয়ে কথা বলতে পারে না, যদি আমি বলি, আপনি যদি বিষয়-ভোগ নিয়ে কথা বলতে চান বলুন, সেটাও পারে না, এতটাই sallow।

ঠাকুর বলছেন, "দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না"। মনের যে শক্তি ছিল, স্বামীজী যে এত মনের শক্তির কথা বলছেন, ওই শক্তি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সম্পূর্ণ ডাইল্যুইট হয়ে গেছে।

এবার ঠাকুর বলছেন, দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। রিচার্ড ফাইনম্যন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ার ইউনিভার্সিটিতে খুব কম বয়সেই প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে একটা বার ছিল, নামই ছিল ন্যুড বার, মেয়েরা কাপড় ছাড়া নাচ করত, উনি নিয়মিত সেই বারে যেতেন। ওখানে বসে বসে বিয়ার

খেতেন আর তার সাথে সাথে ফিজিক্স করে যেতেন। সত্যি বলতে কি, যে জিনিসটার জন্য নোবেল প্রাইজ পেলেন, তার বেশীর ভাগ কাজ উনি ওই বারে বসে করেছিলেন। উনি ওখানে দেখছেন ওরা স্পারগেটিভ বানাচ্ছে, ওটা দেখে ওনার খেয়াল হল, সাব-এ্যাটোমিক পার্টিকেলসের ইন্টার‍্যাকশান এভাবে হয়। এনারা হলেন, যাঁদের মন অনেকটা উপরে উঠে গেছে। ওখানে বারে বসে আছেন, আর ফিজিক্স নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি পরে ওই বারের উপর পুলিশ কেস হয়ে যায়, ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে চাইছে না। বারের ভদ্রলোক ফাইনম্যানকে বললেন, আপনি গিয়ে যদি কোর্টে সাক্ষী দেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। পরের দিন সব কাগজে হেড লাইনে এসে গেল – এখানকার নামকরা এক প্রফেসর নিয়মিত বারে যান। ভদ্রলোক দেখাতে চাইছে, এখানে ভদ্রলোকরাও আসেন। একটা লেভেলে যখন মন উঠে যাবে, তখন একটু বোঝা যাবে যে, আমাদের মনে সার পদার্থ বলে কিছু নেই। আমরা অতি সাধারণ, আমরা হলাম third grade people with massive aspirations।

ঠাকুর বলছেন, "তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ কর। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে"।

যতক্ষণ আপনি একটু নির্জনে না যাচ্ছেন, এটা যে শুধু জ্ঞানভক্তি লাভের জন্য নির্জনে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে তা না, যে কোন ক্ষেত্রে আপনাকে যদি কোন কিছু অর্জন করতে হয়, আপনাকে নির্জনে যেতেই হবে। নিউটন বিচ্ছিরি রকমের একটা জ্বরে ভুগে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে যায়, আরও অনেক রকম শারীরিক জটিলতা আসে। তখন তাঁকে বলা হল, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে। দু-বছর তাঁকে গ্রামের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল, আর বলতে গেলে একাই থাকতে হয়েছিল। ওনার জীবনের বড় বড় যে অবদানগুলি আছে, তার বেশীর ভাগ ওই সময়ে এসেছিল। আমি আপনি ভাবি একা একা থাকলে পাগল হয়ে যাব, খুব ভুল ধারাণা, কোন দিন পাগল হবে না। তবে একটা কিছু যদি আইডিয়া থাকে, আমাকে এই পথে যেতে হবে, তখন কিন্তু এই নির্জন বাস, একা একা থাকাটাই আপনাকে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দেবে। কিন্তু ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে কেন্দ্র করে নির্জন হওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু এটা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সত্য।

আপনি কবিতা লিখতে চান, নির্জনে চলে যান; আপনি সঙ্গীত জগতে নাম করতে চান, নির্জনে চলে যান; আপনি কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চান, নির্জনে চলে যান। একদিন এক ভদ্রলোক এসে আমাকে একটা স্বরচিত কবিতা শোনাতে চাইলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কবিতাটা লিখতে আপনার কত সময় লেগেছে'? বললেন, 'পাঁচ মিনিট'। আমি বলে দিলাম, 'ডাস্টবিনে ফেলে দিন'। একটা কবিতা লেখার আগে ওই ভাবকে নিয়ে দুদিন, এক সপ্তাহ, এক মাস থাকুন, আর পাঁচ মিনিটে কবিতা লেখা হয়ে গেল! কে পড়বে এই কবিতা? আমরা মনে করছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে একটা কি চিন্তা হল আর শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা লিখতে বসে গেলেন। বিখ্যাত কবিরা কখনই এ-ভাবে কবিতা রচনা করেন না। এক-একটা কবিতার পিছনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কত সাধনা আছে, সেটা একটু খুঁজে দেখুন। আর তার মধ্যে তাঁর যে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো রয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন, একটা চিন্তা বা একটা ভাবকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে কত গভীর চিন্তন করে যাচ্ছেন, ওই ভাবটাই অনেক দিন ধরে ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরছে ঘুরছে, তারপরই হঠাৎ একদিন কবিতাটা নিজেই যেন জীবন্ত হয়ে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে এলো। একটা কবিতা লেখার পিছনে কত সাধনা আমাদের মত সাধারণ লোকেদের কোন ধারণাই নেই, আমরা মনে করছি, চারটে শব্দ সাজিয়ে দেব আর আমি কবি হয়ে যাব, এ-ভাবে হয় না।

তার সাথে ঠাকুর আরও বলছেন, 'সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার'। আমরা সাধারণ ভাবে মনে করি, কোন একটা চিন্তনকে নিয়ে থাকলে আমরা এগিয়ে যাব। কিন্তু তা হয় না, তার সাথে বিচার করতে হয়, কিছু জিনিসকে ত্যাগ করতে হয়। ঠাকুর আগে যেমন জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের কথা বললেন, বৈরাগ্য যদি ভিত্তি না হয়, এগোন যাবে না। বৈরাগ্য মানেই হয় বিবেক, বিবেক মানে বিচার করা

কোনটা আমার চাই, কোনটা আমার লাগবে না। যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা একটা জিনিসকে নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছেন, তার হাজারটা সমাধান আসছে, এই সমাধানগুলিকে নেতি নেতি করে ফেলে দিচ্ছেন, ফেলতে ফেলতে যেটা থাকে, সেটাই ঠিক, বিচার মানে এটাই।

কিন্তু জগতের প্রতি আমাদের তীব্র আকর্ষণ, সেটাকে নিয়ে ঠাকুর বলছেন, "কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু"। এই কথা বলার পর বলছেন বিচার কিভাবে করবে? "টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় – এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না – এর নাম বিচার বুঝেছ"।

অর্থাৎ আমাদের এই যে শরীর চলছে, এটাকে কোন রকমে চালিয়া যাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা, এর বেশী নয়। আগে যেটা বলা হয়েছিল, আগেকার দিনে লোকেরা যখন কাজ করত, তখন তারা জানত এই টাকা নিয়ে আমাকে আমার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে। কিন্তু বর্তমান লোকেরা job satisfaction খুঁজছে, job satisfaction মানে pay and perks। টাকাটা পেয়ে আপনি কি করবেন সেটার দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। ঠাকুর বলছেন, টাকাতে এই এই হয়, কিন্তু ভগবান লাভ হয় না। এটা শুধু যে ভগবান লাভ নিয়ে বলা যেতে পারে, তা না, সাধারণ জীবনেও কিছু হবে না।

ঠাকুর বলছেন, "তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না – এর নাম বিচার, বুঝেছ"? এখানে কিন্তু ঠাকুর সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না, ঠাকুর এখানে বিচারের বিধি শেখাচ্ছেন। সাধারণ মন কামিনী-কাঞ্চনে থাকে, সেখানে ঈশ্বর ছেড়ে দিন, এরা কোন দিন কোন কিছুতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে পারবে না।

রিচার্ড ফাইনম্যানেরই একটা ঘটনা আছে, ওনার একবার মনে হল এই ইউনিভার্সিটিতে আমার মাইনেটা একটু কম, মাইনে একটু বেশী পেলে ভাল হত। অন্য একটা ইউনিভভার্সিটিতে দরখাস্ত পাঠালেন, তারা সঙ্গে সঙ্গে দুশ ডলার বেশী দিতে চাইল। নিজের ইউনিভার্সিটিকে জানাতে ওরাও ফাইনম্যনকে বলে দিল আমরা তোমাকে তিনশ ডলার বেশী দেব। সেটা শুনে ওরাও চারশ ডলার বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা শুনে এরাও পাঁচশ ডলার বাড়িয়ে দিল, দু পক্ষই ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। সব শুনে ফাইনম্যানের মাথায় চিন্তা এসে গেল, এত টাকা যদি আমি পাই, কি করব আমি এত টাকা দিয়ে? তারপর ভাবছেন, টাকা বেশী হল একটা কোন মেয়ের সাথে হয়ত প্রেম করব, তাকে বাড়িতে এনে রাখব আর দিনরাত তার কথাই চিন্তা করতে থাকব, মাঝখান থেকে আমার আর ফিজিক্স করা হবে না। যার জন্য আমি আজ এখানে আছি, সেই ফিজিক্সটাই আমার নষ্ট হয়ে যাবে। সব ভেবেচিন্তে নিজের ইউনিভার্সিটিকে গিয়ে বলে দিলেন, 'আমার মাইনে বাড়াতে হবে না, আমি যা পাচ্ছি সেটাই দেবেন, এতেই আমি ঠিক আছি, আমিও আর কোথাও যাচ্ছি না'। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, টাকা হলে তাঁরা বিপদে পড়ে যাবেন। জানবেন, যে টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে, আর মেয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে, এরা কোন দিন কোন ক্ষেত্রে টপার তো দূরের কথা একটা সাধারণ কিছুও হতে পারে না। এরা কোন দিন বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না, কোন বড় শিল্পী হতে পারবে না, কোন ফিল্ডেই সে নিজেকে উঁচুতে নিয়ে যেতে পারবে না। টাকা আর মেয়ে মানুষে যার মন গেছে, as a creative person সে শেষ, ওর কোমরে শিকল পরে গেছে, আর এগোতে পারবে না।

মাস্টারমশাই তখন প্রবোধচন্দ্রদয় নাটকের কথা বলছেন, তাতে বস্তুবিচার আছে। ঠাকুর সায় দিয়ে বলছেন, "হ্যাঁ, বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র – এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়"?

প্রসঙ্গ থেকে সরে একটা কথা বলা যেতে পারে। কোন পুরুষ নারীর পিছনে যে দৌড়ায়, এটাকে ঠাকুর দেহের দিক থেকে বলছেন। দৌড়ানটা যে শুধু দেহের চাহিদা মেটানোর তাগিদেই হয়, তা নয়। যার জন্য অনেক সময় অনেকে বলেন যে, ঠাকুরও তো বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের যে বিবাহ, সেটা অন্য একটা লেভেলে চলে। আমার বই Carving a Skyতে এর একটা আলোচনা আছে। মানুষ কোথাও যেন নিজের স্পেস খোঁজে, পাখিকে ওড়ার জন্য যদি বড় স্পেস দেওয়া হয়, পাখি যেন বেশী আনন্দ পায়। স্পেসটা যদি ছোট করে দেওয়া হয়, যে কেউ সেখানে নিজেকে সঙ্কুচিত মনে করবে। আমাদেরও ঘর যদি ছোট হয়, বসার জায়গাটা যদি ছোট হয়, আমরা সেখানে নিজেদের সঙ্কুচিত মনে করি। কামী পুরুষদের কাছে নারী মানে নারী-দেহ। কিন্তু এটা যে সব ক্ষেত্রে হয়, তা কিন্তু না, অনেকের কাছে নারীর সান্নিধ্য একটা বাসা খুঁজে পাওয়ার মত। ঠাকুরও পরে বলবেন, মা-বাবা বলে ওর একটা ছায়া করে দিই, যেখানে একটু জিরোতে পারবে। কখন সখন দেখা যায়, কেউ কেউ কোন নারীকে আলম্বন করে নিজেকে বিস্তার করে উঁচুতে উঠে গেছে, তবে এই ধরণের জিনিস খুব কম দেখা যায়।

সাধারণ ভাবে পুরুষ নারীর সম্পর্ক হল, মাটি আর জলের সম্পর্ক। মাটিও ভাল, জলও ভাল, কিন্তু দুজনে মিশে গেলে পাঁক। নারী আর পুরুষের সম্পর্ককে ঠাকুর আর মার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এ-ধরণের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না, ঠাকুর আর মা হলেন বিরল দৃষ্টান্ত। নারী আর পুরুষ মানেই, একজনের মন আরেকজনের দিকে অবধারিত ভাবেই টেনে নিয়ে চলে যাবে। এই যে মন টেনে নিয়ে যায়, কারণ কত জন্মজন্মান্তর ধরে মানুষ এই জিনিসটাকে ভোগ করে আসছে কিনা। জন্মজন্মান্তরের এই যে ভাব, এটা সব সময় থেকে যাচ্ছে, যার জন্য নারীর পুরুষের প্রতি, পুরুষের নারীর প্রতি যে আকর্ষণ এটা প্রত্যেক জন্মেই থেকে যায়। ফলে কি হয়, যত ভাল সম্পর্ক থাকুক, ধীরে ধীরে ওটা degenerate করবেই, আর degenerate করলেই, ঠাকুর এক জায়গায় বলবেন, সত্তা হরণ করে নেয়। দুজনের মধ্যে যে যত বেশী ইমোশানালি দুর্বল, তার সত্তা তত বেশী হরণ হবে। কোন কোন বইতে বলবে নারী পুরুষের সত্তা হরণ করে, আবার অনেকে বলবেন, পুরুষ নারীকে বোকা বানায়। কেউ কাউকে বোকা বানায় না, ইমোশানালি যে যত দুর্বল, তার সত্তা তত বেশী আর তত বেশী বার হরণ হয়ে যায়। এখানে কথামৃতে কিন্তু সবার জন্য বলা হচ্ছে না। যদিও প্রযোজ্য হবে সব জায়গায়। এখানে উদ্দেশ্য হল, যদি ঈশ্বরের দিকে কেউ মন দিতে চায়, তখন কি করে সে মন দেবে? মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেছিলেন সংসারে কিভাবে থাকতে হয়। সেটার উত্তরে ঠাকুর এই কথাগুলো বললেন। এবার যদি পাঁচজন পাঁচ রকম প্রশ্ন করতে শুরু করে, এই রকম করলে ওটা কিভাবে হবে, সেটা কি করে হবে – এখানে সেটা issue না, issue হল আমি ঈশ্বরের দিকে মন দিতে চাইছি, আমাকে কি করতে হবে। এর উত্তরে এই কথাগুলো বলা হয়েছে।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেছিলেন, সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে? তার উত্তরে ঠাকুর যা যা কথা বলেছিলেন, সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম। এখনও একটার পর একটা কথা চলছে। মাস্টারমশাই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। যখন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে, তখন সেই বিষয়ে একটু যদি মন খোলা থাকে, শ্রোতা দু মিনিটে চোখ বুঝে একটু চেষ্টা করলে বুঝে নেবেন – যাঁর সাথে কথা বলছি ওই বিষয়টা তাঁর দখলে কিনা, যে কোন বিষয়ই কথা বলুন না কেন, ফিজিক্স হোক, বায়লোজি হোক, কেমেস্ট্রি হোক। কারণ যিনি ওই বিষয়ে Master, তাঁদের কথাবার্তাতেই একটা শক্তির বিচ্ছুরণ দেখেই বোঝা যায় যে ওই বিষয়ের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম, একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। ওনার ক্লাশে কিভাবে একজন আর্টসের ছাত্র এসেছিল। সেই বৈজ্ঞানিক ওই ছাত্রের কথা শুনেই বুঝলেন, সাংঘাতিক ট্যালেন্ট। পরে দেখলেন সে একজন বড় কবি হয়েছে। কেমন প্রশ্ন আসছে, তার উত্তরগুলো কেমন আসছে, শুনলেই একটা গুণগত তফাৎ ধরা পড়বে। একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, সবাই তার উত্তর দিচ্ছে, সবারই উত্তর একই রকম। কিন্তু

যিনি ওই বিষয়ের Master, তাঁর উত্তর যখন আসে, তাতে হয়ত ছোট্ট একটু তফাৎ থাকবে বা বলার ভঙ্গিমা এমন থাকবে তাতে বোঝা যায় যে, ইনি এই সাবজেক্টের ছাত্র নন, ইনি এই সাবজেক্টের একজন Master। আমরা সবাই স্টুডেন্টস, স্কুলে যে শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন, কলেজে যে প্রফেসাররা পড়াচ্ছেন, তাঁরাও স্টুডেন্টস। কোন একটা বিষয়ের উপর যাঁর পুরো দখল আছে, তিনি মুখ খুললেই বোঝা যাবে, তাঁর কথাগুলোই অন্য রকম হবে।

মাস্টারমশাইও বুঝতে পারছেন, তিনি এখন একজন বিরাট শক্তিমান পুরুষের সামনে আছেন। সেইজন্য তিনি একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। মাস্টারের পরের প্রশ্ন হল, "ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়"? ঠাকুর খুব সহজ ভঙ্গিতে বলছেন, "হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়"।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় যাঁরা আছেন, ভাবধারার বাইরেও যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে এই ঘটনাটা খুবই পরিচিত – নরেন ঠাকুরের কাছে এসেছেন, এসে জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? ঠাকুরও বললেন, হ্যাঁ দেখেছি, তোমাকেও দেখাতে পারি। একমাত্র নরেনকে ছাড়া আমরা আর কোথাও পাই না যে ঠাকুর অন্য কাউকে বলছেন যে, তোমাকেও দেখাতে পারি। আর যখনই ছোট থেকে বড় যে কেউ এসে জিজ্ঞেস করছে, ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়, ঈশ্বর দর্শন কেমন, এই যে নানান রকমের প্রশ্ন, আমরা দেখছি ঠাকুর সবাইকে তার মত করে উত্তর দিচ্ছেন। অনেক আগে তখন আমার বয়স কম ছিল, কথামৃতে পড়ছি থিয়েটারওয়ালারা এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, ঈশ্বর দর্শন কি রকম, কারণ এরা শুনেছে যে ইনি মা কালীর সাথে কথা বলেন। ওরা আর কতটুকু বুঝবে, সাধারণ মানুষ, থিয়েটার করে পেট চালায়, তাদেরকে ঠাকুর বোঝাচ্ছেন ঈশ্বর দর্শন কি রকম – কি রকম জানো, থিয়েটারে পর্দা ফেলা আছে, সবাই নিজেদের সাথে কথা বলছে, এক অপরকে দেখছে, কিন্তু যেই পর্দাটা সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সব কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল, সবারই মন একসঙ্গে নাটকে চলে গেল, ঈশ্বর দর্শন এই রকম। তখন পড়ে আমার অবাক লেগেছিল। একজন খুব উচ্চমানের ছাত্র, আর একজন Master দুটোতে কি রকম তফাৎ? উচ্চমানের যে ছাত্র সে বেদ থেকে কিছু বলবে, কিছু উপনিষদ থেকে বলবে। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন, তখন এমন ভাবে বলছেন, যাতে সে সহজে ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারে। এই হল Master, যেটা ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন লুডোর পাকা খেলোয়াড়ের মত, ছয় ফেলতে বললে ছয় ফেলবে, পুট ফেলতে বললে পুট ফেলবে। বিষয়টা যেন তাঁর হাতে তালুতে নাচছে।

ঠাকুর এখানে বলছেন, দর্শন অবশ্যই করা যায়। কিভাবে দর্শন পাওয়া যায়? এই জায়গাতে ঈশ্বর দর্শন কেমন হয়, সেটা বলছেন না। উপায়টা বলছেন – "মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার – এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়"।

ঠাকুর এর আগেও এই দুটো তিনটে কথা বলেছেন। মাস্টারমশাই ছিলেন কলকাতার লোক, তখনকার দিনে কলকাতার লোকেদের চিন্তা-ভাবনা যেমন ছিল এবং মাস্টারমশাইর মনের যে রকম গঠন, সেই অনুসারে ঠাকুর একটা উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি পুরো বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাস দেখি আর তার সাথে হিন্দু ধর্মের ইতিহাস যদি দেখা হয়, তখন আমরা দেখতে পাব যে, এর আরও অনেক উত্তর হতে পারে। ঠাকুর এখানে খুব পিনপয়েন্ট করে এই উত্তরটা যেন মাস্টারমশাইয়ের জন্য দিচ্ছেন। ঠাকুরের সন্তানরা কথামৃতকে নিয়ে এই কথা বলতেন যে, ঠাকুরের কাছে ভক্তরা যারা আসছে, কেউ কোন কথা বললে ঠাকুর তাদের মত করেই বলতেন। অনেক সময় কি হয়, যাঁরা গোঁড়া ভক্ত হন, যাঁদের খুব বেশী exposure নেই, তাঁরা মনে করেন এটাই পথ, এর বাইরে আর কিছু নেই। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে বিদেশীদের ধর্মে এই জিনিসটা বিরাট বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর বলতেন, তিনি অনন্ত তাঁর পথও অনন্ত, যত মত তত পথ। এই জায়গাতে ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন, সংসারে যারা

আছে, গৃহস্থ ধর্মে যারা আছে, তাকে বলে দিলেই তো সে গৃহস্থ ধর্ম ছাড়তে পারবে না, মাস্টারমশাই যখন বলছেন, উপায় কি, ঠাকুর তখন এই ধরণের লোকেদের জন্য বলছেন।

মাঝে মাঝে নির্জনবাসের কথাও বলছেন, নির্জনবাস মানেই সব কিছু ছেড়ে কোন নির্জন স্থানে চলে যাওয়া। ভক্তরা, কেউ বৃন্দাবন যাচ্ছেন, কেউ কাশী যাচ্ছেন, কেউ মায়াবতী যাচ্ছেন। মনে করছেন বাড়ি থেকে সরে এসেছি, দেখেও তাই মনে হবে। কিন্তু এনারা প্রথমতঃ যাবেন নিজের দলবল নিয়ে। বাড়িতে যাদের সঙ্গে থাকছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু যারা আছে, পুরো টিমটাকে নিয়ে যাবে। বাড়িটা কিছু দিনের জন্য পাল্টানো হল ঠিকই, কিন্তু সেই গিন্নি, সেই সন্তান, সেই স্বামী। গভীর জলের মাছকে যদি জলের উপরে নিয়ে আসা হয়, ওর শরীরটাই ফেটে যাবে। সংসারে যারা আছে তাদের উপর এত বেশী বোঝা, যদি কোন কারণে এই বোঝাটা সরিয়ে দেওয়া হয়, ফেটে যাবে। কিন্তু কিছু কিছু ভক্ত আছেন, যাঁরা সত্যি সত্যিই ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য ঠাকুর বলছেন নির্জনবাস। কেউ যদি এর থেকে সহজ করে বলে, যেমন বর্তমানকালে সব পপুলার বাবাজীরা আছেন, যে বাবাজীর প্রচুর নাম, প্রচুর ভক্ত, দেখবেন সেই বাবাজী তত সহজ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। এতে কারুরই কিছু হয় না, মাঝখান থেকে বাবাজীর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বেড়েই যাচ্ছে। শুধু ধর্মই না, কোন কিছুই সহজ ভাবে হয় না, যে কোন জিনিসকে পেতে হলে খাটতে হয়। ঠাকুরও বলছেন, সংসারে একটা সাধারণ জিনিসের জন্য কত খাটতে হয়। আর এখানে আপনি সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছেন, এটার জন্য আপনি খাটবেন না, সে কি কখন হয়!

“মাস্টার – কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়”?

এর আগের প্রশ্ন আর এই প্রশ্ন, এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। যখন বলছেন ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়, তার আগে প্রশ্ন করেছিলেন সংসারে কি রকম করে থাকতে হয়, তার উত্তরে ঠাকুর সংসারে কিভাবে থাকতে হয়, এই নিয়ে কিছু কিছু কথা বলেছিলেন, যেটা আমরা আগে আলোচনা করলাম। এই টপিকসগুলো ঘুরে ঘুরে আসবে। মাস্টারমশাইয়ের প্রথম প্রশ্নটা ছিল ধর্ম পথে চলার প্রস্তুতি সম্বন্ধীয়। এরপরে যে প্রশ্নটা করলেন, এই প্রশ্নে বোঝা যাচ্ছে মাস্টারমশাইর নিজের একটা প্রস্তুতি আছে। একজন যাঁর পড়াশোনা আছে, শাস্ত্রের জ্ঞান আছে, তিনি এই প্রশ্ন করতে পারেন, ‘কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়’। যার কোন শাস্ত্রের জ্ঞান নেই, বা ধর্মের জ্ঞান নেই, সে এই প্রশ্নটা করতেই পারবে না।

এই প্রশ্নটা কেন করা হয় বোঝা দরকার। স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলছেন – কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ আর জ্ঞানযোগ। গীতার আঠারোটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের নামের সাথে ‘যোগ’ শব্দটা যুক্ত করা হয়েছে, তার মানে গীতা আঠারোটা যোগের কথা বলছেন। আর যদি শাস্ত্রে আরও বেশী ঢোকা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে আরও অনেক রকম পথের কথা বলা হয়েছে। কত পথ আছে আমাদের জানা নেই, কেউ সব পথগুলিকে একটা জায়গায় সংরক্ষিত করেননি আর করা সম্ভবও না। আমাদের যতগুলো দর্শন আছে, সব দর্শনই এক-একটা পথ। সেই দর্শনের মধ্যে আবার অনেকগুলো ভাগ আছে, সেগুলোও এক-একটা পথ। সব পথগুলিকে যদি সংক্ষেপে গুছিয়ে নিয়ে আসা হয়, তাহলে চারটে পথ এসে দাঁড়াবে। যেখানে মন দিয়ে চিন্তন করা হচ্ছে, বিচার করা হচ্ছে, দ্বিতীয় কর্ম করা হয়, তৃতীয় ধ্যান করা হয় আর চতুর্থ ভক্তি। ধর্ম জগতে যতগুলো পথ আছে, সব পথকে এই চারটে পথে শ্রেণীবদ্ধ করে নেওয়া যায়। চারটে পথের উদ্দেশ্য একটাই – আমিত্বের নাশ। ঠাকুর বার বার বলছেন, এই যে আমি জিনিসটা, সব কিছুতে এই আমিটা আছে। এই আমিত্বের যতক্ষণ না নাশ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ধর্ম পথে এগোতে পারবে না। সংসারে আমিত্ব নিয়ে সাফল্য আসে কি আসে না, আমরা জানি না। কিন্তু যাঁরা ধর্মের পথে গেছেন, তাঁদের আমিত্বের নাশ করতেই হয়, এছাড়া কোন পথ নেই। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে যখন কেউ নেতি নেতি করে বিচার করতে শুরু করে, মানে ঈশ্বরই

বস্তু বাকি সব অবস্তু, ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, এই যে নিত্য ও অনিত্যের বিচার করতে শুরু করল, ঠাকুর বলছেন, বিচার করতে করতে যেটাকেই অনিত্য বোধ সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। ত্যাগ করতে করতে এমন একটা জায়গায় চলে আসে, তখন তার আশেপাশে যা কিছু আছে সব খসে পড়ে যায়, সেখান থেকে নিজের দেহ যে এত প্রিয়, সেই শরীরের প্রতিও তার আর দৃষ্টি থাকে না। আর শেষ অবস্থায়, যে জায়গার কল্পনা আমরা করতে পারি না, সেই জায়গাতে তার মন এত শুদ্ধ পবিত্র হয় যায় যে, তখন একটা ক্ষীণ আমিত্ব থাকে, ঠাকুর বলছেন, পোড়ো দড়ির একটা রেখা মাত্র থাকে, একটু ফুঁ দিলেই যেটা উড়ে যাবে, একটা হাল্কা আমিত্বের বোধ ছাড়া আর কিছু থাকে না। ঈশ্বরীয় কৃপায় ওই বোধটাও পরে ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যায়। এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য ঠাকুর একটা খুব সুন্দর উপমা আনেন, গ্রাম দেশে যেখানে খাল কাটা হয়, খাল কাটতে কাটতে নদীর সাথে যোগ হওয়ার আগে একটা জায়গায় খাল কাটা বন্ধ করে দেয়। এই যে মাটি কাটা হচ্ছিল, সেটা হল যা কিছু অনিত্য আছে সেগুলোকে কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছিল, একটু বাকি থাকতে ছেড়ে দিল। এরপর নদীর জলরাশি ধাক্কা মেরে বাকিটা উড়িয়ে দেয়।

ভক্তিযোগে একই জিনিস হয়, কিন্তু পথটা একটু পাল্টে যায়। যিনি ঠাকুরের ভক্ত, তিনি বলবেন, ঠাকুরই সব, যা কিছু হচ্ছে সব ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। ঠাকুরই সব কিছু হয়েছেন, কাকে আমি ভাল বলব, কাকেই বা আমি মন্দ বলব। জীবনে ভাল কিছু হলে ভক্ত বলবেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে, মন্দ কিছু হলে তখনও সেই একই জিনিস। এই ভাব নিয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় গিয়ে ভক্তেরও আমিত্বের ভাব চলে যায়। ভক্তি পথে আমিত্বের চলে গেলেও, একটু আমিত্বের ভাব, আমি তাঁর ভক্ত, আমি তাঁর সন্তান এই ভাব থাকে, ভক্তিতে ওই আমিটা থেকেই যায়।

যোগ সাধনাতেও সেই একই জিনিস হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের মধ্যে যে নানা রকমের অনুভূতি গুলি আসছে, যোগের ভাষায় যেটাকে বৃত্তি বলা হয়, সব বৃত্তি আমিকে কেন্দ্র করে হয়। ধ্যান করে করে বৃত্তিগুলিকে যখন শান্ত করে দেওয়া শুরু হয়, শান্ত করতে করতে একটা অবস্থায় যোগী সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চলে যায়, সেখানেও একটু আমি থেকে যায়। তারপরে ওই আমিত্বটুকুও, কিভাবে হয় কেউ জানে না, তাঁর কৃপাতে ওই আমিটুকুও মুছে যায়।

কর্মযোগে মানুষ যখন নিষ্কাম কর্ম করে, তখন দুই ভাবে করে। একটা হল, এই কর্মের ফল আমার লাগবে না। দ্বিতীয় হয়, আমি যা কিছু কর্ম করলাম, কর্মের সব ফল আমি ঠাকুরকে অর্পণ করলাম। কর্ম পথে ধীরে ধীরে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে করতে, সেটা অপরের সেবা করাই হোক আর পূজা অর্চনা করা হোক, যেটাই হোক, যেভাবেই নিষ্কাম কর্ম করুক, এইভাবে যে আমিটা সব থেকে গুরুত্ব, সেই আমির গুরুত্বটা নষ্ট হয়ে যায়।

শেষ যে অবস্থা, যেখানে আমির এত গুরুত্ব, যেখানে সংসার এত গুরুত্ব, সেই গুরুত্বটা কমতে কমতে তারপরে যে ক্ষীন একটা আমিত্ব থাকে ওটা শেষ একটা অবস্থায় জলের তোড়ে উড়ে যায়। সংসার খসার জন্য, আমিত্ব নাশের যে এই চারটিই পথ আছে তা না, কিন্তু যত পথ আছে, সব কটি পথকে আমরা মোটামুটি এই চারটি পথে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু এখানে প্রশ্নটা খুব গভীর - কী অবস্থাতে তাঁর দর্শন হয়। এই যে খাল কাটার বর্ণনা করা হল, জলের ঠিক কাছে চলে যাওয়ার পর মাটি কাটা ছেড়ে দেয়, অবশিষ্ট মাটিটা জলের ধাক্কাতেই ধুয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। মাস্টারমশাই ওই অবস্থটার কথা জিজ্ঞেস করছেন। ওই যে শেষ অবস্থায় গেল, যেখানে এবার ধাক্কা মারা শুরু হবে, ওই অবস্থাতে কি হয়?

কঠোপনিষদে বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন, একমাত্র তিনিই আত্মজ্ঞান পান। তার মানে, ঈশ্বর যাঁকে বরণ করেন, একমাত্র তিনিই ঈশ্বরকে জানতে পারেন। একদম ঠিক কথা, কিন্তু ঈশ্বর বরণ করবেন কাকে? আত্মা কাকে বরণ করবেন? আমরা সহজ ভাষায় বলে দিতে

পারি, তিনি ইচ্ছাময়, তিনি যাঁকে ইচ্ছা করবেন তাঁকেই বরণ করবেন। ঠিক কথা, কোন সন্দেহ নেই। এখানে আমার কি কিছু করণীয় আছে? তখন বলবেন, হ্যাঁ, তোমার আমিত্ব যদি ত্যাগ না হয়, তুমি কিন্তু এগোতে পারবে না। তাহলে শেষ অবস্থায় কি করতে হবে? শেষ অবস্থায় আমিত্বটাকে পুরো ছেড়ে দিতে হয়। যতটুকু আমিত্ব তখন থাকে, ওই আমিত্বে কোন দোষ থাকে না। সাধারণ ভাবে আমরা আমি বলতে যা মনে করি, ওটা কিন্তু সেই আমি না, এটা আলাদা আমি। ওই জায়গাতে গিয়ে দেখে, আমি আর কিছু পারছি না, আমি এখন at the end of the rope।

আমরা যখন খাওয়া-দাওয়া করছি, তখন আমাদের পাঁচ রকমের আকাঙ্খা, এই রকম খাওয়া চাই, ওই রকম খাওয়া চাই। পছন্দের খাবার কেনার জন্য ওই দোকানে যাব, নাকি সেই দোকানে যাব, আর খাবার কিনতে যে পয়সা লাগবে, সেই পয়সা এই কাজ করে উপার্জন করব, নাকি সেই কাজ করে উপার্জন করব, এই রকম হাজার রকমের ইচ্ছা, আকাঙ্খার মধ্যে আমরা ঘুরছি, খেলছি। সাধন-ভজন যখন শুরু হয় তখনও একই জিনিস চলতে থাকে। একদিন যোগ সাধন হচ্ছে, আরেকদিন ভক্তি সাধন হচ্ছে, পরের দিন কর্মযোগ করছি। এতে ভুল কিছু নেই, প্রথমের দিকে এভাবেই ধর্ম জীবন চলে। অনেক কিছু করতে করতে যখন অনেক কিছুকে ছেড়ে ওই জায়গায় চলে গেল, সেই জায়গাতে গিয়ে দেখে, আমার আর কিছু করার নেই। যে কোন কাজ যে হয়, জগতের কোন কাজ, সাধন-ভজনের কাজ, সেখানে আমিটা থাকে। যেখানে গিয়ে দেখে আমার আর কিছু করার নেই, আমি আর পারব না, মানে সে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করে, ওই জায়গাতে গিয়ে আমিটা খসে যায়। এই অবস্থায় যখন দেখে আমার আর কিছু করার নেই। কোন ব্যাপারে? সব ব্যাপারেই সে অসহায়। জগতের ব্যাপারে অনেক আগেই সে ছেড়ে দিয়েছিল। ঠাকুরের জীবনের দিকে তাকান, ঠাকুরের মনে একটা কৌতূহল এসেছে, মা কি সত্যিই আছেন। এই কৌতূহল আসার পরে, তিনি কাজও করছেন, গানও করছেন, মায়ের চিন্তন-মননও করছেন। করতে করতে মাকে দেখার তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে সব কিছু খসে পড়ে যাচ্ছে। কাপড় খসে পড়ে গেল, পৈতে খসে পড়ে গেল, কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি আর পারছেন না। ঠাকুরের আর কিছু করার নেই, দেখছেন, যা কিছু করার আমার সবটাই শেষ। কিন্তু ঠাকুর সেই সময় ভক্তিমার্গ দিয়ে সাধনা করছিলেন, যোগের সাধক তখন ছিলেন না। তখন বলছেন, আমি আর পারছি না, তার চেয়ে ভাল আমার মরে যাওয়া। কালী ঘরের খড়্গ নিয়ে ঠাকুর তখন নিজের গলাটা কাটতে যাচ্ছেন, সেই সময় মা তাঁকে দেখা দিলেন।

অল্প বয়সে এগুলো পড়ার সময় আমাদের খুব মজা লাগত, এতো দারুণ ব্যাপার, কোন রকমে মা কালীর ঘরে ঢুকে ওই খড়্গটা নিয়ে গলাটা কেটে দিলেই হল, সব হয়ে যাবে। কি আর হবে, গলাটাই কাটা যাবে, এ-ছাড়া আর কিছুই হবে না। যদি কেউ বলে আমি গলাটা কেটে দেব মা যদি দেখা না দেন, গলাই কাটা যাবে, মা দেখা দেবেন না। কারণ মা যাকে দেখা দেবেন, সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। যে পথে প্রথমে আমিত্বের নাশ হবে, আমি বলতে পুরো জগৎ সংসার, পুরো ব্রহ্মাণ্ডের নাশ, এরপর ওই জায়গাতে চলে যাবে, যেখানে বলবে, আমার আর কিছু করার নেই। পাখি তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে, এই গানে পাখিটা উড়ে উড়ে দেখে নিয়েছে কোথাও কোন কুল কিনারা নেই, আমার আর কিছু করার নেই।

আমরা যে এতক্ষণ লম্বা একটা আলোচনা করলাম, এটাকেই ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ঠাকুরের এই বাক্যটা আমরা সবাই যখন প্রথমবার পড়ি, তখন আমাদের মনে হয়, আমি যদি কাঁদি, তাহলে আমাকেও ঠাকুর দেখা দেবেন। কিছুই হবে না, আপনি কেঁদে দেখুন। যাঁরা জপধ্যান করেন, ঠাকুরের বই পড়েন, মাঝে মাঝে তাঁদের চোখ দিয়ে দু-এক ফোটা জল বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এটা খুব ভাল, এতে বোঝা যায়, উদ্দিপন হচ্ছে, এতেও হয়ত কিছু হবে না, কিন্তু এটা ঠিক যে সে ঠিক পথে আছে। ঠাকুরের নাম করছেন, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, এগুলো শুভ লক্ষণ, আপনি ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছেন। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে, এতেই আমার

সব হয়ে যাবে, ভুল করছে। কেউ যদি মনে করে, ঠাকুর বলেছেন ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তিনি দেখা দেবেন, এই তো আমার চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু হয়ে, তাহলে আমারও হবে। কখনই হবে না।

ঠাকুর যে চোখের জলের কথা বলছেন, এই চোখের জল ওই অবস্থাতেই আসবে, যে অবস্থার কথা এতক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হল। যখন আপনি সাধনা করে করে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন, আপনার আর কিচ্ছু করার নেই, আপনি শেষ। ওই অসহায় অবস্থায় যে চোখের জল, ঠাকুর সেই কান্নার কথা বলছেন। জগতের কোন কিছু আর তাঁর ভাল লাগছে না, জগৎকে তো তিনি এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে এই অবস্থায় এসেছেন, তাঁকে যেতে বললেও জগতের দিকে আর যেতে পারবেন না। জগৎটা যে তাঁদের কাছে কতটা জঘন্য হয়ে যায়, সেটা তিনিই বুঝতে পারবেন, যে অবস্থায় চলে গিয়ে দেখছেন তাঁর আর কিছু করার নেই, নিজেকে অসহায় দেখছেন। ওই অবস্থায় ঈশ্বরকে না পাওয়ার জন্য, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার জন্য যে ব্যাকুলতা হবে, আর সেই ব্যকুলতায় যে কান্না আসবে, ঠাকুর সেই কান্নার কথা এখানে বলছেন।

ইদানিং কালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'স্বস্থ ভারত', 'আবাস যোজনা', অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু কয়েক বছর আগেও গ্রামের কোন রেলওয়ে স্টেশনে যদি আপনাকে নামতে হত, আর সেখানকার শৌচালয়ে যাওয়ার যদি আপনার প্রয়োজন হয়, সেখানে ঢুকলে আপনার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে। শৌচালয়গুলি পরিষ্কার হয় না, নোংরা আবর্জনায় ভরা, দুর্গন্ধ আসছে, একটা যেন নরক। কিন্তু কোন উপায় নেই, আপনাকে ওখানে প্রকৃতির ডাকে এখন যেতেই হবে। নাকে রুমাল চেপে কোন রকমে ঢুকলেন, যা করার করে তাড়াতাড়ি করে আপনি ওখান থেকে পালিয়ে আসবেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবে আছেন, তাঁদের কাছে ঘর-সংসার ঠিক এই রকম গ্রামের কোন রেলওয়ের শৌচালয় মনে হয়। এটা কোন থিয়োরি না, সত্যিকারের এই রকমই হয়, সে চাইলেও ওখানে আর থাকতে পারবে না। ঠাকুরও সেই একই কথা বলছেন, সংসারকে যখন পাতকুয়া বলে মনে হয়, সম্বন্ধীদের কাল সাপ মনে হয়, তখনই বুঝবেন সে এই পথে এগোচ্ছে।

জগতের প্রতি, সংসারের প্রতি আসক্তি যে পুরোপুরি চলে গেছে তা না, চলে তো গেছেই, কিন্তু এতক্ষণ যে চেষ্টা চলছিল, এতক্ষণ যে তিনি সক্রিয় ছিলেন, কারণ তাঁর অনেক কিছু করার ছিল, এই সক্রিয়তা তাঁকে অনেকটা নিয়ে এসেছে, কিন্তু এখন তাঁর সেটাও করার নেই। এখন ব্যাকুল হয়ে কান্না ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। ঠাকুর এখানে যখন বলছেন, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হয়, তখন তিনি দেখা দেন, এটা হল ওই শেষ অবস্থা, যে অবস্থার কথা কঠোপনিষদ বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*। ওই অবস্থায় গেলে আত্মা তখন বরণ করেন। ওই অবস্থায় এখন অনেকেই কাঁদছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি কাকে বরণ করবেন, কারুর জানা নেই।

আমাদের সময় রমণ মহর্ষি ছিলেন অদ্বৈত পথের নামকরা সাধক। রমণ মহর্ষি যখন বর্ণনা করছেন, আত্মজ্ঞান কিভাবে হয়, তখন তিনিও এটাই বলছেন, বিচার করে করে একটা জায়গায় চলে যায়, কিন্তু তারপরে তার আর কিছু করার থাকে না। সেখানে তার মনে হয়, একটা বন্ধ দরজার সামনে সে চলে এসেছে, আর ভিতর থেকে কে যেন দরজাটা একটু ফাঁক করে বেরিয়ে টুক করে তাকে টেনে ভিতরে নিয়ে নিলো।

ঠাকুর বলছেন, "মাগছেলের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাকতে হয়"।

ঠাকুর এখানে ঈশ্বরকে ডাকার তীব্রতার কথা বলছেন। বাচ্চা বয়স থেকে যদি দেখা হয়, ছোটখাট জিনিসের জন্য আমাদের কত কান্না। বড় হয়ে যাওয়ার পর তখনও প্রিয় জিনিস যদি হারিয়ে যায়, জীবন থেকে কোন প্রিয়জন যদি চলে যায়, সবার সামনে কান্নাকাটি করতে লজ্জা লাগে, কিন্তু একা

একা থাকলে চোখের জল ফেলি। ঘুমিয়ে থাকলে স্বপ্নে চোখের জল বেরোয়, চোখের জল আমাদের বেরোতেই থাকে। যে কোন প্রিয় জিনিস মানে আমার অস্তিত্ব। আমরা সেই জিনিসকেই ভালবাসব যেটার সাথে আমার আমিটা জড়িয়ে আছে, তা যে কোন জিনিসই হোক। একজন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে ভালবাসে, একজন স্ত্রী যখন একজন পুরুষকে তার প্রাণ দিয়ে দেয়, আর যদি তাদের দুজনের মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা থাকে, তাহলে দেখবেন, সেই পুরুষ নিজের স্ত্রীকে আমি মনে করে, স্ত্রী সেই পুরুষকে আমি মনে করে। একটু যদি নীচে নেমে আসেন, তার যে অস্তিত্ব, তার যে জীবন, তার যে বেঁচে থাকা, এটা সেই।

স্বামীজী একটা ঘটনা বলছেন, সংবাদপত্রে ঘটনাটা অনেকে পড়েছেন। আমেরিকার একজন ধনী ব্যবসায়ী কিভাবে তার সব কিছু লোকসানে যাচ্ছিল। একদিন সকালে উঠে সে দেখছে তার মাত্র দশ লক্ষ ডলার অবশিষ্ট আছে, আমাদের ভারতের টাকার হিসাবে ছয় থেকে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মত হবে, সে আত্মহত্যা করে নিয়েছে। ধনী লোকটি ভাবছে, এত কম টাকায় আমি কি করে বাঁচব! স্বামীজী বলছেন, এ-রকম লোকও হয় যাদের কাছে দশ লক্ষ ডলার থাকার পরেও নিজেকে কাঙালী মনে করছে, কাঙালী হয়ে আমি বাঁচব কি করে। তার মানে, সে নিজেকে দেখছে, টাকা নেই মানে আমার অস্তিত্বও নেই।

ভারতবর্ষে এখনও সন্ন্যাসের আদর্শ আছে, আর আমরা এত জাতিপ্রথা নিয়ে কথা বলি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিয়ে কত রকম কথা বলি, কিন্তু একজন শূদ্রকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, ভাই তোমার গোত্র কি? দেখবেন, আমাদের যে বারো চোদ্দটি গোত্র আছে, ওর থেকেই একটা নাম সে বলবে। ব্রাহ্মণও সেখান থেকে গোত্রের নাম নিচ্ছে, শূদ্রও সেখান থেকে নিচ্ছে। আর গোত্রগুলি আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন এনারা কারা, দেখবেন একজন ঋষির নাম। ঋষি কি? সন্ন্যাসীর মত, কোন একটা কুঠিয়া করে সেখানে পড়ে আছে, কোন টাকা-পয়সা নেই, কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, নির্বিকার। কিন্তু মনটা রয়েছে এক বিরাট উচ্চ অবস্থায়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনেকে বলতে পারেন, আমার পিতামহ এই ছিলেন, আমার প্রপিতামহ ওই ছিলেন। আরে ভাই তোমার আসল যেখান থেকে শুরু সেটা বলো, তোমার গোত্র কি? গোত্রে যত কটা নাম পাওয়া যায়, সবাই ছিলেন একজন ত্যাগী ঋষি। ত্যাগের আদর্শ আমাদের সুদূর অতীত থেকেই আছে, কিন্তু কোথাও গিয়ে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের বেঁচে থাকাটা আটকে আছে কামিনী-কাঞ্চনে, নামযশে, ক্ষমতা লাভের আশাতে। গীতা সেইজন্য বলছেন, *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে*, সম্মানিত লোকের যদি সম্মান হানি হয়ে যায়, তার থেকে তার মরে যাওয়া ভাল। বেশীর ভাগ মানুষ এইজন্যই আত্মহত্যা করে, এতদিন আমার সম্মান ছিল, এরপর আমার আর সম্মান থাকবে না, এরপর আমি কি করে বাঁচব, আত্মহত্যা করে নিল।

এটাই ঠাকুর বলছেন, সংসারে থাকতে গেলে যাবতীয় যা কিছু তুমি চাইছ, সেটার জন্য তুমি ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলছ। যেটা তোমার অস্তিত্ব নয়, সেটাকে তোমার অস্তিত্ব মনে করে চোখের জল ফেলছ। যেটা তোমার আসল অস্তিত্ব, সেটার জন্য একটু চোখের জল ফেল। টাকা-পয়সা তো তোমার আসল অস্তিত্ব নয়, সবাই জানে মরার পর তুমি আড়াই সের ছাই হবে। তোমাকে যদি কবর দেওয়া হয়, তোমার শরীর যতটুকু ততটা মাটি হয়ে যাবে। এই জগতে কেউ নেই যে জানে না যে, মরার পর আমাকে পোড়ান হলে আড়াই সের ছাই হবে আর যদি কবর দেওয়া হয় তাহলে আমার শরীর যতটুকু ততটুকু মাটি হয়ে যাবে, এর বেশী কিছু না। কিন্তু তাও তো আমরা যেটাই চোখের সামনে দেখছি সেটার পিছনে দৌড়াতে শুরু করে দিই। শাস্ত্র এত করে বলে যাচ্ছেন, তোমার আসল অস্তিত্ব হলেন ঈশ্বর, কিন্তু সেটার জন্য কারুর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, চোখের জল যে বেরোবে সেটাও বেরোচ্ছে না। কিন্তু ঠাকুর এখানে বলছেন, ডাকার মত ডাকতে হয়, এই যে তীব্রতা, এই যে ব্যাকুলতা, একটু আগে যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের কথা বলা হল, অর্থাৎ যত রকমের সাধনা হতে পারে, এগুলো সব যেন খসে পড়ে থেকে গেল, থাকল একটাই – ব্যাকুলতা।

ঠাকুর যখন নিজে সাধনা করেছিলেন, তিনি এই চারটের কোনটাই করেননি, শুধু এইটুকু – মা, শুনেছি তুই আছিস, সত্যিই কি তুই আছিস, সত্যিই তুই যদি থাকিস তাহলে আমাকে কেন দেখা দিবিনি, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকেও দেখা দে মা। শুধু এই ব্যাকুলতাকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। শুধু ব্যাকুলতা নিয়েই কেউ এভাবে সিদ্ধিলাভ করেছেন, আমরা কিন্তু সে-ভাবে ইতিহাসে কাউকে পাই না। কত ভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এই ব্যাপারে পুরাণগুলিতে সবচেয়ে বেশী বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানেও শুধু ব্যাকুলতা দিয়ে, ঈশ্বরকে আমার চাইই চাই, এই ভাব নিয়ে সাধনা করে কেউ ঈশ্বরকে পেয়েছেন, আমরা পাই না।

এক ধাপ যদি পিছনের দিকে যাই, যেখানে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? উত্তরে ঠাকুর নির্জনবাসের কথা বলছেন, ঈশ্বরের নামগুণগানের কথা বলছেন, আর বস্তুবিচারের কথা বলছেন। কিন্তু ব্যাকুলতা কিভাবে আসবে বলছেন না? আসলে ব্যাকুলতা একদিনে আসে না। প্রথমে সব কিছু একটা রুটিন মেপে করে যেতে হয়। আমাদের কাছে কিছু ভক্ত আসেন, যাঁরা কথামৃতে পড়েছেন, এদিক সেদিক দু-চারটে লেকচার শুনেছেন, এসেই জিজ্ঞেস করবেন, মহারাজ আমাদের ব্যাকুলতা কিসে হবে?

আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, একদিন স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই যে ঠাকুর ব্যাকুলতার কথা বলছেন, আমাদের তো নেই, কি করে হবে'? স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ খুব গভীর মনের আর খুবই উচ্চমাপের মানুষ ছিলেন। তিনি তখন আমাকে খুব মজার একটা গল্প শোনালেন, 'এক বৈষ্ণব বাড়িতে কীর্তনের আসর বসেছে। খুব কীর্তন হচ্ছে, কীর্তনে যা হয়, সবারই চোখে জল। একজন যুবকও কীর্তনে অংশ নিয়েছে, কিন্তু তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। হঠাৎ যুবকের নিজের উপর খুব ধিক্কার এলো, এত সুন্দর কীর্তন হচ্ছে আর এই পোড়া চোখে এক ফোঁটা জলও নেই! যুবকটি এই ভেবে বাড়ির ভিতরে গিয়ে একটু লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে নিজের চোখে ঢেলে দিয়েছে। যুবকটা নিজেকে বলছে, এবার চোখের জল না বেরিয়ে যাবে কোথায়'! আমি তখন মহারাজকে বললাম, 'মহারাজ, এটা তো আর্টিফিশিয়াল, কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে গেল। এই চোখের জল দিয়ে তো কিছুই হবে না'। মহারাজ বললেন, 'ঠিকই, কিছুই হবে না, কিন্তু ওর intensityটা দেখ, তার মনের এই যে ভাব, আমার চোখে জল আসছে না, আমি চোখে জল আনব, এই যে আন্তরিকতা, এই যে একটা গভীর ইচ্ছা, এটাই ওকে ধীরে ধীরে ব্যাকুলতার দিকে টেনে নিয়ে যাবে'। আধ্যাত্মিক জীবন ঠিক এভাবেই হয়।

এখানে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, আর ঠাকুর আগেই মাস্টারমশাইকে বলছিলেন, আমি কপাল, চোখ এ-সব দেখলে বুঝতে পারি, দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, সেইজন্য ঠাকুর সরাসরি ওই স্তরে নিয়ে গিয়ে কথা বলছেন। নরেনকে যেমন বলেছিলেন, হ্যাঁ দেখছি, তোমাকেও দেখাতে পারি, ঠিক তেমনি সরাসরি মাস্টারমশাইকে উঁচু কথা বলছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি হয়, তাকে এভাবে বললে কিছুই হবে না, তাকে বেসিক থেকে শুরু করতে হবে। কোথাও একটা থেকে শুরু করতে হয়। আর যেটা শুরু হবে, সেটা একেবারে রুটিন মাফিক হবে। ওই রুটিনে আপনি করেই যাচ্ছেন, বছরের পর বছর করে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, মনে হবে এই জীবনে আমার কিছুই হল না। কিন্তু না, ভিতরে ভিতরে হচ্ছে, আপনি বুঝতে পারছেন না। তবে কোন না কোন দিন সবাইকে শুরু করতে হবে, যবেই শুরু করুন, শুরু করতে হবে।

যাই হোক, ঠাকুর এই কথা বলার পর গান ধরলেন – 'ডাক দেখি মন ডাকার মত', এই গানটা। এই যে গানে মনকে বলছেন, মন ডাকার মত ডাক, আমাদের যে পুরো সাধনা হয়, এই সাধনাটা হল ওই স্তরে যাওয়ার জন্য। আমরা অনেক সময় দেখি, দু-চারটে ভাল বই পড়ে, দু-চারজন ভাল সাধুসঙ্গ করে, কাউকে যখন আমরা চেষ্টা করতে দেখি, তখন তাঁদের মধ্যে যেন অতি নাটকিয়তা

থাকে, মনে হয়ে যেন ঢং করছেন। করুক, দোষের কিছু নেই, নাটকিয়তা করলেও ঈশ্বরকে নিয়েই তো নকল করছেন, ঈশ্বরের জন্যই না ঢং করছে। যাঁদেরকে ঢপ্ সাধু বলছি, তাঁরাও তো ঈশ্বরকে নিয়েই না ঢপবাজী করছে।

ঠাকুর ব্যাকুলতাকে নিয়ে বলে যাচ্ছেন, "ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন"। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, যাঁরা অন্য পথ দিয়ে যাচ্ছেন, যেমন যাঁরা জ্ঞানপথ দিয়ে যাচ্ছেন, আরও বেশী হল, যাঁরা যোগের পথে যান, ঠাকুর যেভাবে এখানে ব্যাকুলতার কথা বলছেন, সে-ভাবে জ্ঞান পথ যোগ পথের সাধকদের ব্যাকুলতা হবে না। আর ওই পথের শাস্ত্রগুলিও ব্যাকুলতার বর্ণনা করেন না, তবে যাঁরা ওই পথের পথিক তাঁদের মধ্যেও একটা ছটফটানি থাকে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পথটাই পুরো আলাদা।

কিন্তু ওই ব্যাকুলতা কি রকম হবে? ঠাকুর বলছেন, "তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন – বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে"।

এগুলো হল expression, expression এই অর্থে যে, আমাদের মত লোকেরা সত্যিকারের অতি সাধারণ মানুষ। ঈশ্বরের প্রতি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ছেড়ে দিন, এই জগতেও আমাদের কোন কিছুর জন্য টান নেই। ছোটবেলাতে ওই একটু চকলেটের জন্য কান্নাকাটি করতাম, কিন্তু ওটা টান না, যখন ক্লাশ সেভেন, এইটে পড়তাম তখন পরীক্ষায় দু নম্বরের জন্য একটু চোখের জল, মাস্টারের পিছন পিছন দৌড়ানো এগুলো ছিল, কিন্তু এটাকেও টান বলা যাবে না। এই যে টান, টান জিনিসটা কি বোঝার জন্য পরে এক জায়গায় ঠাকুর উপমা দেবেন, একটা প্রফেশানাল চোর, চুরি করা ছাড়া কিছু জানে না, সে যদি একবার টের পেয়ে যায় পাশের ঘরে সোনা রাখা আছে, এখন ওই চোরের কি অবস্থা হবে একবার ভাবুন। একটা ঘটনা আমি দেখেছিলাম, এটাকে ঠিক টান বলা যাবে না, কিন্তু টানের খুব কাছাকাছি নেওয়া যেতে পারে। অরুণাচলের আলংএ আমি কিছু দিন ছিলাম। ওখানকার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা ঝিঝি পোকার মত এক রকম পোকা ওখানে দেখা যায়, ওই পোকাগুলিকে দেখলে ওরা ধরে নিয়ে খেয়ে নেয়। কখন সখন একটু আগুনে সেঁকে নেয়, বেশীর ভাগ সময় সেঁকারও দরকার পড়ে না। শুধু উপরে ডানাগুলো ছাড়িয়ে কচ কচ করে খেয় নেয়।

একদিন দুটো বাচ্চা আমাদের সাধুনিবাসে এসেছে। আমাদের ঘরে কাঁচের পার্টিশান ছিল, কাঁচের বাইরে একটা ঝিঝি পোকা দেখতে পেয়েছে। ওরা জানে স্বামীজীদের সম্মান করতে হয়, ওনাদের অনুমতি ছাড়া কিছু করতে নেই, কিন্তু অন্য দিকে একটা ঝিঝি পোকা দেখা যাচ্ছে। আমি বসে মজা দেখতে লাগলাম। ছেলে দুটো ছটফট করছে, হাত নিশপিশ করছে কিভাবে ওটাকে ধরবে। শেষে যখন একেবারেই আর থাকতে পারছে না, তখন বাচ্চাটা কোন রকমে ওদের ভাষা আর ভাঙা হিন্দি মিলিয়ে বলছে, 'স্বামীজী উসকো পাকাড় লে'? আমি বললাম, 'পাকাড় লো'। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ করে এক স্ট্রোকে পোকাটাকে ধরে নিল। যদিও আমাদের সামনে আর খেলো না। এই যে ছটফটানি, কল্পনা করা যাচ্ছে না। আমার তখন ঠাকুর যে টানের কথা বলছেন, সেটা মনে পড়ে গেল।

আমাদেরও কোন কিছুর জন্য একটা ছটফটানি আসে, এখানে ঠাকুর টানের কথা বলছেন, ব্যাকুলতা এরও অনেক পরে আসে। ঠাকুর এই তিনটে টান দিয়ে একটা আইডিয়া দিচ্ছেন। আমরা এত সাধারণ মানুষ যে, আমরা কোন জিনিসকে ভালবাসতে পারিনি, জীবনে কাউকে ভালবাসিনি। আমাদের সব মুখের কথা, মুখে বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে ভালবাসি, এটা গেল প্রথম। আর দ্বিতীয় হয়, কোন কারণে যদি ইমোশান এসে থাকে, সেখানে একটা উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশ হয়, কিন্তু ওই যে passionএর কথা বলা হয়, ওটা যেন সেখানে missing থাকে। এটাকেই ঠাকুর পরে পরে পরকীয়া ভক্তিতে

আনবেন। মানুষ যখন নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কোন নারীর পিছনে যায়, ওই পাগলামো, ওই তীব্রতাটাকে মনে রাখতে হবে। আমরা কখন তীব্রতা জিনিসটাকে অনুভবই করিনি।

আমি যখন নূতন ব্রহ্মচারী হয়েছিলাম, তখন আমাদের একজন সিনিয়র মহারাজ, তিনিও তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তিনি আমাকে এই তিনটে টানের কথা বলছেন। আমার এখনও মনে আছে, তিন টান যদি একসাথে হয়, সতীর পতির উপরে টান, তখন আমার কোন আইডিয়াই নেই সতীর পতির উপর টান কেমন হয়, আর বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, তখন আমার বয়স কম, একটা পয়সা জীবনে আয় করিনি, বিষয়ের ব্যাপারে কোন আইডিয়াই নেই, আর মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, আমি মাও না, তাই কোন আইডিয়াই নেই। আমি তো খুব জোর ঘাড় নাড়লাম, উনি বুঝলেন যে আমি মোটামুটি বুঝেছি। এখন এত বছর পর বুঝেছি যে, আমরা তো কখন অভিজ্ঞতাই অর্জন করিনি। সন্তানের উপর মায়ের কি রকম টান থাকে, এই জিনিসের অভিজ্ঞতা আমাদের কি করে হবে!

এই তো কিছু দিন আগে একটা খবরে দেখলাম, দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়েছে, আর মোবাইলে ফেসবুকে এমন চ্যাটিং করে যাচ্ছে যে, তার ছ-মাসের বাচ্চা এয়ারপোর্টে পড়ে থাকল আর মা ট্যাক্সি করে দিল্লী থেকে নয়ডা পৌঁছে গেছে। যখন পৌঁছে গেছে তখন মায়ের খেয়াল হল, বাচ্চা কোথায়। আর ওদিকে এয়ারপোর্টে বাচ্চা কার খোঁজ করতে গিয়ে লোকেদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এইত মায়েদের অবস্থা। ঠাকুর বলছেন, মায়ের সন্তানের উপর টান। ইদানিং কালে কয়েকটা ঘটনা হয়েছে, মা দুটো সন্তান হয়েছে, ইতিমধ্যে অন্য কাউকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে নিয়েছে। বর্তমান স্বামীর কাছে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বলছে, এই রাখ তোমার সন্তান, আমি চললাম, বলে বেরিয়ে গেল। এই যে একটা পবিত্রতার ভাব ছিল, যেখানে মানুষ বুঝত টান কাকে বলে, সেটা এখন আর নেই, আর সতীত্বকে নিয়ে বেশী কথা না বলাই ভাল। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান এখনও কিছুটা আছে, তাও চাকরি বাজার এত খুলে গেছে যে, মালিককে বলে দিচ্ছে, তোমার এই পদ আমার নিকুচি করেছে, আমার একটা চাকরি এমনিই জুটে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে গিয়ে ওটা ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে। আমরা এই কথা কথামৃতে অল্প বয়স থেকে পড়ে আসছি, লেকচার যখন দিতে হচ্ছে তখন খুব করে বলে দিচ্ছি। কিন্তু যে বলছে সেও জানে না টান কাকে বলে, আর যাদের বলছে তারাও জানে না টান কাকে বলে। সেইজন্য কি হয়, এগুলো উপর উপর পড়ে আমাদের কিছুই হয় না। বাকি শাস্ত্রগুলি তো ছেড়েই দিন, সবটাই এখন আমোদের জন্য, সময় কাটছে না, কি করবে, কত আর থার্ড গ্রেড টিভি সিরিয়াল দেখবে, তার থেকে এগুলো তাও ভাল। কিন্তু এটাকে যদি ব্যবহারে নামাতে হয়, কিভাবে নামাবে, আপনার তো কোন অভিজ্ঞতাই নেই। টান জিনিসটা কি যদি বুঝতে হয়, আপনি জলে গিয়ে নামুন আর কাউকে বলুন আপনাকে চুবিয়ে রাখতে, আর বলে রাখুন এক মিনিট পরে আপনাকে যেন জল থেকে বার করে আনে। তখন একটু বাতাসের জন্য যে ছটফটানি হয়ে, তখন আপনি বুঝতে পারবেন ঈশ্বরের জন্য কেমন ছটফটানি হলে ওই ব্যাকুলতা আসে। যারা আত্মহত্যা করতে চায় তাদের ছাড়া সবাই নিজের প্রাণটাকে ভালবাসে।

ঠাকুর তারপর বলছেন, "কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে"। বলে একই কথা আবার বলছেন, ঈশ্বরকে কি রকম ভালবাসবে, "মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে"।

আর বলছেন, "ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল 'মিউ' 'মিউ' করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে – কখন হেঁশেলে, কখন মাটির উপর, কখন বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে"। ঠাকুর এই উপমা অনেকবারই নিয়ে আসবেন,

শরণাগতির ভাবের এটা খুব সুন্দর উপমা। পরে ঠাকুর বানরের ছানা, আর বিড়ালের ছানার উপমা নিয়ে নিয়ে আসবেন। বানরের ছানা হল নিজের চেষ্টা, আর বিড়ালের ছানা হল শরণাগতি। প্রথমে সবাই বানরের ছানার মতই করে, শেষে বিড়ালের ছানার মত হয়ে যায়। আমরা সবাই ভাবি, প্রথম থেকেই সব কিছু ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিতে হবে, এটা কেউ পারবেই না। কোন ভক্তকে জিজ্ঞেস করুন, 'কি হল আপনি অনেক দিন বেলুড় মঠে আসছেন না'? 'ঠাকুর টানছেন না, তাই আসি না'। 'জপধ্যান কেমন হচ্ছে'? 'ঠাকুর করাচ্ছেন না, তাই কিছুই হচ্ছে না'। আপনি বাকি সব নিজে করছেন, আপনার খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, ঘুমনো সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু যখন ঠাকুরের কাছে আসতে হবে, যখন জপধ্যান করার ব্যাপার আসবে তখন ঠাকুর করাচ্ছেন না, তাই আসছি না বা হচ্ছে না। এর থেকে বড় দু-নম্বরী আর কিছু হতে পারে কিনা আমাদের জানা নেই।

এই যে বলছেন, শুধু মিউ মিউ করে, মিউ মিউ করাটা সাধনা, আর নিজের চেষ্টাটা হয় জগৎকে নিয়ে। যারা সংসারে আছে, সংসার ধর্ম যারা পালন করছে, তাদের সমস্ত চেষ্টা থাকে সংসারের জন্য, আর ধর্মের ব্যাপারটা ছেড়ে দেয় ঠাকুরের উপরে। যারা ঈশ্বরের দিকে যায়, যারা সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথ বেছে নিয়েছে, তাদের সমস্ত চেষ্টা চলে যায় মিউ মিউতে, মিউ মিউ মানে সব কিছু ছেড়ে তাঁকে ডাকা, সাধন-ভজনে তার সমস্ত চেষ্টা লাগিয়ে দেয়, আর জগতের ব্যাপারে সবটাই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়। যোগক্ষেম মানে নিজের বেঁচে থাকার জন্য যেটা লাগে, অর্থাৎ সংসারের জন্য, নিজের শরীরের জন্য যা কিছু দরকার, এটা তারা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়। আর যোগ, যোগ মানে আধ্যাত্মিক পথে এগোনো অর্থাৎ মিউ মিউ যেটা, সেটাতে নিজের চেষ্টাকে পুরোপুরি নামিয়ে দেয়। সাংসারিক পুরুষ আর আধ্যাত্মিক পুরুষের মধ্যে এটাই তফাৎ, যারা আধ্যাত্মিক পুরুষ তারা যোগের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে, যোগক্ষেম ভগবানের উপর ছেড়ে দেন; যারা সংসারী তারা যোগক্ষেমকে জোর করে ধরে রাখে, যোগটা ভগবানের উপর ছেড়ে দেয়।

ঠাকুর এখানে যখন বলছেন, সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, তার মানে ঈশ্বরে তার মন এমন চলে গেছে যে, সে ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানে না। ঠাকুর এটা একটা উপমা দিয়ে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছেন। আমরা এই আলোচনাটা যেখানে শুরু করেছিলাম, যেখানে আমিত্বটা একটু থেকে গেছে, ওই আমিটুকু আছে বলেই সাধন-ভজন হচ্ছে, মিউ মিউ হচ্ছে। ওই জায়গাতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, মা তোমার দেখা না পেলে আমার গলাটা আমি কেটে দেব। কিন্তু বাকি সংসারটা তাঁর অনেক আগে খসে পড়ে থেকে গেছে। এই হল সংসারী আর সাধকের তফাৎ। এই পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যায়, এরপর আসছে তৃতীয় দর্শন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় দর্শন

এবার মাস্টারমশাইয়ের তৃতীয় দর্শন থেকে আমরা আলোচনা শুরু করছি। কথামৃতে প্রথম দিকের কয়েকটা সাক্ষাৎএর তারিখ ও তিথির উল্লেখ নেই, মাস্টারমশাই শুধু মাস ও সালের উল্লেখ করছেন। মাস্টারমশাইয়ের এই তৃতীয় দর্শন একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে, এই প্রথম মাস্টারমশাই ভাবীকালের স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখছেন এবং তাঁর পরিচয় পাচ্ছেন।

মাস্টারমশাই বরাহনগরে ভগিনীর বাড়িতে আছেন। দু-দিন ঠাকুরের দর্শন হয়েছে, তাঁর কথাগুলো শুনলেন, যার উপর আমরা আগে বিস্তারে আলোচনা করলাম। ঠাকুরের কথাগুলো মাস্টারমশাইয়ের কাছে অমৃতের মত লাগছে, তিনি সর্বদা ঠাকুরের মূর্তির চিন্তা করছেন, আর তাঁর কথাগুলো ভাবছেন। তিনি বুঝতে পারছেন উনি একজন Master। একটু চেতনা থাকলে বোঝা যায়, এনার কথাগুলোর গভীরতা সম্পূর্ণ আলাদা, অথচ তিনি সকলের খুব পরিচিত কথাগুলিই বলেন। এখানে

একটা খুব সুন্দর বাক্যে মাস্টারমশাই বলছেন, "এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন"?

আমাদের অনেক মহারাজরা ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লিখতে বা বলতে গিয়ে, একটা কথাতে খুব জোর দেন – ঠাকুর অশিক্ষিত ছিলেন। অশিক্ষিত বলতে, খুব অল্প একটু শিক্ষা ছিল। তার সাথে আরেকটা কথাও বলেন – অবতারের যা কিছু হয় সবটাই লীলা। এখন ঠাকুরের কোন কিছুর ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি না, ঠাকুর এটা কেন করেছিলেন, ওটা কেন করলেন না; কিন্তু ওর একটা ব্যাখ্যা বার করার চেষ্টা সব সময়ই করি। সেখান থেকে একটা খুব সুন্দর কথা ফুটে ওঠে – ঠাকুর অবশ্যই ছোটবেলা থেকে ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, ধর্মের কথাগুলো শুনেছিলেন, আর তখনকার দিনে বা এখনও গ্রাম দেশে সবারই মধ্যে ধর্মের ভাব খুব বেশী দেখা যায়। হিন্দু ধর্ম যদি এখনও কোথাও একটু থাকে, গ্রাম দেশে আছে, শহরে তো ধর্মের ব্যাপার স্যাপার উঠেই গেছে। ঠাকুর ধর্মের কথা শুনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি যে কথাগুলো বলছেন, মনে হচ্ছে কথাগুলো যেন তাঁর অন্তঃস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে। কোন পণ্ডিতের সাথে যদি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কথা বলা হয়, তখন বোঝা যায় যে ওনার পাণ্ডিত্য আছে। কিন্তু পাণ্ডিত্য থাকলেই যে তিনি ধর্মের কথাগুলিকে আত্মস্থ করেছেন, তা হয় না, এটা চোখ-কান একটু খোলা রাখলে সহজেই বোঝা যাবে।

গরু ঘাস খায়, ঘাস খেয়ে গরু গোবরও দেয়, গরু দুধও দেয়। কথা যখন বেরোয় একটু বিচার করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে, এটা গোবর, না এটা দুধ। আর দুধ তো অত সহজে আসে না, বিরাট লম্বা একটা পদ্ধতি আছে। ঠিক তেমনি আত্মসাৎ করাও অত সহজ না, যেটা হজম হয় না, সেটাই গোবর হয়ে বেরিয়ে যায়। দুধ হল, হজম হয়ে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে যে সার জিনিসটা বেরিয়ে আসে। যেখানে আত্মসাৎএর ব্যাপার আছে, যেটা পাণ্ডিত্যের বিপরীত, তার সাথে আরেকটা যেটা গুরুত্ব, যাঁরা যুগপুরুষ, তিনি অবতারই হন আর আচার্যই হন, তাঁর কথা শুনলেই বোঝা যায় যে, এখানে একটা আলাদা শক্তি কাজ করছে। ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের সাথে যখন দেখা করতে গেলেন, অঙ্গুলিমাল ভগবান বুদ্ধকে বলছে, 'দাঁড়াও'। ভগবান বুদ্ধ বলছেন, 'আমি তো দাঁড়িয়ে গেছি, তুমি কবে দাঁড়াবে'। কথাটার মধ্যে এমন একটা শক্তি, অঙ্গুলিমাল ওখানেই ভগবান বুদ্ধের পায়ে পড়ে গেল। এটা একটা কাহিনী হতে পারে, আবার কাহিনী নাও হতে পারে, আমাদের জানা নেই। কারণ যে কোন ধর্ম চেষ্টা করে তার নেতা যিনি, তাঁকে বড় করা। কিন্তু এই ধরণের কথা আমরা অনেক জায়গায় পাই। যীশুর জীবনেও পাই, মহম্মদের জীবনেও পাই, কোথাও একটা শক্তি থাকে, যাতে বোঝা যায় যে, এখানে বিশেষ কিছু একটা আছে।

মাস্টারমশাইও বুঝতে পারছেন, এখানে বিশেষ কিছু আছে। আর এই বিশেষ যেটা, এটা বই পড়ে তাঁর হয়নি। কারণ বই পড়া থাকলেও, এই যে দুটো বলা হয়, একটা পণ্ডিতের কথা, দ্বিতীয় হল যিনি আত্মসাৎ করছেন, জিনিসটাকে তিনি বুঝেছেন, আর তৃতীয় হল, যিনি ওর মধ্যেই ঘুরছেন ফিরছেন। একটুও যদি চেতনা ভিতরে জেগে থাকে, মানুষ তখন এই ধরণের তৃতীয় জনের কাছে বার বার যেতে চাইবে। স্বামীজী জীবনী পড়লে দেখা যায়, স্বামীজী প্রথমের দিকে ঠাকুরের থেকে দূরে চলে যেতে চাইছেন, ঠাকুর একবার ছুঁয়ে দিলেন, আরেক দিন ঠাকুর ছুঁলেন, কিন্তু এবার মনটাকে কে যেন টেনে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে।

বলছেন, আবার রবিবার এসে গেল, মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে গেছেন। নরেনের বর্ণনা করছেন – "একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা"।

মাস্টারমশাই হঠাৎই ঠাকুরের ঘরে ঢুকেছেন, কিন্তু "মাস্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ধর্ম ধর্ম করে তাদের ওই সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত – এই-সব কথা হইতেছে"। এখান থেকে দু-তিনটে পাতা জুড়ে বলা হয়েছে সংসারে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। এরা আগে মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্ন ছিল, সংসারে কিরূপ থাকতে হয়; সেই প্রশ্নটা ছিল, যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনা করতে চাইছেন বা জীবনে একটু সুখ শান্তি পেতে চাইছে তাঁদের জন্য। সংসারে কিভাবে ব্যবহার হবে, এর জন্য রীতিমত কিছু নিয়ম ও আদেশের দরকার পড়ে।

সব শাস্ত্রকে মোটামুটি চারটে শ্রেনীতে বিভাজন করা যায়। প্রথমটা হল, যেখানে আধ্যাত্মিক দর্শনগুলি আছে, আমাদের যেমন উপনিষদ, গীতা। দ্বিতীয় হল, কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে দেওয়া হয়, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এই শ্রেনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় হল, পূজা, অর্চনা এগুলো আমরা কিভাবে করব, এটা আমাদের পুরাণ আর তন্ত্র থেকে আসছে। আর শেষে হল, আমার নিজের উত্থানের জন্য কি কি করতে হবে, তার সাথে সংসারে ও সমাজে আমার লোকব্যবহার কেমন হবে। পুরাণগুলিতে সব কটাই মিলেমিশে আছে, গুছিয়ে আলাদা আলাদা করে বলা নেই। সেইজন্য মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থগুলিতে এনারা খুব সুন্দর গুছিয়ে বলে দিয়েছেন, কার সাথে কেমন ব্যবহার করবে। কিন্তু কোন শাস্ত্রই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, কারণ যেমন যেমন সময় পাল্টায় তেমন তেমন দেশ, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনগুলোও পাল্টায়। অনেকগুলো প্রচলিত কথা বাংলা, হিন্দি বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে, কেমন লোক কেমন ব্যবহার করলে আপনি কেমন ব্যবহার করবেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্র একবারে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে দেন, কোন কোন পরিস্থিতিতে কোন কোন লোকের সাথে কিভাবে তুমি ব্যবহার করবে।

এখন কোন একজন ধর্মপথে যাচ্ছে, তার পাড়াপ্রতিবেশীরা তার নিন্দা করবেই। কারণ নিজের ভিতরে কোথাও একটা দংশন হয়। অনেক আগে একটা বই পড়েছিলাম, তাতে আছে যে, একজন ফাদার প্রায়ই জাহাজে করে ধর্মীয় উপদেশ দিতে যেতেন। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন সব রকমের গোলমাল করে, মানে একেবারে গোল্লায় গেছে। এখন ধর্মযাজকের সাথে ক্যাপ্টেনের খুব বন্ধুত্ব, মাঝসাজে সেই ধর্মযাজক ওই ক্যাপ্টেনের জাহাজে যাতায়াত করে। দুষ্টুমি করে ক্যাপ্টেন প্রত্যেক বার জাহাজের বাজে বাজে মেয়েদের ওই ধর্মযাজকের সামনে বসিয়ে রেখে দেয়। বেচারী ধর্মযাজক ঘাবড়ে গিয়ে ভগবানের নাম নিতে থাকে, যাতে তাঁর মনে কোন বিকার না আসে। ধর্মযাজকের জাহাজ থেকে যখনই নামার সময় হয়, প্রত্যেক বারই ক্যাপ্টেন এসে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। এটাই মানুষের স্বভাব, আমিও বড় হতে চাইছি, আমিও ভাল হতে চাইছি, কিন্তু আমি বড় হতে পারছি না, ভাল হতে পারছি না, কিন্তু যখন অপর কাউকে দেখি সে বড় হয়েছে, একজন ভাল মানুষ হয়েছে, আমাকে তার নিন্দা করতেই হবে।

আমাদের অন্তরের অনেক গভীরে যদি যাওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, তারও কোথাও একটা ইচ্ছা আছে আমিও ভাল হই। যদি এই ইচ্ছাটা তার না থাকে, তাহলে অপরকে ভাল হতে দেখে তার দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। আপনি যদি কারুর নিন্দা করেন, যে কোন লোকের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন, আপনি জানবেন, এর পিছনে একটাই সত্য, আপনি একজন অকম্মা ব্যর্থ লোক। কেন ব্যর্থ হলেন? আপনিও করতে চাইছেন, আপনি পারেননি, সে সফল হয়ে গেছে। আপনার ভিতরে এত শক্তি হয়নি যে আপনি বুক ফুলিয়ে বলবেন যে, আমি একজন ব্যর্থ পুরুষ। তখন যে এগিয়ে গেছে তাকে টেনে পিছনে আনার চেষ্টা করবেন। টেনে তো আর পিছনে তাকে আনতে পারবেন না, তাই দুটো গালাগাল দিয়ে দিচ্ছেন, নিন্দা করছেন, তাতে মনে করছেন ওকে পিছিয়ে দিলেন। কি আর পিছোবে, কিছুই পিছোবে না, আপনি মনে করছেন এতে ও পিছোবে, এটা ভেবেই আপনি একটা

তৃপ্তি পাচ্ছেন। যাঁরাই একটু উপরের দিকে যান, হয়ত সাহিত্য রচনাতে, হয়ত বিদ্যা অর্জনে, বা কোন সৃজনশীল কাজে ডুবে আছেন, তাঁর আশেপাশে যারা আছে, এরা তাঁর নিন্দা করবেই।

এই জিনিসটাকে নিয়েই এখন আলোচনা চলছে। ঠাকুর নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন, "নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি"? কুকুরের সত্যিই এই স্বভাব, যাকে চেনে না বা হঠাৎ নূতন কিছু যদি এসে যায়, চিৎকার করবেই।

নরেনের বয়স তখন সবে ঊনিশ কি কুড়ি। নরেন বলছেন, "আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে"। নরেনের কথা শুনে ঠাকুর হেসে বলছেন, "না রে, অত দূর নয়"। কথামৃতে নরেনের এই হল প্রথম কথা। প্রথম কথাতেই নরেন তাঁর জাত চিনিয়ে দিচ্ছেন, জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর ভিতরের শক্তির খবর। যে কোন জিনিসকে আমি হ্যাণ্ডল করতে পারি, ফাইট করতে পারি, ট্যাকল্ করতে পারি, এই যে তাঁর ক্ষমতা, কথামৃতে তাঁর প্রথম যে কথা, এটা যেন থিয়েটারের মঞ্চে নায়কের প্রবেশ – নায়কের কি ডায়লগ দিয়ে প্রবেশ – মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। যাঁরা স্বামীজীর জীবনী না পড়ে প্রথমেই কথামৃত পড়তে যাবেন, তাঁরা অবশ্যই ঘাবড়ে যাবেন, ধর্মগ্রন্থে প্রথম আবির্ভাবেই নায়কের প্রথম সংলাপ – আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

ঠাকুর এখানে সাবধান করছেন। লীলাপ্রসঙ্গ যদি গভীর মনযোগ দিয়ে পড়া হয়, বা কথামৃতই যদি খুব মন দিয়ে পড়া হয়, তাহলে দেখতে পাবেন, এই যে তিনজন, ঠাকুর মা আর স্বামীজী, এনাদের তিনজনের যে লোকব্যবহার, এটা পুরোপুরি একটা উচ্চ জীবনদর্শনের উপর আধারিত। ঠাকুরের সব সময় এই ভাব ছিল – প্রত্যেক জীবেই ঈশ্বর আছেন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের সাধারণ ভাবে এই ভাব ছিল – সব কিছু আত্মারই প্রকাশ। আর শ্রীশ্রীমা সবাইকে তিনি নিজের সন্তান দেখছেন। এর আগের আলোচনায় যেখানে ব্যাকুলতাকে নিয়ে বলা হচ্ছিল, সেখানে এটা বলা হয়েছিল যে, কিভাবে আমিত্বের নাশ হয়, আর ওই অবস্থায় তিনি এসে যখন কৃপা করেন, তখন আমিত্বের সবটাই মুছে যায়। সত্যিই যখন আমিত্বটা মুছে গেল এবং ওই যে জ্ঞান হল, এরপরে তাঁর ব্যবহার যেটা হবে, ওই জ্ঞান তাঁর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা যতই বই পড়ে নিই না কেন, যতই আমরা লেকচার শুনে যাই না কেন, ঘুরে ফিরে যখন মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করব, তখন তার মাপকাঠি একটাই থাকে – তুমি জানো আমি কে! আপনি যত সাধন-ভজন করে নিন, যত বড় মহাত্মাই হয়ে যান, আপনি বিনয়ের এক সাংঘাতিক অবতার হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু জগতের সাথে আপনার ব্যবহারের যে প্যাটার্ন হবে, সেটা হবে – তুমি জানো আমি কে। এগুলো শুনতে কারুরই ভাল লাগার কথা না। পাড়ার রাস্তায় দুই বয়স্ক মানুষের দেখা হয়েছে, একজন এগিয়ে গিয়ে অন্যজনকে বলছেন – অধমের নমস্কার গ্রহণ করবেন। অন্যজন বলছেন, না না ছি ছি আপনি একি বলছেন, আমি অধম। এই করে করে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষে হঠাৎ একজন বলতে লাগল, তুমি কি মনে কর, তোমার বিনয় আমার থেকে বেশী। সেও বলছে, তুমি কি মনে করছ, তোমার বিনয় আমার থেকে বেশী? এই বলেই দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। পাড়ার লোকজন জড়ো হয়ে দেখছে, দুজন বয়স্ক লোক নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। কি নিয়ে মারামারি? এই দুজনের মধ্যে বিনয় কার বেশী। বিনয় কার বেশী দেখাবার জন্যও মারামারি করে দেখাতে হচ্ছে। সেখানেও দেখাবে, দেখো, আমার বিনয় তোমার থেকে বেশী।

সাইকলজির একজন নামকরা প্রফেসর ছিলেন, তিনি খুব সুন্দর একটা লেখা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলছেন, তাঁর একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, তাঁর চেষ্টা ছিল, মেয়েটা যেন মানুষের এই দুর্বলতা

থেকে মুক্ত থাকে। মেয়েটির এক বন্ধুকে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। দুজনের মধ্যে যাতে ঝগড়া না লাগে, ওনার স্ত্রী কুকিস বানিয়েছেন, আর একেবারে মেপে সমান করে প্রত্যেকটা কুকি বানিয়েছেন, কোন ভাবে কুকির মধ্যে কোন তফাৎ পাওয়া যাবে না, এত যত্ন করে বানিয়েছেন। দুজনকে কুকি দেওয়া হয়েছে, মেয়েটি বলছে, 'জানো আমার মা কত খেটে এই কুকি তৈরী করেছেন! তোমার যে কুকি ওটা আমার কুকির মত, কিন্তু আমার যে কুকি, ওটা তোমার কুকির মত না'। ভদ্রলোক মজা করে বলছেন, 'দেখুন মানুষের কি স্বভাব, পুরো সমান কুকি, কিন্তু তার মধ্যেও বাচ্চা ঠিক বার করে নিয়েছে, তোমার কুকি আমার মত, কিন্তু আমার কুকি তোমার মত না, মানে আমি শ্রেষ্ঠ।

আমি শ্রেষ্ঠ, এটা থেকে মানুষ কিছুতেই বেরোতে পারে না, সম্ভবই না। ঠাকুর বলছেন অশ্বত্থ গাছ আজ কেটে দাও, কাল ওর ফেকড়ি বেরিয়ে আসবে। 'আমি' জিনিসটা কিছুতেই যাবে না, আমিত্ব থাকবেই থাকবে। আর ওই আমিত্বে 'তুমি জান আমি কে', ওটা একেবারে ইউনিফর্ম, ওটাই মাপকাঠি। আর সেখানে যার জোর যত বেশী তার কথাগুলো তত জোর বেরোবে। নরেনের জোর বেশী, সেইজন্য বেরিয়ে গেল, মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

ঠাকুরও ঝগড়া করছেন, হৃদয়রামের সাথে ঝগড়া হচ্ছে, রামলাল, হলধারীর সাথে ঝগড়া হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক জীবে ঈশ্বর আছেন, এটা তাঁর কখন যাবে না। মা ছেলেকে যতই শাস্তি দিক, কিন্তু এই ছেলে আমারই দেহের অঙ্গ, এই বোধটা মায়ের কখন চলে যাবে না। বাবার চলে যেতে পারে, অন্যান্য যাঁরা আছেন, পিসি, খুড়ি, ঠাকুরমা, দিদিমা, কাকা, জ্যাঠা এদের চলে যাবে, ইদানিং মায়েদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু আগেকার মায়েদের ওটা কখন যেত না।

সিদ্ধ পুরুষরা স্বাভাবিক ভাবে যেটা করেন, সাধকরা সেটাই চেষ্টা করে করেন। যেমন ঠাকুর অবতার, সিদ্ধ পুরুষ; তিনি যেটা স্বাভাবিক ভাবে করছেন, সাধারণ লোকদের সেটাই চেষ্টা করে করে করতে হয়, এটাই ঠাকুর এখন বলছেন। আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম, লোকব্যবহার আমাদের সে-রকমই হওয়া উচিৎ মনুস্মৃতি আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলি যে রকমটা বলছেন। মনুস্মৃতিতে মনু প্রথমেই পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, জগতের সত্য এই এই, ওই সত্যে আমাদের পৌঁছাতে হবে। এরপর তিনি ওই সত্যকে আধার করে বাকি ব্যবহারগুলিকে ঠিক করে দিচ্ছেন।

কোন দেশের সংবিধান রচনার করার সময় ওনারা বড় বড় কথা বলেন, সবার জন্য সমান আইন ইত্যাদি, কিন্তু আইন প্রণয়নের সময় তারা দেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা আছে তাদের যেন স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়ে যায়। আমাদের দেশেরও সংবিধান সব কিছুতে সমান সমান বলে শেষে সবটাতেই একটার পর একটা করে exception নিয়ে আসতে হচ্ছে, এটাতে এই exception, ওটাতে ওই exceptioon, কারণ আইন প্রণেতাদের কারুরই কোন সিদ্ধান্ত নেই কিনা। মনুস্মৃতিতে কোথাও কোন exception পাবেন না, কারণ তাঁর কাছে পরিষ্কার – সত্য এই, জীবনে তোমার উদ্দেশ্য এই, সেইজন্য তোমার ক্রিয়াকলাপ এ-ভাবে হবে। ঠাকুরের কাছে ঈশ্বরই সত্য আর যে কোন লোকব্যবহার যদি হয় ওই একটা জিনিসকে মাথায় রেখে হবে – আমার সামনে ঈশ্বর রয়েছেন। তবে সত্যি কথা বলতে কি, এই রকম লোকব্যবহার আমাদের হয় না, খুব কঠিন। আমরা বড় বড় মহারাজদের নামকরা সব বক্তৃতাগুলো শুনেছি, তাঁদের বইগুলো পড়েছি, কিন্তু ব্যবহারকালে কিছুই বজায় রাখা যায় না।

আমাদের একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, তিনি বেদান্তকে আধার করে একটা বই লিখলেন – Universal Brotherhood। মঠের তৎকালীন যিনি খুব নামকরা সিনিয়র মহারাজ ছিলেন, তাঁকে বইয়ের একটা কপি দিলেন। উনি বইটা উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, 'বাঃ খুব সুন্দর বই, যার সাথে আজ পর্যন্ত কোন সেন্টারে কোন সন্ন্যাসী ভাই টিকতে পারল না, তিনি লিখছেন Universal Brotherhood বই'! এগুলো মুখে বলে দেওয়া বা অপরকে উপদেশ দেওয়া খুব সোজা, কিন্তু যিনি এর প্র্যাক্টিস করতে যাবেন, তাঁর দম বেরিয়ে যাবে।

ঠাকুরের জন্য এটা স্বাভাবিক, তিনি নরেনকেও গালাগাল দিচ্ছেন, হাজরাকেও গালাগাল দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সবই নারায়ণ, এই বোধটা তাঁর কখনই চলে যাচ্ছে না, এটা তাঁর একেবারে স্বাভাবিক। আমাদের এর জন্য অনুশীলন করতে হয়, আর যে কোন মানুষের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য, সহজে হতে চায় না। তবে এর অনুশীলন কখন ছেড়ে দেওয়াও যাবে না। সাধনা মানে, সিদ্ধি অবস্থায় আপনি যা পাবেন, সেটাকেই সারা জীবন করে যেতে হয়, সাধনা আর সিদ্ধিতে কোন তফাৎ থাকে না। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি তো বেলুড় মঠের ভক্ত, সত্যি বলুন তো আপনি কি চান'? 'আমি ঠাকুরের দর্শন চাই'। 'ঠাকুরের দর্শন হলে কি আপনার দুটো শিং বেরোবে'? এরপর দেখবেন কারুর কোন উত্তর নেই। আপনি হাজার হাজার ভক্তের ইন্টারভিউ নিন, ঈশ্বর দর্শন হলে কি হবে, কারুর কাছে থেকে আপনি কোন উত্তর পাবেন না, উত্তর নেই তো, দেবে কোথা থেকে!

যাঁরা শাস্ত্র পড়েছেন, তাঁরা বলবেন, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেল মানে, আমার এটা স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ঠাকুর আছেন, তখন আমি দেখব সবারই ভিতর সেই ঠাকুর আছেন, ঈশ্বর বৈ আর কিছু নেই। এরপর আপনার ব্যবহার কেমন হবে? আমি তখন দেখব এই জগতে ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই। আচ্ছা ঠাকুর ছাড়া যদি কেউ না থাকে, আপনি কি ঠাকুরকে খুব করে গালাগাল দিতে পারবেন? পারবেন না। আচ্ছা ঠাকুরের প্রতি আপনি হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি করতে পারবেন? পারবেন না। ঠাকুরের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনতাই করতে বা লুট করে নিতে বা চুরি করে নিতে পারবেন? নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে মিথ্যা কথা বলে তাঁকে ঠকাতে বা প্রতারণা করতে পারবেন? অবশ্যই পারবেন না। যদি তখন আপনি ওগুলো না করতে পারেন, তাহলে এখনই আপনি এগুলোর অনুশীলন করুন না, ঈশ্বর দর্শন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার তো কিছু নেই।

ঈশ্বর দর্শন করে কি একটা সাংঘাতিক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে? আপনি যেটা অনেক দিন ধরে করে আসছেন, একটা জায়গায় যে স্থিতির কথা আগে বলা হয়েছিল, ওই স্থিতির জায়গায় এসে উপলব্ধি হয়, তখন জেনে যান যে, এটাই সত্য। যদি আপনি, 'তুমি জান না আমি কে' এই ভাব নিয়ে থাকেন, আপনার কোন দিন জ্ঞান হবে না। যদি ওটাকে আপনি মুছেও দেন বা মুছে দেওয়ার চেষ্টাও যদি করেন, আপনি যেভাবে এখন জগৎকে দেখছেন, জ্ঞান প্রাপ্তির পর জগৎটা আপনার কাছে ঠিক ওই রকমই থাকবে। যীশুর কাছে জ্ঞানলাভের আগে জগৎ যেমনটা ছিল, জ্ঞানলাভের পরে জগৎ তেমনটাই থাকল। প্রফেট মহম্মদের ক্ষেত্রেও তাই, ঠাকুরের ক্ষেত্রেও একই জিনিস। জগৎ কখন পাল্টায় না।

সেইজন্য দেখতে হয় জীবনে আপনি কি চাইছেন, ঈশ্বর দর্শন করে আপনি কি চাইছেন? আপনি বলবেন, আমার কাম-ক্রোধ-লোভ এগুলো চলে যাক। খুব ভাল, তাহলে আপনি এখন থেকে চেষ্টা করুন যাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ এগুলোকে আপনি প্রশ্রয় না দেন। চেষ্টা করে করে একেবারে শেষে গিয়ে হয়ত ওয়ান পারসেন্টে চলে গেছে, তারপর যখন ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাবে তখন পুরো একশ পারসেন্টেই বেরিয়ে যাবে। জীবন-দর্শন মানে আপনি যেটা দেখে নিয়েছেন। দর্শন তো আমারও আছে, আমিও দেখছি আমি আছি সত্য, আপনিও আছেন সত্য, আর আপনার উপর আমার ক্ষমতা দেখাতেই হবে, কারণ আমি হলাম The best। I am the best মানে, যেন তেন প্রকারে আপনাকে আমি পিষে ছাড়ব। যদি আপনাকে আমি পিষতে না পারি, আপনার নিন্দা করব। সামনে যদি নিন্দা করার দম না থাকে পিছনে করব। এখন ফেসবুক হয়ে গেছে, হোয়াটসাপ হয়ে গেছে, আপনার নামে জোকস লিখব, আপনার নামে কেচ্ছা লিখব, ছোট আপনাকে আমি করে ছাড়ব, কারণ I am the best। আধ্যাত্মিক জীবন এভাবে চলে না, কারণ আধ্যাত্মিক জীবনে নামার আগে পরিষ্কার করে নিতে হয়, ঈশ্বর দর্শনের পরে, আত্মদর্শনের পরে আমি ঠিক কি দেখতে চাইছি।

ঠাকুর এবার ওটাই দেখাচ্ছেন, ঈশ্বর দর্শনের পর কি হয়? ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই জ্ঞান হয়। এই কথা ঠাকুর স্বামীজীকে অনেকবার বলেছিলেন যে, নারায়ণই সব কিছু হয়েছেন, বা ঈশ্বর

সর্বভূতে আছেন। তখন কি হবে? *তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ*, কেউ মরে গেলেও আপনার শোক হবে না, কাউকে বা কোন কিছু পাওয়ারও আপনার ইচ্ছা থাকবে না। কারুর কাছ থেকে কোন কিছু লুকিয়ে রাখারও ইচ্ছে হবে না, কারণ আপনি জেনে গেছেন সবই নারায়ণ। এটা যে কোন তাত্ত্বিক ব্যাপার তা নয়, এটাই বাস্তবিক হয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা এটাই অনুশীলন করেন। কারণ আত্মজ্ঞান লাভের পরেও একই জিনিস হবে, যদি আপনি অনুশীলন না করেন, আপনার আমিত্ব যাবে না, আমিত্ব যদি না যায়, সিদ্ধি কোন দিন হবে না।

ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়"।

মনুস্মৃতি আদি শাস্ত্র ঠিক এই জিনিসটাই করে, ওনারা প্রথমেই বলে দিচ্ছেন আত্মজ্ঞানই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এরপরে যখন জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন, প্রথমেই বলবেন, আত্মাই যদি সত্য হয়, আত্মজ্ঞানই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমার ভালই কি আর মন্দই বা কি! গীতায় ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, অর্জুন তুমি তিনগুণের পারে যাও। তিনগুণের পারেই যদি যাই, তাহলে আমার কাছে ভাল কাজ, মন্দ কাজ বলে আর কি থাকল, ভাল লোক আর মন্দ লোক বলে কি রইল! ঠাকুর এবার এটাকে আটকাচ্ছেন। মনুস্মৃতিও ঠিক এভাবেই আটকায়। যতক্ষণ তুমি তিন গুণের পারে না গিয়ে থাক, ততক্ষণ তোমাকে এই এই জিনিসগুলিকে মানতে হবে। ইদানিং একটা লেখা পড়ছিলাম, খুব খারাপ লাগল, এক বাবাজী ফেঁসে গেছে। তাঁর চেলারা বলত, আপনি কেন এত বাজে কাজ করছেন? শিষ্যদের তিনি বোঝাতেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন পাপ হয় না। ওনাকে শিষ্যরা বলেও ছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে এই ধরণের পাপ চিন্তাও আসে না। শিষ্যরা বলতে চাইছিলেন যে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর মধ্যে কামভাব আসে না। আমাদের ঋষিরা এগুলোকে আটকাচ্ছেন, ঠাকুরও আটকাচ্ছেন, সীমা পার করো না। মনুস্মৃতি আদিতে ওই জায়গাতে অত পরিষ্কার করে বলা হয়নি, সেখানে বলছেন, এটা করলে তুমি ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবে। এখানে কিন্তু implications থেকেই নিচ্ছেন। ঈশ্বর সর্বভূতেই আছেন, তবে মন্দ লোক থেকে দূরে থাকবে। ভাল লোকের মধ্যেও তিনি, মন্দ লোকের মধ্যেও তিনি। এটাকেই আরও কংক্রিট করার জন্য ঠাকুর কয়েকটা নাম নিয়ে আসছেন।

"বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না (সকলের হাস্য)"।

যাঁরা ওখানে বসে আছেন, তাঁদের কাছে এগুলো হাসির কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু জিনিসটা অত্যন্ত গভীর। সকলের ভিতর নারায়ণ আছে, তার মানে এতো নয় যে, আপনার যারা পরিচিত, আপনি যাদের পছন্দ করেন শুধু তাদের ভিতরেই নারায়ণ আছেন। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, সাপের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, বিছের মধ্যেও নারায়ণ আছেন। কিছু নারায়ণকে পিটিয়ে দিতে হয়, কিছু নারায়ণকে দূরে রাখতে হয়। লুচ্চারূপী নারায়ণ, দুষ্টরূপী নারায়ণ, এদের থেকে দূরে থাকতে হয়। এই অধ্যায়ে ঠাকুর সংসারে কিভাবে থাকতে হবে একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। সর্বমানুষের মধ্যে না, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, মশা, ছাড়পোকা থেকে শুরু করে বাঘ, সিংহ, হাতি সবার মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। কিন্তু দুষ্ট যারা, তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

"যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাব। তার উত্তর – যারা বলছে পালিয়ে এস তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি"?

এরপর ঠাকুর একটা গল্প বলছেন, এক সাধু তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, সর্বভূতে নারায়ণ আছে, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। শিষ্যটি একদিন বনে গেছে হোমের কাঠ আনতে। এমন সময় রব উঠল হাতি আসছে, সবাই পালাও। শিষ্য হাতিকে দেখে নারায়ণ ভেবে স্তুতি করতে শুরু করে

দিল। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে, পালাও পালাও, শিষ্যটি নড়ল না। শেষে হাতিটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে শিষ্যকে ছুঁড়ে ফেলেছে। কথমৃতের খুব পরিচিত গল্প, কথামৃত যাঁরা পড়েন তাঁরা সবাই মাহুত নারায়ণের গল্প জানবেন। তাকে যখন সবাই জিজ্ঞেস করছে, 'হাতি আসছে দেখে তুমি সরে গেলে না কেন'? 'গুরু বললেন সবই নারায়ণ, হাতি নারায়ণ'। তখন তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গুরু বলছেন, 'সবই নারায়ণ বুঝলাম, তবে মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ হয় তবে মাহুত নারায়ণের কথা বিশ্বাস করলে না কেন'?

এটাকে ঠাকুর আরও এগিয়ে নিয়ে বলছেন, "শাস্ত্রে আছে আপো নারায়ণ – জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে, আবার কোন জলে আঁচানো, বাসনমাজা, কাপড়কাচা কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না"। আগেকার দিনে বিভিন্ন পুকুর থেকে, পাতকুয়া থেকে মানুষ জল আনত, এখানকার দিনে ফিল্টার্ড ওয়াটার, একই জল সব রকম কাজে ব্যবহার করা হয়। বলছেন, "তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত – সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ওইরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়"।

এরপরে একটা প্রশ্ন আসে, তার আগে আমরা শুধু এইটুকু অংশের আলোচনা করছি। স্বামীজী অনেক পরে একবার বলেছিলেন, এই যে ঠাকুর হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ বলছেন, ফিলজফিতে এটাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। এর মধ্যে নামকরা প্রশ্ন হল, ঈশ্বরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছা। ধর্মে এই ধরণের বেশ কিছু সমস্যা আছে, যেগুলোর কোন সমাধান ফিলজফাররা দেননি। ঠাকুর কিন্তু পরিষ্কার বলছেন, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমার ভিতরে যে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, সেটাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। স্বাধীন ইচ্ছাটাকে কাজে লাগাও, কারণ সেটাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। সবই নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, মাহুতও নারায়ণ। যদি তোমার ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় সবই নারায়ণ, তাহলে মাহুত নারায়ণের কথা কেন শুনছ না? এটা একাধারে খুব interesting আর খুব important।

শাস্ত্র যদিও বলছেন, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণাং তে,* শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ হোক। শাস্ত্র তো প্রমাণ বুঝলাম, শাস্ত্র তো বলছেন সবই নারায়ণ। ঠিকই বলছেন, কিন্তু ভাল করে জেনে রাখ, শেষ পর্যন্ত তোমার বুদ্ধিই তোমার গুরু হয়। যদিও ঠাকুর বলছেন, মাহুত নারায়ণের কথা শুনলে না, কিন্তু এখানে বলছেন, তাহলে আমি কোনটা শুনব? সবই তো নারায়ণ, তাহলে আমি হাতির কথাকে মানব, না মাহুতের কথা শুনব? শ্রীরামচন্দ্রকে কৈকেয়ী দশরথের নাম করে বলছেন, তোমার বাবা তোমাকে জঙ্গলে যেতে বলছেন। মা কৌশল্যা বলছেন, তুমি যেও না। সবই তো নারায়ণ, এদিকে বলা হচ্ছে, *মাতৃদেব ভব পিতৃদেব ভব*, এই দুই দেবতা যদি এখন লড়াই শুরু করে দেয়, আমি কি করব? ঠাকুর তো বলে দিলেন মাহুত নারায়ণের কথা মানো, আমি না হয় ভাল করে জানি হাতি নারায়ণের কথা মানলে আমি মরব, মাহুত নারায়ণের কথা মানলে আমি বাঁচব। কিন্তু দেখা যায়, দৈনন্দিন জীবনে যাদের কথা আমাদের শুনে চলতে হয়, অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, তাদের কোন কথাটা ঠিক, কোন কথাটা ভুল। সেইজন্য বলা হয়, শেষ অবস্থায় নিজের মনই গুরু হয়। সেইজন্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মনকে শুদ্ধ পবিত্র ও শক্তিমান করা। এটা যদি না করা হয়, আপনার সমস্ত শাস্ত্র ধুয়ে মুছে বেরিয়ে চলে যাবে, কোনটাই কাজ করবে না।

এই একটা ছোট্ট কাহিনী কিন্তু কত গভীরে চলে যাচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রই বলছেন, আত্মা ব্যতিরেকে কিছু নেই, যাঁরা ভক্তিপথের পথিক, তাঁদের কাছে ঈশ্বর বৈ কিছু নেই। ঠাকুর তো বলছেন, বাঘকে সিংহকে আলিঙ্গন করা যাবে না, এটা তো আমরা জানি না। সন্ন্যাসীদের বলা হয়, মেয়েদের থেকে দূরে থাকবে। সন্ন্যাসীরা সমাজে আছেন, মঠ মিশন চালাতে হচ্ছে, দিনরাত তাঁদের কাছে মেয়েরা আসছে যাচ্ছে। ঠাকুর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন, যদিও এটা ভাগবতের কাহিনী থেকে আসছে,

যদি পাথরের মেয়ের মূর্তি হয়, সন্ন্যাসী তাকে পা দিয়েও স্পর্শ করবে না। কারণ কেউ জানে না কোথা থেকে কি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় মনে হয় এটা ঠিক, না ওটা ঠিক। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত ত্রাতার ভূমিকায় নিজের বুদ্ধিকে দরকার। এটা হল সেই শুদ্ধ বুদ্ধি। আপনার বুদ্ধি যদি শুদ্ধ না হয়ে থাকে, আপনি যত শাস্ত্র পড়ুন, যত লেকচার শুনুন, যত গুরুসঙ্গ করুন, যত ঈশ্বরের কৃপা লাভ করুন, ওই একটার অভাবে আপনাকে সংসার বন্ধনে ফেলে নাচিয়ে দেবে। এটা গেল এক নম্বর। দ্বিতীয় হল, আমাদের জীবনে প্রচুর সমস্যা লেগেই আছে, কত রকম উৎপাত চলে, একটু যদি হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ লাগিয়ে দেওয়া হয়, দেখবেন আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমরা যখন ট্রেনে যাই, তখন আমাদের ব্যাগ, সুটকেশ বেঁধে রাখি, ভাল করে তালা দিয়ে রাখি। কারণ আমরা জানি যে এখানে সবাই অচেনা অজানা যাত্রী, এর মধ্যে কখন কে কোথা দিয়ে ঢুকে বোচকা-বুচকি নিয়ে চলে যাবে, কিছু বলা যাবে না। কিন্তু যখন রাস্তাঘাটে বেরোচ্ছি, আমরা সাবধান থাকি না। মাঝ রাত্রিতে, রাত একটার সময় একা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা খুব ভাল করে জানি যে, অত রাতে, মাতাল, চোর, ডাকাত, ছিনতাইবাজরাই ঘোরাঘুরি করে। তারপর যখন কোন অঘটন ঘটে যাওয়ার পর, আমরাই আবার সরকারকে দোষ দিই, পুলিশ বিভাগকে অপদার্থ বলি। কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে, দোষটা আমাদের নিজেদের। ট্রেনে যাওয়ার সময় আমাদের বোচকা-বুচকি খুব ভাল করে বেঁধে যাই। মাঝরাতে যখন আমরা বেরোচ্ছি, তখন আপনি আমি সবারই জন্য বিপদ কিন্তু ওঁত পেতে থাকে, যে কোন মুহুর্তে আপনার উপর আক্রমণ আসতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় যেমন আপনার বোচকা-বুচকি চুরি করে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি মাঝ রাতে একা একা রাস্থায় বেরোলে আপনার ইজ্জত চুরি করে নিয়ে চলে যাবে। যদি না সামলে থাকেন, তাহলে আপনি মাহুত নারায়ণের কথা শুনছেন না। একদিকে আপনারা বলছেন, we want equality, we want freedom, আমার সংবিধান আমাকে রাত বারোটার পরে ঘোরার অধিকার দিয়েছে। সংবিধান তো আপনাকে সাবধান থাকতেও বলছে, সেটা আপনি কেন শুনছেন না? শেষ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখবেন, আপনার যাঁরা স্বজন, সত্যিকারের যাঁরা হিতৈষী, আর আপনার যে শুদ্ধ পবিত্র মন, এরাই আপনার গুরু হয়। আপনার এই শুদ্ধ মন, পবিত্র মনই আপনাকে সতর্ক করে বলে দেবে, এটা বাঘ নারায়ণ, এটা সিংহ নারায়ণ, এদের থেকে তুমি দূরে থাক।

এরপর একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন – "মহাশয়, যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহলে কি চুপ করে থাকা উচিত"?

এই ধরণের প্রশ্নের খুব পপুলার উত্তর আছে। যেমন, যারা পড়াশোনা করেছে, তাদের যদি জিজ্ঞেস করেন, কি করা উচিত? ইংরাজী পড়া থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল থেকে বলবে, এক গালে চড় মারলে আরেক গাল দেখিয়ে দাও। খ্রীশ্চান ধর্ম এই করে পুরো জগতকে বোকা বানিয়ে এসেছে। যেখানে চড়-চাপাটি নেই, সেখানে গিয়ে ওরা তলোয়ার চালিয়েছে। কিন্তু যেখানে উপদেশ দেওয়ার থাকে, তখন বলবে, our good Lord said turn the other chik। এগুলো মুখে বলা সহজ, আর মুখে বললে খুব ইম্প্রেসিভ লাগে। যে কোন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলতে বললে ওরা নিজের থিয়োরি, ফিলজফি এগুলো বলবে। আর আপনার যদি দোষ বার করতে হয়, তাহলে আপনি আসলে যেটা করছেন সেটা বলবে। উলটে আপনি যদি ওদের জিজ্ঞেস করেন, আপনি নিজে আসলে কি করছেন সেটা বলুন তো? তখন আর কোন উত্তর দিতে চাইবে না।

আমরা প্রায়ই একটা টপিক নিয়ে আসি, শুনে শুনে আপনারাও হয়ত বিরক্ত হয়ে গেছেন। বর্তমান কালে ভারতে ইংরাজী পড়া লোক অনেকেই আছে, যেমন লিবারালসরা আছে, নামকরা সব ইতিহাসবিদরা আছেন, মার্ক্সিস্টরা আছেন, এরা সবাই বর্তমান ভারতীয় সমাজ, হিন্দু সমাজের নিন্দা করে, তোমাদের এই দোষ, তোমাদের সেই দোষ। কি করতে হবে তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে ওরা থিয়োরি

বলতে শুরু করে দেবে। নিজেরা সব সময় কি কি অনুশীলন করে, সেটা বলবে না। এটাই চিরদিনের ইতিহাস। আমরা যখন কারুর সাথে ঝগড়া করি, যখন কারুর দিকে আঙুল তুলি, আমাদের স্বভাব হল, আমাদের মনে যে উচ্চ চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, সেটার সাথে তুলনা করব আপনি যেটা করছেন সেটাকে দিয়ে।

কথামৃত ধর্মীয় বই, জীবন্ত শাস্ত্র। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, কারণ দিনরাতই আমরা এই ধরণের কিছু মানুষ পাই যারা আমাদের অনিষ্ট করতে চাইছে; তখন আমরা কি করব? কারণ বিশেষ করে যাঁরা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, এখানে তাঁদের মধ্যেও দুটো চিন্তার প্রবাহ এসেছে। প্রথম হল বৈষ্ণবদের থেকে, বৈষ্ণবরা যেখানে অহিংসার ভাব নিয়ে আছে আর অন্য দিকে বাংলায় তখন যে নবজাগরণ হয়েছে, যেখানে খ্রীশ্চানিটি, বাইবেলের প্রভাব আছে, মানুষ সেখানে ছটফট করছে। আর পিছনের দিকে যদি তাকান, মুসলমানরা এসে অত্যাচার করে যাচ্ছে, খ্রীশ্চনরা এসে অত্যাচার করে যাচ্ছে, ঠাকুরের সময়ে বৃটিশদের অত্যাচার চলছে, যখন এই প্রশ্নগুলি হচ্ছে, তার কিছু দিন আগে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এগুলো চলছে। হিন্দুরা স্বভাবে ভীতু, স্বভাবেই দুর্বল। কোন প্রশ্ন করতেও হিন্দুরা ভয় পায়। এই জায়গাতে এসে ধর্মের দুটো দিক এসে যায়, একটা হয়ে যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তন, যেখান বলা হয় ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বরের দিকে যাওয়াটাই জীবনের উদ্দেশ্য। ধর্মের দ্বিতীয় দিক হল, দৈনন্দিন জীবন আমি কিভাবে চালাবো, আর এখানেই স্মৃতি আদি শাস্ত্রগুলি এসে যায়।

আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, যে কোন ধর্মের চারটে স্তম্ভ থাকে, যার উপর ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাব তার দর্শন থেকে আসে, হিন্দু ধর্মে সেটা উপনিষদ, গীতা থেকে আসে। কিন্তু উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে মানুষ সরাসরি নিতে পারে না। সেইজন্য কথা-কাহিনীর মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে ধরার চেষ্টা করা হয় বা প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়, তখন আমরা এটাকে ইতিহাস-পুরাণ বলছি, যেটা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক উচ্চ সত্যগুলিকে আমি জীবনে কিভাবে নামাবো, অপরের সঙ্গে যখন সম্পর্ক হবে তখন কার সাথে কিভাবে ব্যবহার করব, তখন এই জিনিসগুলিকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এসে যায়। আর নিজের উত্থানের জন্য আমাকে কি করতে হবে, এই ব্যাপারে বলার জন্য আসে অর্চনাবিধি, পূজা-অর্চনা-সাধনা কিভাবে হবে। এই চারটে স্তম্ভ প্রত্যেক ধর্মেই থাকতে হবে – পূজা-অর্চনা কিভাবে হবে, লোকের সাথে ব্যবহার কিভাবে হবে, খালি সময় যখন বসে থাকব তখন উচ্চ সত্যগুলিকে চিন্তনের জগতে কিভাবে কথা-কাহিনীর মাধ্যমে রাখব আর একেবারে শেষে হল বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে সত্যগুলি, সেগুলোকে কিভাবে নেব। উপনিষদ, গীতা এগুলো মোটামুটি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে মানুষের সামনে রেখে দেন। সাধারণ মানুষ এই সত্যগুলিকে নিতে পারে না, বিশেষ করে যখন মানুষের সাথে যে আচার-ব্যবহারের কথা আসে, ওই জায়গাতে এই সত্যগুলি কম পরে যায়, তবে ওটা ওনাদের কাজ না। ওই সত্যটাকে নিয়ে পরে পরে ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, মহাপুরুষরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সংবিধান, সংহিতা এগুলো রচনা করলেন। কথামৃতে ঠাকুরের বার বার একটাই কথা, ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। তার মানে ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য।

এই জায়গাতে একটু চিন্তা করলে মনে হবে যে, আমার যদি কেউ অনিষ্ট করে তাহলে ঠাকুর আছে তিনিই দেখবেন। ঠাকুর কিন্তু সেটা বলছেন না, বলছেন – "লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে উলটে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়"।

এরপর ঠাকুর সাপ ও ব্রহ্মচারীর সেই বিখ্যাত গল্পটা বলছেন, যেটা আমরা একটু পরেই বর্ণনা করব। এখানে ঠাকুর বলতে চাইছেন, এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে অনিষ্ট করতে এসে সে ওই লক্ষণরেখাটা না পেরিয়ে যায়, এখানে ঠাকুর তমোগুণের কথা বলছেন। সত্ত্ব গুণে মানুষ শান্ত স্বভাবের

হয়, রজোগুণে মানুষ এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, নিজেক বড় করে দেখানো, এই ভাবগুলি আসে। তমোগুণে মানুষের মধ্যে ক্রোধ, হিংসার ভাব, এগুলো থাকে। উদ্দেশ্য হল সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কিন্তু যদি দেখা যায়, আশেপাশের লোকেরা সমস্যা করছে, তখন সেখানে তমোগুণটা রাখতে হয়। তমোগুণ যদি না রাখা হয়, আর এই সুযোগে ওরা যদি ছোবল মেরে যায়, তখন কিন্তু আপনার বাকি সব কিছু থেকে মন সরে যাবে।

এই আলোচনার প্রথমে আমরা এই বলে শুরু করলাম, তুলনা যখন করা হয়, নিজের যে দর্শন, নিজের যে সিদ্ধান্ত সেটা দিয়ে তুলনা করবে বর্তমানকে। আপনি ততক্ষণই ভদ্রলোক যতক্ষণ আপনার খাওয়া-পরা সব ঠিক থাকছে, যেমনি একটু বেঠিক হয়ে যায়, সমস্ত ভদ্রতা উড়ে যায়। হিন্দুরা স্বভাবেই তমোগুণী, এই তমোগুণী ক্রোধের অর্থে না, এই তমোগুণী মানে কোন কাজ করতে চায় না, ফলে হিন্দুরা সবার কাছে মার খেয়ে আসছে। মার খাচ্ছে বলেই আমরা দেখছি কৃষ্ণ কিভাবে একটা রজোগুণের সন্দেশ দিচ্ছেন। পরে স্বামীজীও এসে একটা রজোগুণের সন্দেশ দিচ্ছেন, বলছেন, ফুটবল খেললে তুমি গীতা বেশী ভাল বুঝতে পারবে। বলার উদ্দেশ্য, সবার আগে ভিতরে একটু রজোগুণ নিয়ে এসো। তবে কখনই কোন পরিস্থিতিতে হিন্দুদের হিংসা করা উদ্দেশ্য ছিল না, যেটা ঠাকুরও বলছেন, হিংসা করো না, কিন্তু তমোগুণটা দেখানো দরকার।

একটা আছে ট্রাইবাল জাস্টিস, আফগানিস্তান বা ওসব জায়গায় যদি কেউ কারুর যে কোন ধরণের অনিষ্ট করে, ওরা তখন বলে এটা আমার উপর ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত করা হল, এই আঘাতের আমি বদলা নেব। সে এখন কোর্ট কাছারি যাই করে নিক, বদলাটা কিন্তু সে নিজে নেবে। সভ্য সমাজ এটাকেই পালটে দেয়, সেখানে ওনারা আইন-কানুন এমন ভাবে প্রণয়ন করেন যাতে সাধারণ মানুষকে পদে পদে এই ধরণের বদলা নিতে না নামতে হয়। তার সাথে পুলিশ আর মিলিটার মত একটা ডেডিকেটেড ফোর্স তৈরী করেন, যারা সাধারণ মানুষকে এই ধরণের দুষ্ট লোকদের থেকে রক্ষা করে। আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা পুলিশ করে, বাইরের সুরক্ষা মিলিটারি করে। হিন্দুরা আরও এক ধাপ এগিয়ে একটা বর্ণ দাঁড় করিয়ে দিলেন – ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়দের এই দায়ীত্বই দিয়ে দেওয়া হল, যুদ্ধের সময় সীমান্তে গিয়ে দেশকে রক্ষা করবে, আর ভিতরে সাধারণ জনগণকে রাজকর্মচারী হয়ে রক্ষা করবে। আর যখন তোমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে না, রাজকর্মচারী হয়েও রক্ষা করতে হচ্ছে না, কিন্তু যদি দেখ কোন মানুষ আপদে বিপদে আছে, তুমি ক্ষত্রিয় তোমার কর্তব্য তলোয়ার নিয়ে নেমে মানুষকে ওই বিপদ-আপদ থেকে বার করে আনা, কারণ সাধারণ মানুষ এই কাজ পারবে না।

ঠাকুর এখানে সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন, সবাইকেই একটু এই তমোগুণটা রাখতে হয়, কারণ সরকারী ব্যবস্থা সব সময় আপনি হাতের কাছে পাবেন না। আর বর্তমান কালে এখানে যাচ্ছেন, সেখানে যাচ্ছেন, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে হচ্ছে, সেখানে এই তমোগুণটা একটু রাখতে হয়, যাতে দুষ্টলোক অনিষ্ট না করতে পারে। দুষ্ট লোক যদি অনিষ্ট করার সুযোগ পেয়ে যায় বা করেই দেয়, আপনার জীবনটাই একটা সংশয়ের মধ্যে চলে যাবে। মানসিক ভাবে আপনি এমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবেন যে, সারা জীবন আপনি আর কিছু করতে পারবেন না। এই যে একটা জীবন, এর মূল্য যে কত অপরিসীম, আমরা চিন্তাই করতে পারব না, এই জীবন দিয়ে একটা উচ্চ চিন্তন করে আপনি নিজেকে কত উপরে নিয়ে যেতে পারেন, যদি এই সুযোগটা নষ্ট হয়ে যায়, আবার কবে এই জীবন পাবেন কোন ঠিক নেই, একটা বিশাল অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেলেন। সেইজন্য সবাইকে তমোগুণ একটু রাখতে হয়। যীশু কিন্তু উল্টোটা বললেন। যেখানে তিনি ছিলেন, সেখানে ওরা নিজেদের ভিতর লড়াই করে যাচ্ছে, এই করছে, সেই করছে, তাদের তিনি শান্তির পাঠ দিলেন – তোমার এক গালে চড় মারলে, আরেক গাল বাড়িয়ে দেবে।

ঠাকুর কিন্তু কারুর অনিষ্ট করতে নিষেধ করছেন। কারণ কারুর অনিষ্ট যদি করে দিলেন, এরপরে এর যে ফলগুলো আসবে, সেগুলো কোন সময়ই ভাল হবে না। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে – নিজের রক্ষা নিজেকে করতে হবে। নিজের রক্ষা নিজে করার মানে হল, নিজের চারিদিকে এমন একটা লক্ষণ রেখা টেনে দিতে হবে, যাতে এ-যুগের রাবণরা এটাকে অতিক্রম করে ভিতরে না চলে আসে। যদি লক্ষণ রেখা না তৈরী করেন, আপনি কাঁদবেন। হাজার বছর ধরে যে হিন্দুদের উপর এত অত্যাচার হল, অত্যাচার কেন করা হল, আপনি হিন্দু তাই, শুধু হিন্দু বলে, অন্য আর কোন কারণ নেই। এই নয় যে, আপনি বদমাইশি করেছেন, কোন অন্যায় কাজ করেছেন, আপনি হিন্দু, শুধু এই কারণে আপনি মার খাবেন। কেন হাজার বছর ধরে হিন্দুদের মার খেত হল? কারণ এই যে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা আছে, এটাকে উপেক্ষা করে গেছে, ঠিকভাবে নজর দেয়নি। ফলে হিন্দুদের অনেক অত্যাচার ভুগতে হল।

তখন ঠাকুর মানুষকে বোঝানর জন্য এবং ঠাকুরের সামনে বসে যারা শুনছেন, তাঁদের বোঝানর জন্য খুব নামকরা গল্প বলছেন। একটা মাঠে রাখালরা গরু চরাত, সেখানে একটা বিষাক্ত সাপ থাকত। সাপের ভয়ে রাখালরা খুব সাবধানে থাকে, ওদিকে যায় না। একদিন এক ব্রহ্মচারী ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, রাখালরা এসে তাঁকে সাবধান করে দিল, 'ওদিক দিয়ে যাবেন না, ওদিকে একটা বিষাক্ত সাপ আছে'। ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমার তাতে ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি'। ব্রহ্মচারী ওদিকে এগিয়ে একটু গেছেন, সাপটা ফণা তুলে তেড়ে এসেছে। ব্রহ্মচারী সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়তেই সাপটা কেঁচোর মত পায়ে এসে পড়ে গেল। তখন তিনি সাপকে বোঝাচ্ছেন, 'তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস। আয় তোকে মন্ত্র দিচ্ছি, এই মন্ত্র জপ করবি, এতে তোর ভগবানে ভক্তি হবে আর তোর মধ্যে হিংসার প্রবৃত্তি থাকবে না'। আমাদের ভাষায় এই সাপ ছিল কেউটে, হয়ে গেল ঢ্যামনা। এখন রাখালরা মাঠে যাচ্ছে, সাপটা আর ওদের দিকে তেড়ে আসে না। পাথর ছুড়লে ফোঁস করে না। ছেলেরা একটু দুষ্টু হয়, তারপর সাপটাকে ওরা নানা ভাবে বিরক্ত করতে শুরু করেছে, কখন পাথর ছুড়ে মারে, কখন লেজ ধরে ঘুরিয়ে আছাড় মারে। এত অত্যাচার আর পীড়নে সাপটার হাড়গোর ভেঙে গেছে। সে এখন একটা গর্তে গিয়ে পড়ে থাকল। অনেক দিন পর, প্রায় এক বছর পর ব্রহ্মচারী আবার ওখানে যখন এলেন, তিনি রাখালদের সাপের খবর জিজ্ঞেস করলেন। ওরা বলল, সাপটে মারা গেছে, ওরা জানে না যে সাপটা একটা গর্তে আশ্রয় নিয়েছে। ব্রহ্মচারী তখন বলছেন, আমি ওকে যে মন্ত্র দিয়েছি, ওই মন্ত্রে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওর শরীর যাবে না।

এটি একটি খুব সুন্দর কথা, ঠাকুর বলছেন, যে-মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। ঠাকুরের এই কথাটা খুব interesting, কিছু কিছু মন্ত্র আছে, যেটার সিদ্ধ যদি না হয়ে যায়, তার দেহত্যাগ হবে না। এর ঠিক কি অর্থ হয় জানা নেই, কারণ অন্য কোথাও আমি পাইনি। আর যদি সিদ্ধ হয়, তাহলে গুরু জানতে পারবে যে ও সিদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন সত্যকাম যখন গুরুর কাছে ফেরত আসছে, গুরু বলছেন, তুমি সিদ্ধ হয়ে গেছ, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, গুরু জানতে পারেন। যাই হোক, ব্রহ্মচারী এদিক সেদিক খোঁজাখুজি করে ওর নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছেন। সাপটা গুরুর গলার স্বর শুনতে পেয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে গুরুকে প্রণাম করল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে তোর'? সাপটা বলছেন, 'আপনি বলেছিলেন হিংসা করতে না, ফলা পাতা খেয়ে আছি'। ঠাকুর এখানে আবার একটা কথা যোগ করছেন, "ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই"।

ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন, তখন সৃষ্টির সমষ্টিতে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ থাকে। সত্ত্বগুণ শুভ গুণ, রজোগুণ দিয়ে ক্রিয়া হয়, তমোগুণ সব কিছুকে আঁকড়ে রাখে, বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠাকুর এই তিনটে গুণের কথা কথামৃতে অনেকবার বলেছেন, যখন যখন আমরা আসব এর উপর আমরা আলোচনা করতে থাকব। এই তিনটে গুণ সব সময় একসাথে থাকে, কখনই কোন গুণ একশ ভাগ থাকে না। যেমন একজন খুনী চারিদিকে খুন করে বেড়ায়, একজন টেররিস্ট মানুষকে মেরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যেও সত্ত্বগুণ থাকে, আর সেই সত্ত্বগুণের দরুণ সে নিজের সন্তানকে ভালবাসে। ওর

মধ্যে সত্ত্বগুণ যদি না থাকত, তা হলে নিজের সন্তানকেও মেরে দিত। সত্ত্বগুণ আছে বলে নিজের সন্তানকে ভালবাসে। আর ঠাকুরের মত লোকেরও তমোগুণ থাকবে, তমোগুণ না থাকলে ঘুম হবে না। তিনটে গুণেরই দরকার আছে, তিনটে গুণেরই সমস্যা আছে আর তিনটে একসাথেই থাকে। কিন্তু তিনটে এক অপরের মধ্যে পাল্টাতে থাকে। আপনি যদি প্রচুর কাজকর্ম করেন, টাকা-পয়সা উপার্জন করছে, দৌড়াচ্ছেন, আপনার তমোগুণ আর সত্ত্বগুণ ধীরে ধীরে রজোগুণে পালটে যাবে। কাজকর্ম কিছু করছেন না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারাদিন লেজ নেড়ে যাচ্ছেন, আর সারা জগতের নিন্দা করছেন, মানে তমোগুণ আপনাকে পুরো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শাস্ত্র চর্চা করছেন, জপধ্যান করছেন, আপনার তমোগুণ ও রজোগুণটা ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণে পালটে যাবে। কিছু দিনের জন্য জপধ্যান ছেড়ে দিলেন, নানা রকম কাজে জড়িয়ে পড়লেন, সত্ত্বগুণটা আবার পালটে রজোগুণে বা তমোগুণে চলে যাবে। তিনটে গুণ সব সময় নিজেদের মধ্যে পাল্টাতে থাকে। আবার সকালবেলায় সত্ত্বগুণ বেশী থাকে, বেলা যত বাড়ে রজোগুণটা বাড়তে থাকে আর রাত্রিবেলা তমোগুণ বেড়ে যায়। একই দিনে, ঘন্টায় ঘন্টায় পালটায়। আপনাকে কেউ গালিগালাজ করল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে রেগে টং হয়ে গেলেন রজোগুণ বা তমোগুণ বেড়ে গেল। একটা হয় রজোগুণের রাগ, আরেকটা হয় তমোগুণের রাগ, দুটোই অনবরত পাল্টাতে থাকে। কোন পরিস্থিতি বশাৎ যদি কোন পরিবর্তন এসে থাকে, সেটাকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আপনার স্বভাব যেটা, আপনাকে সেই স্বভাবের বলা হয় – সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

এই সর্পের তামসিক স্বভাব ছিল। মন্ত্র জপ করতে করতে সে সাত্ত্বিক হয়ে গেছে, সাত্ত্বিক হয়ে গেছে বলে অতীতের খারাপ ঘটনাগুলি তার মনেও নেই। এই জিনিস বাস্তবিক হয়। যদি আপনার সত্ত্বগুণ বেড়ে যায়, দেখবেন আপনার জীবনের দুঃখদায়ক অনেক ঘটনা আপনি ভুলে গেছেন। আর যদি মনেও থাকে, সেটা মনে করে আপনার হাসি পাবে বা মনে করবেন আমারও দোষ ছিল। সাপটা ভুলে গেছে যে, রাখালরা তাকে মেরে ফেলবার অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল।

সব কিছু শোনার পর ব্রহ্মচারী সাপকে বলছেন, "ছি! তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি কামড়াতে নিষেধ করেছি, ফোঁস করতে নয়। ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন"? শেষে ঠাকুর একটা মন্তব্য করে এই প্রসঙ্গটা সমাপ্ত করছেন, "দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই"।

উচ্চ মাপের মানুষ, যাঁদের আমরা সম্মান করি, এনারা হলেন যাঁরা একটা জীবনদর্শন নিয়ে চলেন। যে কোন জীবন, একটা সাধন-ভজনের জীবনে, একটা উচ্চ চিন্তা নিয়ে থাকার জীবন, এনাদের এই ধরণের একটা জীবনধারা রয়েছে, জীবনদর্শন রয়েছে। সাধারণ লোকের জীবনদর্শন থেকে জীবনের দাম বেশী। কিন্তু যাঁদের একটা জীবনদর্শন আছে, তাঁদেরকেও দুষ্ট লোকের থেকে সামলে থাকতে হয়। আমরা জানি শ্রীশ্রীমা করুণাময়ী, তিনি সবাইকে কৃপা করছেন, সবাইকে নিজের সন্তান রূপে দেখছেন, এক শান্ত মূর্তি। কিন্তু সেই মা যখন শুনলেন এক গর্ভবতী মহিলাকে পুলিশ টেনে নিয়ে গেছে, মা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন, বলছেন, 'কোন ব্যাটাছেলে ছিল না, যে দুটো চড় মেরে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে আনতে পারত'? শ্রীশ্রীমা, যাঁর সবারই প্রতি করুণ, সবারই প্রতি ভালবাসা, কিন্তু একটি অসহায়, অবলা নারীকে অত্যাচার করছে, সেখানে এমন একটা কিছু করবে যে, যাতে আর কোথাও যেন এই জিনিসের পুনারবৃত্তি ঘটানোর কারুর সাহস না হয়।

ঠাকুর এই কথাগুলো যাঁদের সামনে বলছেন, তাঁরা কেউ অসাধারণ মানুষ না। এদের কারুর যদি এই জীবনটা বেঘোরে চলে যায়, পরে আবার জন্ম নিয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে কোন ঠিক নেই। সক্রেটিস বলুন, গান্ধীজী বলুন, ভগবান বুদ্ধ বলুন এনারা খুব উচ্চস্তরের মানুষ, এনারা মরে গেলেও যেখানে সেখানে গিয়ে পড়বেন না। আমাদের শাস্ত্রেই বর্ণনা আছে, উচ্চস্তরের মানুষ যদি এভাবে মরে যায়, এরপর তিনি যখন জন্মগ্রহণ করবেন যেখানে সেখানে করবেন না। আমার আপনার মত সাধারণ

মানুষ যদি বেঘোরে মরি, এরপর কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ব কিছু ঠিক নেই। অসাধারণ মানুষ বরাবরই কম হয়, সাধারণ মানুষই বেশী হয়। তেমনি অসাধারণ পরিবার কম হয়, সাধারণ পরিবার বেশী হয়। সাধারণ মানুষ মরলে সাধারণ পরিবারেই এসে পড়বে। গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলছেন, *অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্*। অসাধারণ মানুষের যোগীদের বাড়িতে গিয়ে কখন কখন জন্ম হয়, কিন্তু এই ধরণের জন্ম খুব কম লোকের হয়। বাকি লোকেদের কি হয়? *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে*, ভাল পরিবার, মোটামুটি খাওয়া-পরা চলে যায়, এই রকম গৃহে তাঁদের জন্ম হয়। কাদের হয়? যাঁরা যোগ সাধনা করেছেন, কিন্তু এই জন্মে সিদ্ধি হল না।

কিন্তু যারা যোগ করছে না, যারা সাধন-ভজন করেনি, হয়ত কালেভদ্রে ঠাকুরের দুটো নাম নিয়েছে, তাদের কি হয়? তাদের কথা নচিকেতা তাঁর বাবাকে বলছেন, *সস্যমিব মর্ত্য পচ্যতে সস্যমিব জায়তে পুনঃ*, ধান-গমের মত মরবে, ধান-গমের মত জন্মাবে। ধান-গম যে কোন মাটিতে হয়ে যাবে। বিশেষ ফল যদি হয়, সেটা সব মাটিতে হবে না। আঙুর চাষের জন্য বিশেষ জায়গা, বিশেষ আবহাওয়া দরকার, আম-লিচুর জন্য বিশেষ মাটি দরকার। বাংলার মাটিতে আপেল চাষ করলে হবে না, কাশ্মীরের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, হিমাচলের শীতল আবহাওয়ায় আপেল হবে। যাঁরা উচু ধরণের মানুষ, তাঁরা উঁচু জায়গাতে গিয়েই জন্মাবেন, ওনাদের নিয়ে অত সমস্যা নেই। নিজের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে যদি তিনি মরেও যান, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমাদের মত লোকেরা, যাদের এখনও ধর্মজীবনের কিছুই শুরু হয়নি, তারা যদি মরে যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যার জন্য একদিকে যেমন জীবনদর্শন ধরে রাখতে হবে, একটা আদর্শকে রক্ষা করতে হবে, তেমনি জীবনটাকেও সব দিক দিয়ে রক্ষা করে যেতে হবে, জীবনকে হেলাফেলা করে ছেড়ে দিলে হবে না।

সেইজন্য ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথাতে কোথাও এই জিনিসটা পাবেন না, তোমরা মরে যাও, মরে গেলে শান্তি পাবে। ঠাকুরকে কে একজন এসে বলছে যে, সে আত্মহত্যা করবে। ঠাকুর শুনে বলছেন, কি বলছিস তুই, জানিস না আত্মহত্যা করলে মরে গিয়ে তুই প্রেতনী হবি? এমন কোন যোনিতে চলে যাবে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসাটা তার পক্ষে মুশকিল হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন, যদি একবার বুঝে যান এরা দুষ্ট লোক, তাহলে আপনাকে উপায় দেখতে হবে যাতে ওরা এসে আপনাকে ছোবল না মারতে পারে। ফোঁস করে তাকে দূরে রাখতে হবে, যাতে আপনাকে ওরা কষ্ট না দিতে পারে। দেখতে হবে ওরা যেন কোন ভাবেই সীমা লঙ্ঘন না করে কাছাকাছি চলে আসতে পারে, নাহলে যোগ ও ক্ষেম দুটোই আপনার নষ্ট হবে, সাধন-ভজনও নষ্ট হবে, পারিবারিক স্থিতিটাও নড়ে যাবে। ওগুলোকে যদি ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেন, অন্য কারুর উপর ভরসা করে ছেড়ে দেন, যদি সরকারের উপরে ছেড়ে দিয়ে মনে করেন সরকার আমাকে দেখবে, এটা নিশ্চিত যে আপনি আর নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না। কেউ কিছু করবে না, আপনাকে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দুষ্ট লোকেরা ওই সীমাকে লঙ্ঘন করে আপনার কাছে চলে আসতে না পারে।

সেখান থেকে ঠাকুর এবার বলছেন, "ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে"।

ঠাকুর সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, আলোচনা করতেন না, ওনার কাছে এটা statement of fact, সৃষ্টি আছে, এভাবেই আছে। এভাবে আছে বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে সেটাকে ততো ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। আর এই কাজগুলো যাঁরা ফিলজফার, তাঁদের জন্য, আধ্যাত্মিক পুরুষরা এতে নামেন না। সৃষ্টিতে আমরা অনেক কিছু দেখছি, সেটারই ঠাকুর বর্ণনা করছেন।

"জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে"।

সৃষ্টি এই রকমই, এটাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেন তখন আগের কল্পে যেমন ছিল, এই কল্পেও তেমনটাই সৃষ্টি করেন। এর আগের আগের কল্পে চিরদিনই বিষফল ছিল, এখনও বিষফল হয়, আগের আগের কল্পে অমৃতের মত ফল হত, এখনও হয়। আগের আগের কল্পে সিংহ, বাঘ ছাগল শিকার করত, এই কল্পেও বাঘ ছাগল শিকার করছে। আমরা যতই স্লোগান দিই, আমাদের দাবী মানতে হবে, সিংহের ছাগল শিকার করা চলবে না, এই নিয়ম কোন অবস্থাতেই পাল্টাবে না। পুরুষ মানুষ আগে আগে এই রকমই ছিল, মেয়েরাও এই রকমই ছিল, কোথাও কারুর কোন পরিবর্তন হয়নি, এখনও একই রকম আছে।

ঠাকুর বলছেন, "তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মনও আছে, সাধু আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে"।

ঠাকুর বিভিন্ন শ্রেনীকে নিয়ে আসছেন। এই শ্রেনীগুলিই ঘুরে ঘুরে তমোগুণ, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ এই তিনটে গুণ দিয়ে বিচার করে বলে দেওয়া যাবে, কে কোন শ্রেনীর। এই তিনটে গুণের শতকরা কত ভাগ কার ভিতরে কতটা আছে, সেই অনুসারে কোন মানুষ ঈশ্বরপরায়ণ হয়, কোন মানুষ ভাল হয়, কোন মানুষ মন্দ হয়, আবার কিছু মানুষ হয় যারা অপরকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়, এমন লোকও আছে। দুষ্ট মানুষ কি রকম হতে পারে দেখাবার জন্য একটা কাহিনী আছে, একজনের সারা শরীরে চুলকানি হয়েছে। রাত্রিবেলা চুলকানিটা খুব বেড়ে যায়, চুলকাতে চুলকাতে জ্বালা ধরে যায়, সেই জ্বালার জন্য রাত্রিবেলা তার আর ঘুম হয় না। কি আর করে, শ্মশানে গিয়ে সে বসে আছে। দানাকালি এসে তাকে ভয় দেখাতে লাগল, লোকটি ভয় পাচ্ছে না। চুলকানির জ্বালায় সে এমন ছটফট করছে যে, সামনে কে এসেছে না এসেছে জানতে তার ভারি বয়ে গেছে। শেষে লোকটিকে বলছে, 'বল, কি বর চাও'? লোকটি বলল, 'আমার এই চুলকানিটা গ্রামের সব লোকেরই যেন হয়ে যায়'। আবার এমন মানুষও হয়, যাদের নরাধম বলে, একজনের দাড়িতে আগুন লেগে গেছে, সে খুব চেঁচিয়ে বলছে, 'কে আছ ভাই, আমার দাড়ির আগুনটা নিবিয়ে দাও'। একজন লোক দৌড়ে এসে বলছে, 'দাঁড়াও, আগে তোমার দাড়ির আগুনে আমার বিড়িটা ধরিয়ে নিই'। এই ধরণের মানুষ চিরদিনই ছিল, আগেও ছিল, আজকেও আছে, কালও থাকবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যে বর্ণনাগুলি আছে, সেগুলিকে নিয়ে ঠাকুর নিজের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে বলছেন, "জীব চারপ্রকার :- বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব"। ঠাকুর এই চারপ্রকার জীবের কথা বলছেন। আর তার সাথে নিত্যজীবের উদাহরণ দিচ্ছেন, "যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য – জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য"।

"বদ্ধজীব – বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে – ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

"মুমুক্ষুজীব – যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না।

"মুক্তজীব – যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয় – যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে"।

চারপ্রকার জীবের কথা বলে ঠাকুর জেলেদের মাছ ধরার উদাহরণ নিয়ে আসছেন। বড় পুকুর আছে। জেলেরা জাল ফেলেছে। কিছু মাছ আছে যারা সহজে জালে ফেঁসে যায়, তারা মনে করছে, আমি যদি জালটাকে মুখে করে জলের নীচে চলে যাই, জেলে আমাকে আর ধরতে পারবে না। কিন্তু জানে না যে, একটু পরে জেলে হড় হড় করে জালটাকে টেনে আড়ায় তোলার পর সব কটা মাছ ধরা পড়বে।

দ্বিতীয় কিছু মাছ যারা ছটফট করতে থাকে জাল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য। ওদের মধ্যে সবাই বেরিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু এক আধটা মাছ অনেক চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ধপাঙ করে লাফ মেরে জালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। জেলেরা বলে, 'এই রে একটা বড় মাছ বেরিয়ে গেল'। কিছু মাছ আছে খুব সেয়ানা, ওরা জালের ধারে কাছে যাবে না, জালেও পড়ে না। এটা যেমন চার প্রকার জীবকে নিয়ে ঠাকুর বলছেন, এটাকে জীবনে নামাতে গেলে দেখা যাবে এর মধ্যে খুব interesting একটা fact লুকিয়ে আছে।

আমরা বর্তমান কালে দেখছি দেশে কত রকমের গোলমাল চলছে। আমরা ট্যাক্স ঠিকমত দিই না, মানে যখন ট্যাক্স দিতে হয়, তখন চেষ্টা করি যত ভাবে ট্যাক্সে ফাঁকি মারা যায়। এখন তাও জিএসটি হয়ে অনেক কড়াকড়ি হয়েছে, কিন্তু আগেকার দিনে সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিনা বিলেই মাল কেনাবেচা হত। সরকারি বাসে কণ্ডাক্টর আর যাত্রীর মধ্যে রফা হত, পঞ্চাশ আমার, পঞ্চাশ তোমার, যদি দশ টাকা বাসের ভাড়া হয়, যাত্রী কণ্ডাক্টরকে পাঁচ টাকা দেবে, বদলে কণ্ডাক্টর কোন টিকিট দেবে না। আমরা জানি পুলিশের লোকেরা দুর্নীতি করছে, আমরা জানি দলের নেতারা দুর্নীতি করছে, আমরা জানি সাধুবাবারা অনেক গোলমাল করছে, আমরা জানি শিক্ষকরা গোলমাল করছে, আমরা জানি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা গোলমাল করছে। অথচ কয়েকটা বছর পিছনে যান, ডাক্তার মানে ভগবান। মানুষ কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বলত, ডাক্তার বাবু, আপনি ভগবান, আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান। আর এখন ডাক্তারের কাছে যেতে হলেই বুকের মধ্যে ধুকপুক হতে থাকবে, কি জানি কি কি টেস্ট করতে হবে, এবার আমার রক্তটা টিপে টিপে বার করবে। ভাবলে অবাক লাগে, দেশের সব ক্ষেত্রে এত এত গোলমাল, অথচ আমাদের জওয়ানরা সীমান্তে দেশের জন্য লড়াই করছে, লড়াই করতে গিয়ে কত জওয়ান শহিদ হচ্ছে। কার জন্য তারা জীবন দিচ্ছে, কটা টাকার জন্যই কি তারা মরছে? আমাদের ফরেন ইন্টেলিজেন্সির অফিসারসরা জানেন, বিদেশে যখন আমি গুপ্তচর বৃত্তি করতে যাব, আমার জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আমাকে সেখানে কাজ করতে হবে। আইবির যারা ক্রিমিনালদের মধ্যে কাজ করছে, তারাও জানে আমি যখন তখন মরে যেতে পারি। মিলিটারিতে মারা গেলে তারা তাও একটা সম্মান পাবে। কিন্তু পাকিস্তানে বসে ভারতের ইন্টলিজেন্সের লোকেরা যে কাজ করছে, ধরা পড়লে, ওখানকার জেলে তাকে পচে পচে মরতে হবে, সে সেই সম্মানটুকুও পাবে না। কিসের জন্য এরা কাজ করছে?

এবার একই জিনিস বিপরীত ভাবে দেখুন। যুধিষ্ঠির এত জ্ঞানী, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর নামই ধর্মরাজ। তিনি জুয়া খেলতে বসেছেন। দুর্যোধন নিজে জুয়া খেলায় নামল না, শকুনিকে বসিয়ে দিল। যুধিষ্ঠির এক এক করে প্রতি দানে হারতে থাকলেন। হেরেই চলেছেন, ব্রেন তাঁর ফেইল হয়ে গেছে। সমস্ত রাজ্য দানে লাগিয়ে দিলেন, হারলেন। নিজের ভাইদের লাগিয়ে দিলেন, হারলেন। শেষে দ্রৌপদীকেও লাগিয়ে দিলেন, হারলেন। যুধিষ্ঠির কি জানতেন না যে, এটা নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধ, এ-কাজ করা যায় না? এটা করতে নেই? অথচ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জ্ঞান আছে, সব কিছু জানেন, বোঝেন, তা সত্ত্বেও তিনি নিয়ম-নীতি-মর্যাদা সব কিছুকে লঙ্ঘন করছেন। কি কারণ? ঠিক যে কারণে জওয়ানরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ বলিদান দিচ্ছে, জানে যে এরা সব অপদার্থ, কার জন্য আমি লড়ছি, কার জন্য আমি মরছি; তাও তারা লড়াই করছে, তাও প্রাণ দিচ্ছে। যারা এখনও ভাল কাজ করছেন, সমাজকে শোধরানর জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁরা জানেন, এরা শোধরাবার লোক নয়। তাও করছেন। কার জন্য করছেন, কিসের জন্য করছেন? কেন করছেন? মনের নিজস্ব একটা গতি থাকে।

আমাদের একটা মঠে মজার একটা ঘটনা হয়েছিল, আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, ওনার গান-বাজনার খুব শখ ছিল। আমাদেরই আরেকটা সেন্টার থেকে ওনাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে একটা অনুষ্ঠানে গান করার জন্য। উনি হারমোনিয়া নিয়ে বহু কষ্টে ট্রেন ধরার জন্য এসেছেন, একজনকে সঙ্গে নিয়েছেন। সঙ্গীকে বললেন হারমোনিয়ামটা তুলে দিতে, উনি মহারাজকে ট্রেনে তুলে দিয়েছেন। ট্রেন

চলতে শুরু করেছে। একটু পরেই বয়স্ক মহারাজ বলছেন, 'আমি আগে আগে যে ট্রেনে যেতাম সেই ট্রেন এই সব স্টেশনে দাঁড়াতো, এই ট্রেনটা কোন স্টেশনেই দাঁড়াচ্ছে না কেন'? সঙ্গের লোকটি বলছে, 'আমরা যেখানে যাব, ওই স্টেশনে ঠিক দাঁড়াবে'। আরেকটা বড় স্টেশন যাওয়ার পর বলছেন, 'আমরা যে ট্রেনে যেতাম সেই ট্রেন তো এই স্টেশনে দাঁড়াতো, এতো কোথাও দাঁড়াচ্ছে না'। 'আপনি চিন্তা করবেন না, ওখানে দাঁড়াবে'। তারপর দেখা গেল, যেখানে নামার সেখান ট্রেন না থেমে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে চলে গেল। আসলে ওটা ছিল বম্বে মেল, সোজা জামশেদপুরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেচারী মহারাজ ওখানে ট্রেন পালটে নিজের আশ্রমে ফেরত চলে এলেন, ওখানাকার প্রোগামটাও আর করতে পারলেন না। আমাদের জীবনেও ঠিক তাই হয়, লোকাল ট্রেন ছেড়ে মেল ট্রেনে উঠে গেছে। ওনার ওঠার কথা ছিল গড়বেতা বাঁকুড়ার ওদিককার লোকাল ট্রেনে, উনি না জেনে বম্বে মেলে চেপে গেছেন, ট্রেন তাঁকে সোজা জামশেদপুর টেনে নিয়ে চলে গেছে। মনটাও ঠিক তাই, লোকাল ট্রেনে ওঠার কথা, কিন্তু উঠে গেছে গ্যালপিং ট্রেনে বা এ্যক্সপ্রেস ট্রেনে, কোথায় নিয়ে চলে যাবে ঠিক নেই।

নিত্যজীব যাঁরা, এনারা জানেন, একবার যদি ওখানে ঢুকে যাই, আর ওখান থেকে বেরোন যাবে না। দূরপাল্লার মেল ট্রেনে ওঠার মত, একবার চেপে গেলে আর নামার পথ থাকবে না। সেইজন্য জালের ধারে কাছেই এনারা যাবেন না। যুধিষ্ঠির ভাল করেই জানেন একবার যদি আমি পাশার ঘুটি ধরে নিই, এই পাশার এ্যক্সপ্রেস ট্রেন আমাকে সোজা নিয়ে যাবে ধ্বংসের দিকে। এই ট্রেনগুলো হল বিনাশ এ্যক্সপ্রেস, বিনাশেই আপনাকে নিয়ে যাবে, বিনাশের আগে ট্রেন থামবে না, আপনাকে বিনাশে নামিয়ে দিয়ে ট্রেন আবার বেরিয়ে যাবে। যেটাতে আপনার সায় নেই, যেটা আপনার ধর্মবিরোধী, যা অনৈতিক, তা যে কোন জিনিসই হোক, যেটা আমার সামাজিক জীবনের জন্য ঠিক না, আমার পারিবারিক জীবনের জন্য ঠিক না, ওর ধারে কাছে যেতে নেই।

লাটু মহারাজ গ্রামদেশে বড় হয়েছেন, ওখানে নিজেদের লোকেদের তাড়িফাড়ি খেতে দেখেছেন, সেখান থেকে ওনার ভিতরে তাড়ি খাওয়ার একটা সংস্কার আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। ঠাকুর যেদিন প্রসঙ্গক্রমে এই কথাগুলো বলছিলেন, এই জিনিসগুলি থেকে দূরে থাকতে হয়, লাটু মহারাজ সেখানে ছিলেন, তিনি ঠাকুর কথা শুনেছেন। পরে লাটু মহারাজ একদিন কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসছেন, তিনি সোজা রাস্থায় না এসে, অনেকটা ঘুরে আসছেন। ঘুরপথে কেন? সোজা রাস্থার কোথায় নাকি একটা ভাটিখানা আছে, ওর পাশ দিয়ে এলে যদি তাঁর তাড়ি খাওয়ার সংস্কারটা মাথা চাড়া দেয়, ওটাকে আটকাবার জন্য তিনি ঘুর পথে আসছেন। আমাদের মনে হতে পারে, আমি তো এগুলো কিছুই করছি না, তাহলে এত চিন্তা কিসের! আপনি একটা বারে ঢুকে গেলেন, আপনাকে কেউ বলল, 'কি ব্যাপার বারে আপনাকে দেখছি'? 'না না আমি এখানে কিছু করছি না'। 'করছি না মানে, তাহলে আপনি বারে কেন ঢুকলেন'? ঠাকুর বলবেন, যত সেয়ানা হোক কাজলের ঘরে ঢুকলে কালো দাগ একটু লাগবেই। কিন্তু এখানে কালো দাগ লাগা দূরে থাকুক, সংসারে এভাবে যদি কেউ থাকে, তাকে great destruction express টেনে পুরো বিনাশে নিয়ে চলে যাবে।

ঠাকুর এই যে নিত্যজীব, বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব ও মুক্তজীবের কথা বলছেন, এর বক্তব্য একটাই, শুধু সংসার না, এমনকি সাধারণ সাধারণ যে জিনিসগুলো রয়েছে, সেগুলোর ধারে কাছে যেও না, যদি গেছ, তোমাকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে, তুমি টেরও পাবে না। যারা বিনাশ এ্যক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে গেছে, তাদেরকেই ঠাকুর বদ্ধজীব বলছেন।

ঠাকুর বদ্ধজীবকে নিয়ে বলছেন, "বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা"।

কামিনী-কাঞ্চন বলতে সংসার না, সংসারে থাকলেই যে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত থাকবে তা না। কামিনী-কাঞ্চন হল, টাকা থেকে নিরাপত্তার আশা করে আর নারী থেকে ভোগের আশা করে। কিন্তু বিয়ে

করেছে, এদিকে তার আশার অপেক্ষা নেই, এদের কোন সমস্যা নেই। সংসারে আছি, আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার জীবন চালাচ্ছি, আমার ধর্মজীবন চালাচ্ছি, আমার ধর্মজীবন পুরো হবে, স্ত্রীর কাছে কোন আশার অপেক্ষা নেই। কামিনী মানে হল ওই আশা করছে, এখান থেকে একটু সুখ পাবো, এখান থেকে একটু ভালবাসা পাব, এটাকেই কামিনী বলে। কিন্তু যেখানে কামিনীকে ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, সেখানে তখন আর কামিনী-কাঞ্চনের কামিনী থাকছে না। মানুষকে বাঁচতে হয়, মানুষকে বাঁচতে গেলে ভিতরে তার শক্তি দরকার, ভিতরে শক্তি আনার জন্য সব সময় তার আরেকজনের কাছ থেকে উৎসাহের দরকার, প্রশংসার দরকার। এই জিনিসটা সব থেকে বেশী আসে নিজের মার কাছ থেকে আর নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে। বাচ্চা বয়সে মার কাছে উৎসাহ পায়, প্রশংসা পায়। বড় হয়ে এই জিনিসটা পায় সে নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে।

ঠাকুর বলছেন, “আবার মনে করে যে সংসারের ওই কামিনী-কাঞ্চনেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে”।

ঠাকুরও এখানে সুখ আর নির্ভয়ের কথা বলছেন। একজন নারী থাকবে, মানে কামিনী, তার দিকে তাকাবে, আশা করছে সে আমাকে ভালবাসবে। আর নির্ভয়, নির্ভয় আবার দু-দিক থেকে হয়। স্বামী যখন নিজের স্ত্রীর সাথে থাকে, আর স্ত্রী যখন নিজের স্বামীর সাথে থাকে, কোথাও এক অপরকে সাহায্য করে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি এমন একটা নির্ভরতা আসে যে, দু-জনেই মনে করে আমরা নির্ভয়ে আছি। টাকাও ঠিক তাই, টাকা মানুষকে কোথাও একটা নির্ভয় দান করে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হয়। একটা কুমির ডাঙায় মরার মত শুয়ে আছে, সেটাকে আপনি মনে করছেন একটা কাঠের গুঁড়ি। আপনাকে ওপারে যেতে হবে, এখন আপনি কাঠ মনে করে কুমিরের পিঠের উপর বসে এখন আপনি ওপারে চললেন।

বাচ্চাদের একটা গল্পে এক বানরের সাথে কুমিরের বন্ধুত্ব হয়েছে। বানর মাঝে মাঝে গাছের ফল এটা সেটা কুমিরকে খেতে দেয়। বানরের স্ত্রী বলছে, ‘কুমিরটা মিষ্টি ফল খেয়ে খেয়ে ওর কলজেটাও নিশ্চয় খুব মিষ্টি হয়ে গেছে, ওকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো’। তারপরে কুমিরকে গিয়ে বানর বলছে, ‘তোমাকে আমার স্ত্রী দেখতে চাইছে, তুমি আমার বাড়ি চলো’। যখনই কোন ভক্ত এসে বলে, মহারাজ আমার গিন্নী আপনাকে দেখতে চাইছে, চলুন আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো দেবেন। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচার জন্য বলি, আমাকে ছেড়ে দিন, কোথায় কে আমাকে খাবে কোন ঠিক নেই। বানর কুমিরের পিঠে বসল নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য। কুমির আস্তে আস্তে নদীর মাঝখানে নিয়ে গেল। বানর জিজ্ঞেস করল, ‘কি ব্যাপার তুমি ডাঙার দিকে না গিয়ে এদিকে কেন এলে’? কুমিরটাও বোকার মত বলে দিল, ‘অনেক দিন বানরের কলিজা খাইনি, আজকে তোমার কলিজাটা খেয়ে আমার আশ মেটাব’। বানরটা চালাক ছিল, ‘আরে আমি তো আমার কলিজাটা গাছে রেখে এসেছি। চলো ওটা নিয়ে আসি’। কুমিরটা বোকা, সে আবার ফেরত গেল। বানর এক লাফ মেরে গাছে গিয়ে বলল, ‘এবার তুমি এসো’। সবাই এত ভাগ্যবান হয় না। কুমিরের পিঠে বসে আপনি যদি এখন নদী পার হন, আপনারও এই দুরবস্থা হবে। ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন বলতে এখানে মেয়ে আর টাকা মনে করবেন না, সুখের আশা আর নির্ভয় হওয়ার আশা। তোমার কুঞ্চিত ওষ্ঠের একটু মিষ্টি হাসি দেখলেই আমার ভিতর থেকে শক্তির উচ্ছ্বাস ফেটে ফেটে পড়ে। কথামৃতে পর পর এই জিনিসগুলো আসতে থাকবে, আর সেখানে ঠাকুর কি কি বলছেন, সব আসবে। এটা শুধু যে কামিনীকে নিয়ে হচ্ছে তা না, সংসারে একই জিনিস হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, বলে কিনা যাই আমার নাতির চাঁদ মুখটা দেখে আসি। ঠাকুর বলছেন, চাঁদ মুখ না পোড়ামুখ। বদ্ধজীব একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

ঠাকুর বলছেন, "বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে"?

ঠাকুরের সময় এই সমস্যাগুলো ছিল, এখন আর সেই সমস্যা নেই, কারণ ইনসিওরেন্স করা আছে, পেনশান আছে, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি অনেক রকম ব্যবস্থা স্বামীরা স্ত্রীর জন্য করে রাখেন, যাতে মরে গেলে স্ত্রীর খাওয়া-পরার অভাব না হয়। অনেক আগে আমি একটা সেন্টারে ছিলাম, একদিন সেখানে একজন বয়স্ক মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বড় মহারাজের কাছে এসে বলছে, 'মহারাজ আমার স্ত্রী আমাকে মেরে ফেলবে'। 'কেন'? 'আমার রিটায়রমেন্টের কদিন বাকি আছে, এখন যদি আমি মরে যাই আমার ছেলে আমার চাকরিটা পাবে'। মহারাজ তো শুনে হতবম্ব, 'বলেন কি আপনার স্ত্রীর মাথায় এই রকম প্ল্যান'? আগেকার দিনে এগুলো খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, ইদানিং তো মাঝে মাঝেই পেপারে দেখছি। কারণ মানুষ নিরাপত্তা চায়। আমার যাকে ভালবাসা মনে করছি, সে যারই ভালবাসা হোক, বন্ধুর ভালবাসা হোক, স্ত্রীর ভালবাসা হোক, সন্তানের ভালবাসা হোক, আসলে সবাই নিজের নিরাপত্তা চায়। যদি দেখে, আপনি মরলে সে সুরক্ষিত হবে, কখন কদাচিৎ যার ভিতরে সাধুগুণ আছে, তারা এ-রকম কিছু করবে না, কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষ এই রকমই করবে। ঠাকুর বলছেন, যাকে তুমি ভাল বেসেছিলে, সে তোমার মৃত্যুর সময় বলছে – তুমি আমার জন্য কি করে গেলে, কিছুই তো করে যাওনি। আমি কি করে বাঁচব?

"আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও'। এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে"।

এগুলো নিয়ে প্রচুর কাহিনী আছে, একজন কিভাবে টাকা সঞ্চয় করেছিল, তার ছেলেরা কিছু করে না। সংসার আর ছেলেদের প্রতি এত মায়া যে, মরে গিয়ে ওই বাড়িতেই সে বলদ হয়ে জন্ম নিল। চাষের ক্ষেতে সে খুব করে লাঙল টেনে যাচ্ছে, প্রচুর খাটছে, যাতে ছেলেদের মঙ্গল হয়। খেটে খেটে বলদটা মরে গেল। এবার সে একটা সাপ হয় জন্মাল। যেখানে সে টাকা-পয়সা-সোনা লুকিয়ে রেখেছিল, সাপ হয়ে এখন সে সেখানে পাহারা দিচ্ছে। ছেলেদের প্রতি এত মায়া যে, এদের ছাড়ত পারছে না। একজন সাধু মহাত্মা সব জানতেন। তিনি বুঝেছেন সে এখন সাপ হয়ে পাহারা দিচ্ছে, ওর মোহভঙ্গ করানো দরকার। তিনি একদিন ওর বাড়িতে গিয়ে ছেলেগুলোকে বললেন, 'তোমাদের যে বাবা ছিলেন, অনেকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন, তিনি অমুক জায়গায় প্রচুর টাকা-পয়সা রেখে গেছেন। আর সাবধান ওখানে একটা সাপ আছে'। খবরটা শুনে আর কে দেখে, কাজটাজ তো কিছুই করে না। লাঠিসোটা নিয়ে হাজির, দেখছে একটা সাপ, কয়েকটা লাঠির ঘা দিয়ে সাপটাকে ছেলেরা মেরে দিল। তখন লোকটা ভাবছে, 'আরে যাদের জন্য আমি এত করলাম, তারাই আমাকে মারল'! তার মোহভঙ্গ হল, আবার এর পরে জন্ম নিয়ে তার উন্নতির শুরু হল।

"বদ্ধজীব ঈশ্বরচিন্তা করে না"। বদ্ধজীব কিনা বোঝা যাবে, ঈশ্বরচিন্তা করে কিনা। "যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে"। ইদানিং কালে গল্পটল্প করে না, ফাঁক পেলেই টিভি সিরিয়াল দেখে, না হলে কম্প্যুটারে ব্রাউজিং, মোবাইল ফোনে খুটুর খুটুর করতেই থাকবে। আগেকার দিনে ট্রেনে যাওয়ার সময় যাত্রীরা এক অপরের সাথে গল্প করত, এর কথা ওর কথা শুনত, অনেক কিছু জানা যেত, এখন তো সবাই ট্রেনের সীটে বসেই ফোন বার করে খুটুর খুটর করতে শুরু করে দেবে।

"জিজ্ঞেস করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে"। (সকলে স্তব্ধ)

লোকাল ট্রেনে কোথাও যাবেন, দেখবেন কয়েকজন লোক তাস খেলার জন্য কয়েকটা সীট দখল করে ওই জায়গাটা ঘিরে নেবে, আপনি হয়ত দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে বসতে দেবে না। এইজন্য হিন্দুরা বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আপনার একটা বয়স পেরিয়ে এসেছেন, এবার সব কিছু ছাড়ুন, ছেড়ে মনটাকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যান। আর ওই বয়সটাও যখন আরও পেরিয়ে গেল, এবার সেই অবলম্বনটাও ছেড়ে দিন, সব কিছু ছেড়ে এখন আপনি সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করুন। কিন্তু তাতে কি হবে?

প্রথমের দিকে আমরা বললাম, আদর্শ একটা জিনিস আর সেই আদর্শকে কার্যকর করা আরেকটা জিনিস। আমরা যদি অপরকে বলি, এই দেখ তোমাদের এই আদর্শ, তোমরা তা পালন করছ না, সমস্যা সেই একই থেকে যাচ্ছে। আমি অনেককে জানি যাঁরা একটা বয়সের পরে সব কিছু ছেড়ে কোন আশ্রমে বা নিজে কোন ব্যবস্থা করে একা একা থেকে ঈশ্বরের চিন্তন করে যাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মিশনও অনেক জায়গায় বৃদ্ধাশ্রম করছেন, সেখানে আদর্শ এটাই, একটা বয়সের পর আপনার জীবন-যাপন যতটা হয় ঈশ্বর চিন্তনেই নিবদ্ধ করুন। আরও একটা বয়সের পর আপনার আর কারুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তার কারণ, আপনি দেহ নন। আর আপনি যদি নিজেকে দেহ মনে করেন তাহলে আপনার কাছে দেহের সুখ, দেহের ক্রিয়া প্রধাণ। ডারউইন থিয়োরিতে যদি চলেন, আপনি এই দেহ, আপনি আরেকটা দেহকে জন্ম দিয়েছেন, সেইজন্য ওর প্রতি আপনার কিছু কর্তব্য থাকবে। আপনি তাই কাজ করতে থাকবেন, টাকা উপার্জন করবেন, ওর জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করবেন। হিন্দু মতে যদি যান, আপনি শুদ্ধাত্মা, যেটা জীবত্মা রূপে এই দেহে বাস করছেন, আত্মা তো সর্বব্যাপী, তিনি কোথাও বাস করেন না, জীবাত্মা বাস করেন। এই জীবাত্মা অনেক কিছু করেছে, তার মধ্যে একটা হল, নিজের স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে আরেক জীবাত্মার শরীর ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এখানে একটা দায়ীত্ব এসে যাচ্ছে, ঠিক আছে, আপনি তার থাকা, খাওয়া-পরা, শিক্ষা দেওয়া, লেখাপড়া করার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন, এর বেশী করতে নেই। একটা বয়সে ওর নিজের দায়ীত্ব নিজেকে নিতে দিন।

কারণ আপনার আধ্যাত্মিক জীবন-যাত্রা এই জীবনেই শেষ হয়ে যাবে না, আপনার মৃত্যুর পরেও চলবে। আর আপনার সন্তান যারা আছে, তাদেরও আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রা এই দেহেই শেষ হয়ে যাবে না, মরার পরেও চলবে। ওই যাত্রাটা যেন ঠিক ভাবে চলতে থাকে, সেটার ব্যবস্থা করুন। সারা জীবন এরা আগের আগের জন্মে যে নানা রকম কর্মের বোঝা ছিল, যেটা আপনাকে এই শরীরটা দিয়েছে, কর্মের শক্তি দিয়ে আপনাকে নানা রকম কর্ম করাল, ভোগ করাল, এবার বুঝুন, এই দেহের যে কর্তব্যগুলি ছিল, এই দেহের যে ভোগগুলি ছিল, সেগুলো হয়ে গেছে। দেহ তো ভোগের জন্যই কিনা। দেহের ভোগ হয়ে গেছে, ভোগ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর কর্ম করা কেন। কর্ম আপনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু জানবেন, এরপরে আপনার যেটা হওয়ার ছিল সেটা আপনি নষ্ট করে দিলেন।

একবার একটি ইয়ং ছেলে ব্রহ্মচারী হতে আসছিল, ওর একটাই দুর্বলতা ছিল – খাওয়া-দাওয়া করতে খুব ভালবাসে। যে সেন্টারে আমরা ছিলাম, সেখানে ফোন এলো, ছেলেটি আসছে, আপনারা ওকে রিসিভ করে নিন। বুঝলাম, আমাকে স্টেশনে যেতে হবে ওকে রিসিভ করতে। কিছুক্ষণ পর আবার একটা ফোন এলো – ছেলেটি আসতে পারছে না। কেন আসতে পারছে না? খবর নিয়ে জানা গেল, ট্রেন ধরতে স্টেশনে এসেছিল, ট্রেনের দেরী ছিল। ওখানকার একটা রেস্তোরাতে বসে ছেলেটি খেতে শুরু করল। খেতে খেতে এত খেয়ে নিয়েছে যে, ওর টিকিট কাটার আর পয়সা থাকল না। সেইজন্য ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হল, পরের দিন আবার পয়সা নিয়ে অন্য ট্রেনে আসতে হল।

এটা তাও ঠিক আছে। এবারে আপনি ভাবুন, আপনি বেড়াতে কাঠমাণ্ডু, গ্যাংটক গেছেন। আপনার যত টাকা আছে, ফুর্তি করে, মজা করে, দান করে শেষ করে দিলেন, এরপর দেখছেন ফিরে

আসার টাকা আপনার কাছে নেই। ওই বিদেশ বিঁভূইয়ে এখন আপন কি করবেন? একটা বয়সের পর যারা বেড়া বাঁধছে আর তাস খেলছে, তাদের ওই অবস্থা। আপনার কাছে পয়সা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, পয়সা হল কাজ করার শক্তি, সেই শক্তিটা যখন এ-সব কাজে খরচা করছেন, এর পরের যে যাত্রাটা হবে, সেখানে আপনার আর কিছু করার শক্তি থাকবে না, আপনাকে শেষ করে দেবে।

সেইজন্য সব সময় দুটো জিনিসকে মাথায় রাখতে হয়। আমার কিছু কর্মশক্তি আছে, এই কর্মশক্তিটা ভোগের জন্য। ভোগ যতটুকু হওয়ার হয়ে গেল, এইবার ওই কর্মশক্তিটাকে যোগের জন্য লাগাতে হবে। যোগের জন্য যদি না লাগান, এখনও যদি ভোগের পিছনে এই কর্মশক্তিকে খরচ করে দেন, আমেরিকাতে যেমন পঁয়ষট্টি বছর সত্তর বছরের লোকেরা ইয়ং ছেলেদের মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, এই বয়সে ওরা এখন ইয়ংদের মত ভোগ করতে চাইছে। ওরা মনে করে যৌবন কালে সমস্ত শক্তি ও সময় ডিগ্রী, মানযশ, পয়সা, স্ট্যাটাস অর্জন করতেই চলে গেছে, এখন এই বয়সে এসে তাই ভোগ করতে নেমে গেছে। এই পথ খুব বিপজ্জনক, কারণ দেহের যত ভোগ যৌবনে হয়, কম বয়সে হয়, থাকা, খাওয়া, পরা, যে কোন ভোগ কম বয়সে হয়। যেই ওই স্টেজটা পেরিয়ে এসেছেন, ওখানেই আপনার দেহের ভোগকে টাটা বাই করে দিন।

মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থে বলছেন, জুলপির চুলগুলো সাদা হতে শুরু হয়েছে বা নাতির মুখ দেখা হয়ে গেছে, আগেকার দিনে মানুষের অল্প বয়সে বিবাহ হত কিনা, ওই সময়ে লোকেরা যখন দাদু হত এখন ওই বয়সে লোকেরা বিয়ের পিড়িতে বসতে যায়, কিন্তু এটাই ছিল দ্বিতীয় শর্ত, এবারে তুমি বাণপ্রস্থী হয়ে যাও, সংসারে আর থেকো না, বেরিয়ে এসো। যদি না বেরিয়ে আসেন, নিজেই মরবেন। এর পরে পরে যে কাহিনীগুলো আসবে, ঠাকুর আবার এই বর্ণনাগুলিই করবেন। কারণ আপনি শুধু এই জীবনটাকে দেখছেন, এই দেহটাকে দেখছেন, এই মনটাকে দেখছেন, কিন্তু যাঁরা জ্ঞানীপুরুষ, যাঁরা ঋষি, যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁরা আপনার সম্পূর্ণ চিত্রটা দেখতে পাচ্ছেন।

জীবের মঙ্গলের জন্য নারদাদি ঋষিরা সংসারে থাকেন, যেটা ঠাকুর আগে বললেন। নারদাদি ঋষিরা হলেন নিত্যমুক্ত, এনারা জানেন জীবের কত কষ্ট, জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ওনারা জীবদের শিক্ষা দেন। এইসব বলে বলে ঠাকুর শেষ করছেন এই বলে – হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে। (সকলে স্তব্ধ)

আমরা প্রথমে শুরু করলাম অনিষ্ট করা নিয়ে, কারু অনিষ্ট করতে নেই। কিন্তু তার সঙ্গে নিজেকে বিচার করতে হয়, আমি কি ঈশ্বরে মন দিতে শুরু করেছি। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করত, নিজেকে ধীরে ধীরে ধর্মজীবনে দিয়ে দিত, সেগুলো এখন আর হয় না। আগেকার দিনে গৃহস্থরা যজ্ঞযাগ করতেন, এগুলোও আমরা এখন আর করছি না। কিন্তু একটা বয়স যখন হয়ে যায়, পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ হয়ে গেল, এবার ধীরে ধীরে নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে আনতে হয়। কারণ এই জীবনে আমি যে কষ্ট পাচ্ছি, এখন আপনি জীবনে যে কষ্ট পাচ্ছেন, এগুলো হল তার পরিণতি, যেটা আগে আগে আমরা অবহেলা করেছি। এর আগের জন্মে আমি ঠিক ভাবে কাজ করিনি, সেইজন্য আজ এই দুঃখটা আমাকে পেতে হচ্ছে। আমার দুঃখের জন্য কেউ দায়ী না, আমি নিজে দায়ী। আগে আগে শুভ কর্ম করিনি, দানধান করিনি, আজকে তাই আমার প্রাচুর্য নেই; তপস্যা করিনি, সাধনা করিনি, তাই মনে আমার শান্তি নেই; আগে আগে নিজেকে সংযম করিনি, তাই এখন সবার সাথে ঝগড়া হচ্ছে, অশান্তি বাড়ছে। তবে কিছু পূণ্য আপনার সঞ্চিত ছিল, সেইজন্য ঠাকুরের কথা শুনতে পারছেন, শাস্ত্রের কথা শুনতে পারছেন। শাস্ত্রের কথা শুনে, শাস্ত্রের কথা বুঝে সেটাকে জীবনে নামাতে হয়, আর ধীরে ধীরে ওই আধ্যাত্মিক যাত্রাকে, যেটাকে কোথাও আপনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেটাকে ধরতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
উপায় – বিশ্বাস

এরপর সপ্তম পরিচ্ছেদ শুরু হয়। একজন ভক্ত তখন জিজ্ঞেস করছেন – "মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নাই"?

সংসারে যারা একেবারে বদ্ধ হয়ে আছে তাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন না, যারা ভক্ত এখানে তাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন। এমনিতে আমরা এই প্রশ্নের একটা খুব সহজ সমাধা দিয়ে দিই, মৃত্যুর সময় হরিনাম করলে হয়ে যাবে। কথামৃতে দেখবেন একটা কথা কয়েকবার আসবে, ঠাকুরও ঘুরে ঘুরে কথাটা বলছেন – সবাই মনে করে আমি বেশ আছি। পাহাড়ে যদি খুব বেশী উচ্চতায় চলে যান, বারো হাজার, চোদ্দ হাজার ফিটে যদি চলে যান, সেখানে অক্সিজেন কমে যায়। সেই সময় কোন কারণে যদি আপনি শুয়ে পড়েন আর উঠতে ইচ্ছে করবে না, মনে হবে বেশ আছি। বরফে পড়ে ঠাণ্ডায় মরে যাবেন কিন্তু তাও বলবেন, আমি বেশ আছি। ঠাকুর কথামৃতে পরে গুটিপোকা, ঘুনির মাছ ইত্যাদি নানা রকম জিনিসের উদাহরণ নিয়ে আসবেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা এমন বিষয়াসক্ত যে, যেখানে আছি মনে হয় এখানেই আমি বেশ আছি। লোকেরা দেখছে আরে ভাই তুমি তো মরতে যাচ্ছ, কিন্তু বললে তখন শুনতে ভাল লাগে না। যদি আগের আগের জন্মে কোন পূণ্য করা থাকে, তখন হয়ত ঈশ্বরীয় কোন কথা শোনার সুযোগ হল, সেখান থেকে তার চেতনা জেগে গেল, কিংবা জীবনে এমন একটা ধাক্কা খেল, সেই মুহূর্তে কোন সাধুপুরুষ তাকে সেখান থেকে বার করে আনলেন, তখন মনে হয়, আর না, এবার থেকে এনার কথা শুনে চলব। এদের হয়ত আগে আগে কোন পূণ্য কর্ম করা আছে, সেই পূণ্যের জোরে তার হয়ত ভাগ্যটা খুলে গেল বা কোন কপালের জোরে এবার সে বেরিয়ে আসার একটা আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছে। এমনিতে সাধারণ মানুষ ধর্মের কথা, শাস্ত্রের কথা শুনবেই না, পাড়াপ্রতিবেশীদের গিয়ে এই কথাগুলো আপনারা বলুন, সামনা-সামনি হয়ত কিছু নাও বলতে পারে, কিন্তু আড়ালে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ঠাকুর প্রশ্নকর্তাকে বলছেন, "অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও"।

ঠাকুর এখানে তিন-চারটে কথা বললেন। আপনি তো বুঝতে পারছেন, আমার মধ্যে না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি, না আছে বিশ্বাস, না আছে শাস্ত্র পড়ার ইচ্ছা, ঈশ্বরে মন যায় না। কিন্তু এই বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, সাধুবাবা যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক। সাধুবাবা যে বলেছেন, ঈশ্বরের দিকে মন দাও, এটা পুরো ঠিক। তাহলে এখন কি উপায়? কি আর উপায়, মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন, তিনি দুটো শাস্ত্রের কথা বলবেন, দুটো ঠাকুরের কথা বলবেন, শুনবেন। সেখান থেকে মনের মধ্যে একটু শক্তি আসবে, এরপর নির্জনে গিয়ে বাস করবেন। এমন জায়গায় চলে যান, যেখান টিভি সিরিয়াল নেই, ফোন নেই, লোকজন নেই। সেখানে গিয়ে নিজের মনকে ছেড়ে দিন, মনে যা চিন্তা-ভাবনা আসছে আসতে দিন। নির্জনে থাকা মানে কোন বদ্ধ জায়গায় গিয়ে নিজেকে আটকে রাখা না, কোন খোলামেলা জায়গা, গঙ্গা বা কোন নদীর ধারে। চুপচাপ বসে থাকুন।

আর বলছেন, বিচার করতে হয়। লেকচার বা কোন সাধুর কাছে বা গুরুর কাছে যে কথাগুলো আমরা শুনছি, এগুলো মনে দাগ ফেলবে না। দাগ ফেলার জন্য, যে কথাগুলো শুনলেন সেটাকে বার বার বিচার করতে হয়। উপনিষদে এই জিনিসটাকে বলছেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। আমাদের সমস্যা হল, কারুর উপর আমাদের বিশ্বাস নেই, সবাই আমরা নিজেরাই জগৎগুরু হয়ে বসে আছি। ঠাকুর কলকাতার নামে বলছেন, কলকাতার লোকগুলো হুজোগে আর খালি লেকচার দেবে, সবাই

জগৎকে উপদেশ দিয়ে বেড়াতে চাইছে, সবাই সবাইকে শিক্ষা দিতে চাইছে, 'আমারও একটা বক্তব্য আছে' বলার জন্য সবাই তড়পাচ্ছে। গুরু চোখের সামনে থাকলে এরা গুরুর কথাও শুনবে না। যদি এই মানসিকতাকে পেরিয়ে থাকেন, তাহলে গুরু যে দু-চারটে কথা বললেন, আর সাধুরা সাধারণ ভাবে শাস্ত্রের কথাই বলেন, নিজের কথা তো তাঁর কিছু নেই, ওই দু-চারটে কথাকে বার বার বিচার করতে হয়। এটাকেই বলে মনন। শ্রবণ, গুরুর মুখে শাস্ত্রের একটা দুটো কথা শুনলেন, আরও শুনলেন, সেখান থেকে যখন নিজে বিচার করতে শুরু করা হল, এবার মনন হতে শুরু হয়।

আর বলছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও। সাধু বা গুরুর কাছে যে শাস্ত্রের কথাগুলো শুনেছি এবার ওর মধ্যে একটু জোর দিতে হবে, যেন ভক্তি বিশাস হয়। এই সময় যদি সাধুসঙ্গ ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এই প্রচেষ্টাটা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যাবে; তপ্ত মাটিতে একটু জল পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে জলের যেমন কোন চিহ্নই থাকে না। ওটাকে ধরে রাখতে হয়, ধরে রাখার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাস হতে শুরু হয়।

অনেক আগে একবার এক মহারাজকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বেশীর ভাগ যাঁরা এখানে সন্ন্যাসী হতে আসেন, তাঁরা কেউ হয় ঠাকুরের কিছু কথা পড়েছেন, স্বামীজীর দুটো কথা পড়েছেন, বা ঠাকুর মা স্বামীজীর আদর্শটা খুব ভাল লাগে, বা কোন মহারাজের সাথে ভালবাসার একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে প্রভাবিত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কিন্তু ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন সন্ন্যাসীদের কবে থেকে শুরু হয়'? উনি বললেন, 'প্রথমের দিকে নিজের যে সংস্কারগুলি রয়েছে সেগুলো কাজ করতে থাকে, মোটামুটি পনের-কুড়ি বছর রামকৃষ্ণ মিশনে থাকলে তারপরে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়'। ভেবে দেখলাম ঠিকই বলছেন, দুই একজন, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এনারা ব্যতিক্রম। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায়, যাঁরা সন্ন্যাস জীবনে আসেন, তাঁদের আগে কিছু একটা শুভ কর্ম ছিল, সেই জোরে এই পথে চলে এলেন। এরপর সাধুসঙ্গ করছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, শাস্ত্রের আলোচনা শুনছেন, সাথে সাথে এই ভাবাধারায় কাজকর্ম গুলি করছেন, সঙ্ঘের সেবা করছেন, করতে করতে সংস্কার তৈরী হয়। এই করতে করতে যখন পনের কুড়ি বছর পার করে দিলেন, রজোগুণ মোটামুটি বেরিয়ে গেল, এবার লড়াই সত্ত্বগুণ আর তমোগুণকে নিয়ে। একদিকে রজোগুণ শেষ, দিনে দিনে কার্যক্ষমতা কমে গেছে, এখন হয় সাধু তমোগুণী হয়ে যাবেন, বসে বসে নানা রকম চিন্তা-ভাবনা করবেন, একে নিন্দা, ওকে গালাগাল এসব করবেন আর তা নাহলে পুরোপুরি ভাবে সাত্ত্বিক জীবন শুরু করবেন।

ঠাকুর এখানে এটাই বলছেন, যখন বুঝে গেলেন যে, আমার না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি, না আছে বিশ্বাস, ঠাকুরের কাছে এবার প্রার্থনা করুন। আমি প্রায়ই লোকেদের বলি, ঠাকুর আছেন, এই বিশ্বাস হওয়া কি অত সোজা! মুখে বলে দেওয়া যায় ঠাকুরে বিশ্বাস আছে। বাড়ির গেটে যদি লেখা থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান', সেই বাড়িতে ঢুকতে হলে আমরা কত সাবধানে, কত ভয়ে ভয়ে বাড়ির গেটে এসে কলিং বেল বাজাই। কোন ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বরকে নিয়ে আমাদের কোন ভয়ডর নেই, সেই চুরি-চামারি করছি, সেই মিথ্যা কথা বলছি, সেই লোককে ঠকাচ্ছি, সেই বাঁদরামো করছি, সবই তো সমান তালে চলছে। ঈশ্বরে যদি এক কণাও বিশ্বাস হয়, তাহলে মানুষ এগুলো করতে সাহস পাবে! শ্রীশ্রীমা বলছেন, দেখ, মানুষ এমন, সে টাকার জন্য সাধুকে মুটে বওয়াতে পারে। তার মানে মানুষ সাধুকে দিয়েও খাটাবে। আমরা দিনরাত এসব কত দেখছি, ফোন করে ভক্ত বলছে, 'মহারাজ আমরা পাঁচ জন আসছি, প্রসাদের কুপন রেখে দেবেন'। 'মহারাজ আমার ছেলেকে পুরুলিয়ায় ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে'। নিজের সুবিধার জন্য সাধুকে দিয়ে মুটে বওয়াচ্ছে। একটু যদি বিশ্বাস থাকে, এই সঙ্ঘ ঠাকুরের সঙ্ঘ, এই সঙ্ঘের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আমাদের জ্ঞান, ভক্তি লাভ কিসে হয়। কিন্তু কোথায় জ্ঞান ভক্তি! সব সময় নিজের লাভ কি করে হবে সেদিকে দৃষ্টি। পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়ে মনে করছে এনাকে তো কেনা গোলাম পেয়ে গেলাম। যেমনটি

বলব, তেমনটি করবে, বাতাসা রাখবে, পায়েস রাখবে, খিচুরি রাখবে, অসময়ে হঠাৎ চলে এলে স্পেশাল লাইনে বসানোর ব্যবস্থা করে দেবে। সত্যিই তো এগুলোই মুটে বওয়ানো, এর থেকে বেশী কিছু না।

কিন্তু কারুর মনে যদি সেই সত্যিকারের ভাব আসে, তখন মনন করবে। মনন করে করে মনটা ওই ভাবে চলে যাবে, যে ভাব থেকে তার একটা বিশ্বাস আসবে, হ্যাঁ ঠাকুর আছেন। এই বিশ্বাস যদি কারুর এসে যায় যে, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখছেন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা যায়, জানবেন আপনার বিরাট কিছু হয়ে গেল। এখানে যে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, এই প্রার্থনা মেকানিক্যাল প্রার্থনা। আপনার তো বিশ্বাস নেই, আমি কোথা থেকে প্রার্থনা করবেন, যে প্রার্থনাই করবেন সেটাই মেকানিক্যাল প্রার্থনা হবে। মেকানিক্যাল মানে, সকাল বিকাল ঠাকুরের কাছে গেলেন, হাতজোড় করে বললেন, ঠাকুর তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস নেই, একটু কৃপা কর আমার যেন তোমার প্রতি বিশ্বাস হয়। এই করতে করতে একটু একটু করে এগোতে শুরু করে।

ঠাকুর বলছেন, "বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ"?

ঠাকুর রামচন্দ্র, বিভীষণের গল্প বলছেন। স্বয়ং রামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁকে লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে লঙ্কায় গিয়ে পড়ল। আরেকটা কাহিনী ঠাকুর বলছেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ শেষ, বিভীষণ লঙ্কার রাজা। কিভাবে লঙ্কার কাছে একটা জাহাজ ভেঙে গিয়েছিল, জাহাজে একজন ছিল যার সমুদ্রের পারে যেতেই হবে। সে বিভীষণের কাছে পৌঁছে গেছে। বিভীষণ বললেন, 'ঠিক আছে আমি তোমাকে সমুদ্র পার করার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'। বিভীষণ একটা পাতায় রামনাম লিখে ওই পাতাটি লোকটির কাপড়ের খোঁটে বেধে দিলেন। বলে দিলেন 'তুমি এই খোঁটটা খুলে দেখতে যাবে না'। ঠাকুর বিশ্বাস নিয়ে অনেক গল্প বলছেন। শাব্দিক ভাবে এই গল্পগুলোর সত্যতা যদি দেখতে যান, আপনি এর থেকে সত্যতা পাবেন না। এই জিনিসগুলি এভাবে বলার উদ্দেশ্য একটাই, মানুষের মনে একটা আইডিয়াকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। ঠাকুরের কাছে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়ার কয়েকটা গল্প আছে। তখনকার দিনে নদী খাল পেরোবার জন্য হয় নৌকা নয়তো সাঁকোর দিয়ে পারাপার করতে হত। পোল তো ছিল না, নৌকাই নদী পারাপার হওয়ার একমাত্র সম্বল ছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে নদী পেরোনাটা তখনকার দিনে খুব সমস্যার ছিল, সেইজন্য কোন মানুষ জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাতে পারে, সেটা যেন একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে যেত। এখন এই লোকটি দিব্যি হেঁটে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খুব ইচ্ছে হল যে, কাপড়ের খোঁটে এমন কি বাঁধা আছে, যার জোরে সমুদ্রের উপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে যাচ্ছি? একবার খুলে দেখলে হয়। লোকটি তখন খুলে দেখে একটা পাতার মধ্যে শুধু রামনাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবল, এ কি! শুধু রামনাম লেখা একটা পাতা মাত্র। যেই অবিশ্বাস এসে গেল, অমনি ডুবে গেল।

ঠাকুর তখন বলছেন, "যার ঈশ্বরে বিশাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে – গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না"।

এই কথা বলে ঠাকুর বিখ্যাত সেই মায়ের গানটা করছেন, আমি দূর্গা দূর্গা বলে যদি মরি........ নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী। এখানে একটা ঘটনা বলছি, বিদেশে আমাদের এক মহারাজ কথামৃতের ক্লাশ নিচ্ছিলেন, আর এই জায়গাতে ভ্রূণ হত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যার, স্ত্রী হত্যার কথা আছে। এক মহিলা, শুনে প্রচণ্ড খেপে গেছেন, এ্যাঁ! এইসব কথা বলছে! নারীকে খুন করে, ভ্রূণ হত্যা করে সে পার পেয়ে যাবে! মহিলা তো প্রচুর লেখালেখি, এখানে ওখানে চিঠি-চাপাটি দিয়ে

কমপ্লেন করে সোরগোল ফেলে দিলেন। মানুষ বুঝতে চায় না, গানের বক্তব্যটা কি। মনুস্মৃতি পরিষ্কার বলছেন, রাজার কাছে দণ্ড পেয়ে গেলে সে যে অপরাধ করেছিল, সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তা নাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই দুটি যদি না হয়, তাকে ভুগতে হবে। আমাদের জীবনে যে প্রতি পদে পদে এত কষ্ট, আগের জন্মে অপরাধ করে রাজার কাছে আমরা দণ্ড পাইনি, কারণ চালাকি করে বদমাইশি করে পার পেয়ে গেছি, কেউ ধরতে পারেনি। স্কুলে মাস্টারদের সারা জীবনই বোকা বানিয়ে গেছি, আজ তাই একটা মুর্খ হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছি। রাজার দণ্ড আর প্রায়শ্চিত্ত এই দুটো যদি না হয়, তাহলে ওই পাপ তাকে ঘিরে রাখবে, যতক্ষণ না ওই পাপের ভোগ হচ্ছে, ততদিন জ্বালিয়ে মারবে।

এখানে পাপ কাকে বলে, এর উপর ঠাকুর দু-চারটে কথা বলেছেন। তখনকার দিনের লোকেরা এগুলোকেই পাপ মনে করত। ঠাকুর এখানে এটা বলছেন না যে, এটা করে তুমি সমাজে যে আইনবিধি আছে, যে দণ্ডবিধি আছে, সেগুলো থেকে বেরিয়ে যেতে পার। ওই দণ্ড পাওয়ার মত যদি কোন অন্যায় কর, সেটা তোমাকে ভুগতে হবে, সেটা ঠাকুরের কাজ না। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, মনের মধ্যে যে পাপের বোধ আছে, এটা থেকে কি করে বেরোন যায়। আমরা আগে শ্রদ্ধা বিশ্বাসের কথা বললাম; শ্রদ্ধা বিশ্বাস থেকে এবার চলে আসছেন প্রায়শ্চিত্তে, সেখানে ঠাকুর বলছেন, শুধু ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলা, অমনটি আর করব না। তার আগে বললেন, শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে হাতজোড় করে বলা যাতে এগুলোতে বিশ্বাস হয়। পরে আবার ঠাকুর বলবেন, মনের পাপ পাপ না। এখানে কিন্তু মনের পাপে যাচ্ছেন না, দেহের পাপে নেমে গেছেন। সেটাতেও বলছেন, এরাও যদি ঈশ্বরের কাছে যায় এবং নিষ্ঠা নিয়ে বলে, আমি এই পাপ করে ফেলেছি, জীবনে আর কোন দিন করব না, আমাকে ক্ষমা করে দাও। এখানে ক্রিমিনালদের কথা বলছেন না, মানুষকে একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিন্দনীয় পাপের কথাই বলছেন।

এরা আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, মানুষ কিভাবে আত্মা রূপে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। আত্মার স্বভাবই হল শুদ্ধ থাকে, অশুদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁকে খাটতে হয়। একটা শিশু যখন জন্ম নেয়, উলঙ্গ হয়েই জন্মায়, তাকে কাপড় পরাতে হয়। ঠিক তেমনি আত্মা শুদ্ধ পবিত্র, অশুদ্ধ হওয়ার জন্য, পাপ করার জন্য তাঁকে কিছু করতে হয়। বাইরে জগতে আমি আপনাকে একটা গালাগাল দিলাম, আপনি তো আমাকে আর ছেড়ে দেবেন না। এটা হল বাহ্যিক ক্রিয়া, আর আপনি ওদিক থেকে আমাকে যে গালাগাল দিচ্ছেন, এটা হল আমার কর্মের ফল, একটা ক্রিয়া হল, সেই ক্রিয়ার একটা ফল হল। আমরা যে কাজই করি না কেন, বাহ্যিক জগতে তার একটা ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়ার একটা ফল হয়। মানসিক জগতেও আগে ক্রিয়া হচ্ছে, কারণ আগে মনে চিন্তা-ভাবনা হবে, তবেই ক্রিয়া হয়। ফল হল, সংস্কার রূপে মনের উপর একটা ছাপ রেখে দিল। আপনি যা করেন, আপনি যা বলেন, আপনি যা ভাবেন, সবটাই আপনার ভিতরে একটা ছাপ ফেলছে। যা ভাবছেন সেটাও ছাপ ফেলছে, যেটা বলেছেন, সেটাও ছাপ ফেলছে, যেটা করেছেন সেটাও ছাপ ফেলবে। বলা আর করা, এই দুটো ক্ষেত্রে ফলটা প্রত্যক্ষ ভাবে এসে যায়, কিন্তু ভাবলে বাইরে তার ফল হয় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল হয়। এই যে সংস্কারগুলি তৈরী হচ্ছে, এই সংস্কারগুলি আপনাকে আরও ওই ধরণের ক্রিয়াগুলির দিকেই ঠেলে নিয়ে যাবে। যেমন, একবার যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে, পরে দেখা যাবে সে আবার মিথ্যা কথা বলছে, সেখান থেকে পরে আরও মিথ্যা কথা বলছে। বাচ্চা বয়সে মিথ্যা কথা বললে আমরা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাঁপতাম। সেই বাচ্চা বড় হয়ে এমন ভাবে মিথ্যা কথা বলবে, কেউ ধরতে পারবে না, চোখ না নাড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে আরামসে বেরিয়ে যাবে। তার মানে আমার সংস্কার আমাকে একটা ভাল মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিয়েছে। যাঁরা হাসি-ঠাট্টা করতে পারেন, মজা করতে পারেন, এটা একটা কোয়ালিটি, এর পিছনেও রয়েছে তাঁর সংস্কার। ছোটবেলা অপরের নকল করত, ওটা একটা কোয়ালিটি, বড় হয়ে যাওয়ার পর এই কোয়ালিটির জোরে বড় একজন অভিনেতা হয়ে গেল।

সংস্কার সাধারণ ভাবে তিন ভাবে আসে – কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কায়িক আর বাচিকের ক্ষেত্রে বাহ্য জগতে ক্রিয়া হয়, তার ফলও হয়। যখন ধর্মের বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আসে, তাঁরা বাহ্যিক ক্রিয়া, বাহ্যিক ফলের দিকে তাকাবেন না, সেটা সমাজের কাজ সমাজ দেখবে। ঠাকুরও বাহ্যিক ক্রিয়া, বাহ্যিক ফল নিয়ে বলবেন না, আন্তরিকটা বলবেন। আপনি চিন্তা যাই করে থাকুন, কথা যাই বলে থাকুন, কর্ম যাই করে থাকুন, যে সংস্কার আপনার ভিতরে তৈরী হয়ে গেছে, এই সংস্কারকে যদি যোগশাস্ত্রের দিকে থেকে দেখা হয়, যদি কর্মকাণ্ড থেকে দেখা হয়, তাহলে এগুলো যেন পাথরের উপর একটা দাগ, এই দাগ আপনাকে ফল দেবেই দেবে।

কিন্তু বেদান্তে আমরা এটা মানি না। বেদান্তে আত্মা হলেন শুদ্ধ স্বভাবের। যেমনি আপনার মনে হল, এগুলো আমি কি করছি, বলে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন! ওর ফল ওখানেই পড়ে থেকে যাবে। ওর জন্য হয়ত আপনার কোথাও একটু সংস্কার থেকে গিয়েছল, একটু হয়ত ফল দিয়েছে, হাল্কা একটু দেবে। কিন্তু যে বীজ ফেলা হয়েছিল, যেখান একটা বিরাট বিষবৃক্ষ হওয়ার কথা ছিল, সেটা আর হবে না, ওটা ওখানেই শেষ। আর ওটা আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। ঠাকুর যখন বলছেন মনের পাপ পাপ নয়, বা যখন বলছেন, হে ঠাকুর আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দাও, হে ঠাকুর আমাকে বিশ্বাস দাও, শ্রদ্ধা দাও, এটা তো আপনার স্বভাব, আত্মা রূপে আপনি তাই, আত্মারূপে আপনি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত। কিন্তু যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে তবে থাকে সৃষ্টির মধ্যে থেকে থেকে এমন সংস্কার হয়ে গেছে যে, দুষ্টুমি ছাড়া, বদমাইশি ছাড়া, মিথ্যা কথা বলা ছাড়ে আপনি আর থাকতে পারবেন না। তাহলে কি হবে? কোন দিন কি এ-সব সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না? আগেকার দিনে জাদুকররা দড়ির খেলা দেখাত, অনেকগুলো দড়ি বেঁধে রেখেছে, দেখে মনে হবে যে এই গিটগুলি খোলা যাবে না। কিন্তু জাদুকর ছোট্ট করে একটা টান মারতে দড়ির সব গিটগুলি খুলে গেল। বেদান্ত এটাই বলে, যেমনি আপনি বললেন, আমি শুদ্ধ পবিত্র, আর আমি ও-রকম করব না, ও-রকম করা আমার আর চলবে না, এবার সংস্কারের গিটগুলি সব খুলে যাবে। কিন্তু আবার যদি আপনি মিথ্যা কথা বলেন, বদমাইশি করেন বা করার ইচ্ছা করেন, তার মানে আপনার ওই ভাব ভিতর থেকে আসেনি, ওগুলো মুখের কথা মাত্র ছিল। ছেলেগুলি যখন বদমাইশি করে ধরা পড়ে, খুব পিটুনি খায়, বকুনি খায়, ওরা তখন খুব নিষ্ঠা ভরে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলবে, আর ও-রকমটি কোন দিন করব না। কিন্তু মনে মনে বলছে, আমি যে এই মার খাচ্ছি, বকুনি খাচ্ছি, দুষ্টুমি করার জন্য না, ধরা পড়ে গেছি বলে। আগামী বার এমন ভাবে করতে হবে, যাতে ধরা না পড়ি। পরের বার দুষ্টুমি করার সময় এমন প্ল্যান করে করবে, যাতে ও ধরা না পড়ে। এই প্রবৃত্তিটা যদি সে বড় হওয়ার পরেও চালিয়ে যায়, মুখের কথায় ঠাকুরকে বলে দিল, আমি আর এই নোংরা কাজ করব না, তাতে শুদ্ধ হবে না। যদি এখনও আপনার মধ্যে ওই প্রবণতা মাথা চাড়া দেয়, তাহলে বুঝবেন, আপনাকে এখনও অনেক কঠখড় পোড়াতে হবে। যদি কেউ সত্যিকারে নিষ্ঠার সাথে বলে, এই রকম হয়ে গেছে, এই শেষ, আর কোনদিন হবে না। সে ওই কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে গেল, ওকে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। কারণ বেদান্ত মতে এটাই হওয়ার কথা।

ঠাকুর তখন সেই বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতটা গান করছেন, আমি দূর্গা দূর্গা বলে মা যদি মরি। বেদান্তের দিক দিয়ে যদি দেখা হয়, এটাই স্বাভাবিক। ভক্তির দিক থেকে যদি দেখা হয়, এটা তখন বিশ্বাসের কথা। মানুষ এমন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে, যারা ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরকে এমন বিশ্বাস করছে যে, সে জানে ঠাকুর কখনই আমার ক্ষতি করবেন না। আমি অনেক সাধুদের দেখেছি, যাঁদের ঠাকুরের উপর এত বিশ্বাস যে, একটা বিরাট অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, তখনও দেখছি তিনি বলছেন, 'ঠাকুরের উপর বিশ্বাস আছে, না না এটা হবে না'। সত্যিই হয় না। আমাদের কাছে এগুলো কাকতালীয় মনে হতে পারি, কিন্তু আমরা নিজের চোখে এত ঘটনা দেখেছি যে, বিশ্বাস করা ছাড়া কোন পথ নেই। তার মানে এই নয় যে, তাঁর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা প্রকৃতির নিয়মকে পালটে দিচ্ছে। সাধারণত দেখা যায়, ওনাদের একটা বিশ্বাস থাকে, আর যাঁরা সত্যিকারের বিশ্বাসী যদি দেখেন অন্য রকম কিছু হয়ে যাচ্ছে, ওনারা আগেই

বলে দেন, 'ঠাকুর কেন এটা করছেন জানি না, করছেন যখন করুন, কি আর করা যাবে', যা হয়ে গেছে, ওটাকে মেনে নিচ্ছেন।

মূল কথা হল, শ্রদ্ধা ভক্তির দিকে এগোতে হয়। যদি বুঝে গেলেন, আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, তাহলে নিয়ম-নিষ্ঠা করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে, মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আচার্য শঙ্করের রচিত মায়ের নামে খুব সুন্দর সুন্দর স্তব আছে, বা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও একাদশ অধ্যায়ে মায়ের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর স্তব রয়েছে, শুধু এই স্তব রোজ পাঠ করুন, দেখবেন ধীরে ধীরে ভিতরে ভক্তি এসে গেছে। খাল কেটে জল আনতে হবে না, জল আপনার ভিতরেই রয়েছে। বাইরে থেকে যে আবরণগুলি এসেছে, প্রার্থনা করলে ওই আবরণগুলি সরে যায়।

ঠাকুর এবার নরেনের কথা বলছেন, "এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি"।

নরেনের তখন খুব বেশী হলে ঊনিশ বছর বয়স। কিছু কিছু বাচ্চা ছেলে আছে দুর্দান্ত শক্তি, এরাই পারে। বাবার কাছে যখন থাকে শান্ত ভাবে চুপচাপ বসে থাকবে। একবার ওখান থেকে ছেড়ে দিয়ে দেখুন, ওর দুরন্তপনা দেখে কেউ ওকে সামলাতে পারে না।

ঠাকুর বলছেন, "এরা নিত্যসিদ্ধের থাক"। এর আগে নারদাদির কথা হল, সেখানে নিত্যসিদ্ধের কথা বলছেন, যে মাছগুলো জালের কাছেই যাবে না, এরা নিত্যসিদ্ধ।

কথামৃতে এই বাক্যটা যখন পড়ি, ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন। মাস্টারমশাই নূতন আসছেন। মাস্টারমশাই তখন জানেনও না যে, তিনি এই কথাগুলো লিখবেন। ঊনিশ কুড়ি বছরের নরেন, তখন তিনি কলকাতা শহরে বদমাইশি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর বলছেন, নিত্যসিদ্ধের থাক। এটাকে পড়ার পর যদি একটু অনুভব করার চেষ্টা করেন, গায়ে যদি একটা কারেন্ট না মারে, তাহলে বুঝবেন যে, কথামৃত আপনার জন্য নয়। একবার শুধু অনুভব করার চেষ্টা করুন, সাধারণ লোক সব দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের সামনে বসে আছেন, ওদের সবার সামনে ঠাকুর বলছেন, He is God, নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সাক্ষাৎ সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, এই দেখ ঈশ্বরকোটি, ভগবানের নিত্যসঙ্গী। ভগবানের নিত্যসঙ্গী আর ভগবানে কোন তফাৎ থাকে না। ছেলেটির তখন বয়স মাত্র আঠারো ঊনিশ।

একবার কল্পনা করুন, আজ বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য কথামৃতের এই দৃশ্যটাকে চোখের সামনে দেখার চেষ্টা করবেন। দু-মিনিট আগে ঠাকুর বললেন, নারদাদি এনারা হলেন নিত্যসিদ্ধের থাক, এনারা এই জগতে আসেন শুধু মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। পুরাণে যে কাহিনীগুলো আমরা পড়ি, সেখানে ভগবান বিষ্ণু যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই নারদকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরাই এখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আর নরেন হয়ে বসে ভক্তদের সাথে কথা বলছেন। একবার কল্পনা করে দেখুন, ওখানে সবার সামনে একটা আঠারো ঊনিশ বছরের ছেলেকে দেখিয়ে বলছেন, এরা হল নিত্যসিদ্ধের থাক। যাঁরা ওখানে এই কথাগুলো শুনছিলেন, তাঁদের কারুর মধ্যে একটু যদি সংবেদনশীলতা থাকত, তাঁর কি রকম একটা ইলেক্ট্রিক শক্ লাগবে ভাবতে পারছেন! হিন্দুদের যাঁরা শ্রেষ্ঠতম ঋষি, নারদাদি ঋষি যাঁরা, সেই এক গোত্রের ঋষি তিনি।

কিন্তু পরে ঠাকুর বর্ণনা করবেন, ঠাকুরের কথা শুনে ঠাকুরের কাছে লোকজন আসত। ঠাকুর কথা বলছেন, সবাই শুনছে। সঙ্গের বন্ধুরা কনুই দিয়ে গুঁতোচ্ছে, আর কতক্ষণ শুনবি, এবার চল উঠি। তাতেও যখন উঠছে না, তখন বলছে, ঠিক আছে তুই শোন, আমি নৌকাতে গিয়ে বসছি। আমরা সবাই ওই দলেরই লোক। ঘরে আমরা ঘুমোতে যাই, শোওয়ার আগে লাইট অফ্ করতে যাচ্ছেন, হঠাৎ

দেখলেন ঘরের ভিতর একটা সাপ, আপনার তখন কি অবস্থা হবে? এই কথাগুলো পড়ে ঠিক ওই রকম শক্ না যদি হয়, বুঝতে হবে এখনও ভিতরে অনেক আবর্জনা আছে, প্রস্তুতি নিতে এখনও অনেক সময় লাগবে। ঠাকুরকে আপনি যাই মনে করে থাকুন, তিনি অবতার, তিনি অবতার নন, তিনি সাধু, তিনি সাধু নন, যা যা মনে করার করতে পারেন, কিন্তু যিনি এতক্ষণ এই উচ্চমানের কথাগুলো বলছেন, তিনি একজনকে দেখিয়ে বলছেন, ওই ছেলেটি জানো কে? ভগবানের নিত্যসঙ্গী। একবার একটা ফিল্মস্টারের নাম নিয়ে বলুন, কলকাতার অমুক ময়দানে আসছে, দেখুন পুরো কলকাতা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঠাকুর ওখানে বলছেন, ওই যে ছেলেটাকে দেখছ, এ ভগবানের সঙ্গী। কেউ শোনার নেই। আজ একশ বছর হয়ে গেছে, আর আমরা নাকি তথাকথিত ভক্ত, আমাদের মধ্যে নাকি একটু জ্ঞান ভক্তি হয়েছে, আমাদেরও এটা বোঝার ক্ষমতা নেই যে, ঠাকুর কোন লেভেলে কি জিনিসের কথা বলছেন।

আবার বলছেন, "এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না"। একেবারে খোলসা করে বর্ণনা করে দিচ্ছেন, এখানে নরেনের চারিত্রিক বর্ণনা করছেন না, ঈশ্বরের যাঁরা নিত্যসিদ্ধ তাঁরা কি রকম হন তার বর্ণনা করছেন। "একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য", যেটা আগে ঠাকুর নারদাদিকে নিয়ে বলছেন, "এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না – এরা সংসারে কখনও আসক্ত হয় না"।

ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, "বেদে আছে হোমাপাখির কথা"। বেদে কোথায় আছে আমার জানা নেই। তবে জুরাষ্ট্রিয়ান, অর্থাৎ পার্সি ধর্মে একটা এই ধরণের ট্রাডিশান আছে। ঠাকুরের কাছে অনেক সাধুরা আসতেন। সব সাধুরা তো আর পণ্ডিত ছিলেন না। বেশীর ভাগ সাধুই ছিলেন, 'লঙ্কা মে কৌন রাজা হ্যায়? বিভীষণ', সাধুরা এখান ওখান থেকে এর ওর কাছে দু-চারটে গল্প শুনে সেটাই সব জায়গায় ছড়িয়ে দিত। ঠাকুরও শুনেছেন, তিনি তো আর বেদ অধ্যয়ন করেননি, তিনি সরল মানুষ, শুনেছেন, সরল মনে বিশ্বাস করছেন, সেটাই বলছেন। তবে উনি যে গল্পগুলো বলছেন, এখানে গল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ না, গল্পের পিছনে যে আইডিয়াটা দিচ্ছেন সেটারই একমাত্র দাম।

হোমাপাখির গল্প হল, ওরা দিব্য পাখি। অনেক উঁচুতে থাকে, ওই উঁচুতেই ওরা ডিম দেয়। উঁচু থেকে ডিম যখন নীচে পড়তে থাকে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে ছানা বেরিয়ে আসে। এবার ছানাটাও পড়তে থাকে, যখন মাটির কাছাকাছি এসে যায়, তখন হঠাৎ দেখে মাটিতে পড়লে আমি শেষ। মাটিতে পড়ার আগে সে চোঁ চাঁ মায়ের কাছে দৌড় মারে। জানে কামিনী-কাঞ্চনে আমার সর্বনাশ। এইসব শুনে নরেন ওখান থেকে উঠে চলে গেলেন, এই কথাগুলো নরেনের নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না। যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম করছেন – কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

ঠাকুর ওখান থেকে এবার জাগতিক স্তরে এসে নরেনের প্রশংসা করছেন – "দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশোনায় – সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচকচ করে কেটে দিতে লাগল"।

ঠাকুরের কাছে এগুলো খুব আশ্চর্যের ছিল, ইংরাজীতে কথা বলছে, তর্ক করতে পারছে। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন – "ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা"?

ঠাকুরের পড়াশোনা ছিল না, তিনি এ্যরিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস, এনাদের কথা জানেন না। Detuctive logic, inductive logic এই কথাগুলো জানেন না। মাস্টার বললেন – "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইংরেজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে"। আমাদের যেমন ন্যায়, পাশ্চাত্যে লজিক বলে। শুধু লজিক না, পাশ্চাত্য দর্শন যাঁদের পড়তে হয়, তাঁদের এই জিনিসগুলো অনেক বিস্তারে পড়তে হয়।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা কিরকম একটু বল দেখি। ঠাকুর বোঝার চেষ্টা করছেন, মাস্টারমশাইও বোঝানর চেষ্টা করছেন, একটা জিনিস দেখলেন, সেখান থেকে অনুমান করলেন। যখন তর্ক হয়, ওর জন্য একটা সত্যকে দেওয়া হয়, সেই সত্যকে নিয়ে আবার এগিয়ে যাওয়া হয়। মাস্টারমশাই কাকের কথা, পণ্ডিতের কথা বলছেন। আমাদের আর বিস্তারে গিয়ে লাভ নেই। বোঝাচ্ছেন inductive logicএ কি কি সমস্যা হতে পারে। "এইরূপ সাধারণ তর্কের কথা ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে"।

"শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন"। ঠাকুরের কাছে এগুলো কাজের না। ঠাকুর বারবার বলছেন, মাইরি বলছি, আমি ঈশ্বর বৈ কিচ্ছু জানি না। বিজ্ঞান হোক, লজিক হোক, শাস্ত্র হোক, যাই হোক, যদি ঈশ্বরের সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক না থাকে, ঠাকুর ওই দিকে মন দিতে পারবেন না, চেষ্টা করলেও দিতে পারবেন না। মাস্টারমশাই শেষ করছেন এই বলে, "কাজে কাজেই আর এ-বিষয়ে বেশি প্রসঙ্গ হইল না"। এখানে এসে সপ্তম পরিচ্ছেদ শেষ হচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
সমাধি-মন্দিরে

তৃতীয় দর্শনের অষ্টম পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে। শুরু করার আগে একটা-দুটো প্রয়োজনীয় কথা বলে নিলে আলোচ্য বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে। দেববাণীতে স্বামীজী দেখাচ্ছেন, কিভাবে ধর্মের একটা সাধারণ ভাব থাকে, আরেকটা উচ্চভাব থাকে। ধর্মে উচ্চভাবকে স্বামীজী বলছেন ফিলজফি, তার অর্থ হল core spirituality। ফিলজফি কোন মনের খেলা না। যখনই ধর্মের ব্যাপারে স্বামীজী ফিলজফি শব্দ আনছেন, তার অর্থ সব সময় হয়, core spiritual truth। যেমন উপনিষদ, উপনিষদ হল একেবারে core spiritual truth।, গীতাও অতটা যায় না, যতটা উপনিষদ core spiritual truth নিয়ে আলোচনা করে। উপনিষদে একটা শব্দও ডানদিক বাঁদিক নেই, এটাকেই বলে ফিলজফি। সাধারণ মানুষ সেইজন্য উপনিষদকে নিতে পারে না, সম্ভবই না। আগেকার দিনের গুরুরা সেইজন্য আশ্রমে অল্প বয়সে ব্রাহ্মণ সন্তানরা যখন অধ্যয়ন করতে আসত, ওদেরকে দিয়ে বেদ উপনিষদ মুখস্ত করাতেন। গীতা, উপনিষদ, বেদ যে কোন শাস্ত্র পড়তে গেলে প্রথমে মুখস্ত করতে হয়। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন উপনিষদ, গীতার ক্লাশ নিই প্রথমে আমিও সবাইকে মুখস্ত করতে বলি। যেমন যেমন evolve করবেন তেমন তেমন আপনার বোঝার ক্ষমতাটাও evolve করবে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন শুকতারার মত কিছু কিছু ম্যগাজিন পড়তে ভাল লাগত, নন্টে ফন্টে, বাঁটুল দা গ্রেট কী ভালই না লাগত। এখন আর এগুলো আমাদের বেশী টানতে পারে না, কারণ আমরা বড় হয়ে গেছি। এখন হাতের কাছে শুকতারা পেলে নন্টে ফন্টে হয়ত পড়ব, কিন্তু সাথে সাথে এটাও মনে পড়বে, বাচ্চা বয়সে এগুলো পড়ার জন্য কি ছটফট করতাম।

ধর্মের জগতেও ঠিক তাই হয়। ধর্ম যখন শুরু হয় তখন প্রাথমিক কিছু ক্রিয়াকলাপ দিয়েই শুরু হয় – তুলসীতলায় সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ দিতে হবে, গঙ্গাজল পান করতে হবে, ধুপধুনো দিতে হবে, বিভিন্ন রকম ক্রিয়াকলাপ থাকে। এর পরের ধাপে রামায়ণ মহাভারতে যে কাহিনীগুলো আছে, সেই কাহিনীর মাধ্যমে কি বলতে চাইছেন, বোঝার চেষ্টা করেন। শেষ হয় গীতা উপনিষদে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করাতে, কিন্তু এটা সবার জন্যই কঠিন। আমাদের স্বভাব হল, আমরা ওটাই পড়ি যেটা বুঝতে পারি, যতটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে তার এক ধাপ যদি এগোতে হয়, অতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে। ওর বেশী যদি এগোতে বলা হয়, মস্তিষ্ক নিতে পারে না।

কথামৃত এক বিশেষ গ্রন্থ। মহাভারত যদি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন, যুদ্ধাদির বর্ণনা ছেড়ে বাকি সব জায়গায় কাহিনীগুলিকে বা ঘটনাগুলিকে একটি বা দুটি শ্লোকে বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন,

তারপরেই তত্ত্ব কথাতে নেমে যান। আমাদের সাধারণ মন, এই মন শুনতে চায় কাহিনী, তত্ত্বগুলিকে ডিঙিয়ে মন আবার কাহিনীতে চলে যায়। কিন্তু যেমন যেমন আপনি বড় হতে লাগলেন, তেমন তেমন কাহিনীর প্রতি আপনার মনের আগ্রহটা কমতে থাকে, মন তখন তত্ত্ব কথা শুনতে, সেগুলোকে নিয়ে একটু গভীরে গিয়ে চিন্তন করতে চায়। ভাগবতে কথায় কথায় তত্ত্ব কথা শুরু হয়ে যায়। প্রথমের দিকে মানুষ ওই কাহিনীগুলিতে বেশী মজা পায়। সেখান থেকে বুদ্ধি একটু পরিপক্ক হলে তত্ত্ব কথার দিকে যেতে শুরু করে।

যেমনি তত্ত্বকথার দিকে যেতে শুরু করে, তখন দেখছে সে আর ধারণা করতে পারছে না। ধারণা করার জন্য একটা প্রশিক্ষণ দরকার পড়ে। তার থেকেও বড় হল, যাঁরা তত্ত্বকথা জানেন, তাঁদের সঙ্গ না হলে এগুলোকে বোঝা ও ধারণা করা খুব কঠিন। কথামৃতে ঠিক একই ব্যাপার হয়, এখানে শুধু কাহিনীর বদলে বর্ণনা আছে। বাল্মীকি রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে যেমন কাহিনী রয়েছে, কাহিনীর সাথে তত্ত্বকথা একেবারে মিশে আছে, সেদিক থেকে কথামৃত একটু আলাদা, এর মধ্যে বর্ণনা রয়েছে, আর তার সাথে রয়েছে তত্ত্বকথা।

বর্ণনাতে একটা মস্ত বড় সুবিধা হল, যেমনি বলা হচ্ছে, ঠাকুর এখন দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজেকে ওই বর্ণনার সাথে একাত্ম করে নিতে পারছেন। সেখান থেকে বর্ণনা আছে, ঘরে নরেন আছে, রাখাল, লাটু, তারক অনেক ভক্ত উপস্থিত, এই বর্ণনাগুলো পড়তে ভাল লাগে। ঠাকুর একটা দুটো কথা বলছেন, সেগুলো পড়তে ভাল লাগে। ঠাকুর আবার কাহিনী বলতে শুরু করছেন, তখন ওগুলো শুনতে আরও বেশী ভাল লাগে। কিন্তু কথামৃত তো শুধু এই ভাল লাগার জন্য নয়, কথামৃতের বৈশিষ্টটাই হল একেবারে core spiritualityর দিকে নিয়ে যাওয়া। শুধু কথামৃত কেন, যে কোন ধর্মগ্রন্থের প্রধান কাজ হল তত্ত্বকথা বলা। কাহিনীর মাধ্যমে তত্ত্বকথা বলারও দরকার আছে, কারণ সাধারণ মানুশ তত্ত্বকথা, শুধু তত্ত্বকথাই না, যে কোন উঁচু কথা সরাসরি নিতে পারে না।

আপনারা যেহেতু কথামৃত শুনতে চাইছেন, এরপর কথামৃত রোজ এক পাতা কি দু পাতা অবশ্যই পড়বেন। যাঁদের রাত্রে ঘুম আসতে চায় না, শোওয়ার আগে কথামৃত নেবেন, দু-তিন পাতা পড়বেন, পড়ার পর করে জপ করতে শুরু করবেন। ঘুম যদি না হয়, জপ হবে, পূণ্যলাভ হবে। আর ঘুমিয়ে যদি পড়েন, তাও ভাল, কারণ ঘুমানোর জন্যই তো চেষ্টা করছিলেন। যেটাই করবেন সেটাতেই লাভ। কথামৃত রোজ নিয়মিত পড়তে থাকলে ভিতরে ভিতরে আপনা থেকেই একটা প্রস্তুতি হয়ে যাবে, আর ওই ভাবটা চলতে থাকবে। তখন দেখবেন মাঝে মাঝেই ভাল স্বপ্ন আসতে থাকবে। আমরা যে কথামৃত ক্লাশ করছি, এখানে আমরা বর্ণনাগুলির মধ্যে বেশী যাচ্ছি না, কারণ ওগুলো আপনি নিজে থেকে পড়লেই বুঝে নিতে পারবেন। তবে যে তত্ত্বকথাগুলি রয়েছে, সেগুলোকে আমরা যতটা সম্ভব বিস্তারে গিয়ে ব্যাখ্যা করছি। আর আমি নিজে যে এগুলো সব বুঝেছি বা অনুভব করেছি তা তো না, কিন্তু গুরুমুখে এবং পরম্পরায় প্রাচীন সাধুদের মুখে যা শুনেছি, সেটাকেই ব্যাখ্যা করছি। আপনি যেমন যেমন উন্নতি করবেন তেমন তেমন কথামৃতে ঠাকুরের কোন কথা পড়তে পড়তে আপনার মনে হবে যে, ও আচ্ছা! এখানে ঠাকুর এই কথা বোঝাতে চাইছেন। আমারও সেই রকম মনে হয়। দশ বছর বয়সে প্রথম আমি কথামৃত বই কিনেছিলাম, তখন কি পড়েছিলাম ভগবান জানেন, কিন্তু মনে হয়েছিল এটাই একটা বই কেনার মত। কুড়ি বছর বয়স থেকে কথামৃত পড়া শুরু হল, এখন গিয়ে বুঝছি যে, কিছুই বোঝা যায় না। বোঝা যাবে না, কারণ আপনি যত evolove করবেন, দেখবেন ওটা ঠিক ততটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে এই প্রথম মাস্টারমশাই সমাধির কথা বলছেন। একটু পরেই সমাধির কথা আসবে। ওই জায়গার যাওয়ার আগে সমাধির উপর আমরা দু-চারটে কথা বলে নিতে পারি। ঠাকুরের

একটা খুব মজার কথা আছে। একজন এমনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছে, ঠাকুরের নাম হয়ত কোথাও শুনে থাকবে। ঠাকুরকে এসে বলছে, মশাই! আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন তো। 'সমাধিটুকু' মানে, সমাধির আগে ও পরে আর কিছু লাগবে না। একটা গল্প আছে, একজন একটা কোম্পানিতে চাকরির জন্য গেছে। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মজা করে তাকে বলছেন, 'বল তুমি কি চাকরি চাও'? লোকটি বলল, 'আগে বলুন কোম্পানির বিভিন্ন লোক কি কি করে'? সব শুনে নিয়ে লোকটি বলল, 'প্রেসিডেন্টের চাকরি তো আমাকে দেওয়া যাবে না, আপনি তাহলে আমাকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট করে দিন'। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ইতিমধ্যে আমাদের বারোজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আছেন'। শুনে লোকটি আবার বলল, 'দেখুন তেরো নম্বর সংখ্যাটা আমার কাছে কোন অপয়া সংখ্যা না, আপনি আমাকে তেরো নম্বর ভাইস-প্রেসিডেন্ট করতে পারেন'। বিদেশে তের সংখ্যাটা অপয়া কিনা। এভাবে কোন কোম্পানিতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না, সমাধিও এভাবে হয় না।

কথামৃত সমাধিকে নিয়েই অধিক আলোচনা চলবে। ভক্তিশাস্ত্র দিয়ে সমাধিকে যদি দেখা হয় – ঠাকুর বলছেন প্রথমে হয় ভক্তি, মানে একটা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ, সেখান থেকে আসে ভাব, মন তখন ওই চিন্তা-ভাবনা নিয়েই থাকে। ওই ভাব থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকমের ভক্তি হতে শুরু হয়। আর শেষে বলছেন প্রেমাভক্তি। প্রথমে বৈধী ভক্তি করে করে ভাবে যাচ্ছে, ভাব পাকতে পাকতে আসে প্রেমাভক্তি। শেষ অবস্থায় গিয়ে যেখানে প্রেমাভক্তি আসছে, আমাদের অন্যান্য ভাষায় ওটাকেই সমাধি বলছেন। উপনিষদে বা গীতাতে ওনারা অন্য ভাবে সমাধির কথা বলছেন। ভক্তিতেও সমাধির কথা বলেন, কিন্তু ওদের সমাধির বর্ণনাগুলি অন্য রকম, অন্য রকম হওয়ার জন্য পরিষ্কার বোঝা যায় না। একমাত্র রাজযোগই সমাধিকে systematically আমাদের সামনে রেখে দিয়েছেন। রাজযোগ হল study of mind, মনের সব কার্যকে রাজযোগ systematically study করেছেন।

আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে, আমরা যেটাকে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বলছি, এই ক্রিয়াকলাপ মন নয়। মন পুরো আলাদা জিনিস। মন একটা যন্ত্র মাত্র, হাত যেমন একটা যন্ত্র, তেমনি মনও একটা যন্ত্র। মন সব সময় একটা মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে চলে, মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে চলে বলেই যে ওটা ফিক্সড্, তা না। মন বড় হয়, ছোট হয়। আপনার ক্রিয়াকলাপ যেমন হবে, আপনার চিন্তা-ভাবনা, মনন যেমন হবে, সেই অনুসারে মন বড় হয় ছোট হয়, মস্তিষ্ক ওটাই থাকে। বর্তমান কালে বিদেশীরা এগুলোকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছে, এখনও করে যাচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু পায়নি, পাবেও না। কারণ ওরা এই জিনিসটাকে বোঝেই না, ওদের এ্যাপ্রোচটাই পুরো ভুল, সেইজন্য কোন দিন তারা মনকে বুঝতে পারবে না, বোঝা সম্ভবও না। যারা যোগ আদি নিয়ে একটু পড়াশোনা করছে, তারা গিয়ে একটু বুঝতে পারে।

এই যে মন, যে মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে ঘুরঘুর করে, যোগ বলছেন, বিভিন্ন ভাবে এই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরী হয়। প্রথম চাঞ্চল্য আসে, ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যে জ্ঞান আসছে, সেখান থেকে মনে একটা চাঞ্চল্য আসছে। এই ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে যে জ্ঞান আসছে, তার মধ্যে পড়াশোনাটাও আছে, চিন্তা-ভাবনাও ওর মধ্যেই পড়ে। যেখানে মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করছে, সেটা হল প্রথম যে মনকে ধাক্কা মারতে থাকে। স্বামীজী খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন, একটা জলাশয়, তার জলটা শান্ত স্থির, আপনি সেই জলে একটা পাথর ছুঁড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত জলে তরঙ্গ হতে শুরু হয়ে গেল।

এরপর আসে, মিথ্যা কল্পনা, যে জিনিসটার কোন বাস্তবিকতা নেই, সেটাকে নিয়ে ভাবছি। আবার বাস্তব কল্পনাও হয়, কবিরা যেমন কল্পনা করেন। মনের চাঞ্চল্যের আরেকটা উৎস হল স্মৃতি, স্মৃতি একটা সাংঘাতিক জিনিস। এই জন্মে যা কিছু করা হয়েছে, আগের আগের জন্মে যা কিছু করেছেন, তার সবটাই স্মৃতি রূপে ভিতরে জমা থাকে। মাঝে মাঝে ওই স্মৃতিগুলি চাড়া মারতে থাকে। আর শেষে আসে স্বপ্ন, স্বপ্ন একটা আলাদা বিষয়, যার ইন্দ্রিয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, স্মৃতির সাথে

সম্পর্ক নেই, মিথ্যা কল্পনার সাথেও সম্পর্ক নেই। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, মোটামুটি এই পাঁচটা শক্তি মনকে সব সময় ধাক্কা মারতে থাকে, যার জন্য মন সব সময় চঞ্চল থাকে। রাজযোগ বলছেন, মনের এই যে চাঞ্চল্য, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই যোগ। মনের চাঞ্চল্য যেমন যেমন নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তেমন তেমন মনের তত শক্তি বাড়বে, তেমন তেমন মনের একাগ্র হওয়ার ক্ষমতা বাড়ে, তেমন তেমন জ্ঞানের জগৎ খুলতে থাকে। একজন সফল মানুষ, আরেকজন অসফল মানুষ; একজন সত্যিকারের পণ্ডিত, আরেকটা বাচ্চা ছেলে; একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক, আরেকজন চ্যাংড়া, এদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? শুধু মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এদের আলাদা করে দেয়। যার মনের উপর যেমন নিয়ন্ত্রণ সে তত বেশী উপরে উঠে গেছে। আর এই মনের নিয়ন্ত্রণ যে শুধু ইমোশানসকে নিয়ে, তা না; শুধু মনের একাগ্রতাকে নিয়ে, তা না; এই যে পাঁচটা শক্তির কথা বলা হল এর সবটাকে নিয়ে। তার স্বপ্নের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, তার অতীত স্মৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, এর কোনটাই তার মনকে নাড়াতে পারে না।

মন যখন একটা অবস্থায় স্থির হতে শুরু করে, এতটাই মন স্থির হয়ে গেল, যখন মনে একটা কি দুটো মাত্র চিন্তা ঘুরঘুর করতে থাকে, সেটাকে সমাধি বলা হয়, অর্থাৎ একটা বস্তুকে আলম্বন করে মন যখন স্থির হয়ে যায়। ইয়ং ছেলেমেয়েরা যখন কোন উত্তেজনাপূর্ন ক্রিকেট ম্যাচ দেখে বা কোন absorbing সিনেমা দেখছে বা অল্প বয়সে আমরা যখন ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলো পড়তাম যেখানে মন পুরো ঢুকে যেত, এগুলোও এক ধরণের মনের শান্ত অবস্থা, কিন্তু এগুলোকে কখনই সমাধি বলা যাবে না। সমাধি এইজন্য বলা যাবে না, কারণ ওর মধ্যে সব সময় একটা মুভমেন্ট রয়েছে, যেখানে মনটাও ওই মুভমেন্টের সাথে একাত্ম হয়ে আছে, সেইজন্য মনের এই শান্ত অবস্থা মনকে শান্তি দিতে পারবে না। যেমন একটা সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই সাইকেলটা যখন চলছে, তখনও তার একটা stability আছে – যার নামই হল – dynamic equilibrium and static equlibrium। সমাধির কথা যখন বলা হয়, ওনারা তখন static equilibriumএর কথা বলেন। সাইকেলকে যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, সাইকেল পড়ে যাবে। সাইকেলকে দাঁড় করানো যায় না, যখনই সাইকেল চলবে তখনই ওর equilibrium থাকবে। আমাদের মন ঠিক এই সাইকেলের মত, যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ মনের ব্যালেন্স থাকে, যেমনি দাঁড় করাতে যাবেন ধপাস করে পড়ে যাবে, সব কিছু এলেমেলো করে দেয়। এই যে মন কোন একটা চিন্তনকে অবলম্বন করে শান্ত হয়ে যাচ্ছে, মনের এই শান্ত হয়ে যাওয়াকে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পাই। সাধারণ ভাবে আমরা এটাকে তিনটে শ্রেনীতে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথমটা হল, মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় চলে যায়, তখন মন কোন কাজ করে না। মানুষ যখন বেহুঁশ হয়ে যায়, তখনও তার মন কাজ করে না। আর মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা করে একটা চিন্তাকে আলম্বন করে মনটাকে স্থির করে দিল। এই তিনটে অবস্থাকে বাইরে থেকে দেখতে একই রকম মনে হবে। মানুষ যখন গভীর নিদ্রায়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আছে; মানুষ যখন বেহুঁশ হয়ে আছে আর মানুষ যখন সমাধিতে আছে। আর তিনটে থেকে মানুষ যখন ফেরত চলে আসে, তার প্রসেস একই রকম। যিনি সমাধিতে ছিলেন, তিনি বলবেন কিছু মনে নেই, যিনি সুষুপ্তিতে ছিলেন, তিনিও বলবেন কিছু মনে নেই। যিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও বলবেন, আমার ব্ল্যাক-আউট হয়ে গিয়েছিল, আমার কিছু মনে নেই। তিনটে ক্ষেত্রেই কোথাও মন কাজ করা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু একটা ছোট্ট দরজা যেন খুলে রাখে। যেমন স্বপ্নাবস্থায়, এখানে মনে রাখতে হবে স্বপ্নাবস্থাটা সুষুপ্তি না, সুষুপ্তিতে স্বপ্ন দেখাটাও বন্ধ হয়ে যায়; স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ থাকে; কিন্তু ছোট্ট একটা দরজা খোলা থাকে।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, বিশেষ করে বাচ্চারা যখন ঘুমোত যায়, মাঝে মাঝে পা ছুড়বে, আমাদেরও অনেকেরই হয়, ঘুম আসার আগে চটকা দেওয়ার মত একটা ঝাঁকুনি লাগে। এটা হল,

মস্তিষ্ক এখন কাজ করা বন্ধ করতে যাচ্ছে, বন্ধ করে এখন হয়ত স্বপ্নে ঢুকছে, যেমন আমি স্বপ্ন দেখছি সাইকেল চালাচ্ছি, সাইকেল চালানোটা শুরু করছি না, কিন্তু ওই যে শরীরের একটা ছোট্ট অংশ খুলে থাকে, সেটা আমাকে দিয়ে আমার পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিল, কিংবা শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগবে। এইজন্য ছোট্ট একটু অংশ খোলা থাকে, হঠাৎ যদি এমারজেন্সি কিছু হয় যায়, সেটা থেকে বাঁচানোর জন্য। কারণ মস্তিষ্কের কাজই হল এই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু যে সুষুপ্তি অবস্থায় চলে গেছে, তার যদি আগুন লেগে যায় সে পুড়ে মরে যাবে, কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় মস্তিষ্ক তার সব কিছুকে বন্ধ করে দেয়।

সমাধি অনেকটা এই রকম। একটা চিন্তন করে কেউ যখন সমাধিতে যাচ্ছেন, ওই যে একটা চিন্তনকে আলম্বন করেছেন, কিন্তু তাঁর চিত্তবৃত্তিগুলি, মনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলি রয়েছে, ওই চিত্তবৃত্তিকে থামিয়ে দিচ্ছেন। চিত্তবৃত্তিকে থামিয়ে দিলেও, খুব ছোট্ট একটা ছিদ্র খোলা থাকে, যেখান দিয়ে তাকে ফেরৎ আসতে হবে। নির্বিকল্প সমাধিতে সেই ছিদ্রটাও বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, কোথায় পেয়েছিলেন আমাদের জানা নেই, কোন যোগীর কাছে হয়ত শুনে থাকবেন, একুশ দিন নির্বিকল্প সমাধিতে থাকলে শরীর চলে যায়। এই কথাগুলো পরে পরে কথামৃতে আসবে, কিন্তু এর সাইকোলজিটা এখনই আমরা ব্যাখ্যা করে নিচ্ছি।

একুশ দিন নির্বিকল্প সমাধিতে থাকলে শরীর চলে যায়, কারণ ওই সিগনালটা পাচ্ছেন না। খেতে পারছেন না, মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস আছে কি নেই বোঝার উপায় নেই, শারীরিক ক্রিয়াকার্যগুলি সব বন্ধ হয়ে যায়। এর উপমা দিতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, নুনের পুতুল যখন সমুদ্র মাপতে গেল, সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেল, তার খপর দেওয়া হল না। নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যখন তিনি গলে যাচ্ছেন তখন কে যেন এসে ধপ্ করে ধরতেই তিনি পাথর হয়ে গেলেন। যার জন্য তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা দিচ্ছেন। যে সাধকদের সমাধি হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি যে, তিনি ওই সমাধির সেই অবস্থায় আছেন, এটা কিছুটা যেন স্বপ্নের মত। স্বপ্নে যেমন হয়, কিছু জিনিসকে মনে করতে পারছি, কিছু জিনিস স্মৃতিতে নেই। নির্বিকল্প সমাধিকে কিছুটা সুষুপ্তির সাথে মেলানো যায়। সুষুপ্তিতে আপনি তাকে যাই করুন, ঘাড়ে করে তাকে এই ঘর থেকে তুলে ওই ঘরে রেখে দিন, সে বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় এটা করতে গেল তার মনে হবে, কিছু একটা যেন হচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে আছেন, কেউ দরজায় কড়া নাড়ছে, ওই কড়া নাড়ার আওয়াজটা স্বপ্নের সাথে স্বাভাবিক ভাবে মিশে গিয়ে স্বপ্নেরই একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় সে কোন টের পাবে না। এই যে নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, ঠাকুর সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলেন, এই অবস্থাকে ঠাকুর ভাবমুখ বলছেন। ভাবমুখ শব্দটা মা কালী নিজে ঠাকুরকে বলেছিলেন – তুই ভাবমুখে থাক।

লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী ভাবমুখকে নিয়ে বিরাট একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরে পরে আমাদের অন্যান্য অনেক মহারাজরাও খুব সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। খুব সংক্ষেপে ভাবমুখের অর্থ হল, যিনি ইচ্ছামাত্রই সমাধিতে যেতে পারেন। তিনি যত বড় যোগীই হন ইচ্ছামাত্র সমাধিতে যেতে পারেন না। যোগশাস্ত্র অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলেন – যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। বলা হয় যে বারো সেকেণ্ড যদি একটা বিষয়ে মনকে কেন্দ্রিত করে রাখা যায়, যোগের ভাষায় এটাকে সংযম বলে, সেটা হয়ে যাবে একটা ধারণা। বারো সেকেণ্ড মানে একটা সংযম হলে সেটা হবে ধারণা। এই রকম বারোটা সংযম হলে তখন ওটা ধ্যান হবে। আর তার বারোটা হলে সমাধি হবে। অর্থাৎ একটা চিন্তাকে নিয়ে অনেকক্ষণ থাকলে তবে গিয়ে ওটা সমাধি হবে। ভাবমুখে যিনি এসে গেছেন, তাঁকে এগুলো করতে হয় না, একটুতেই তাঁর মন ঈশ্বরের দিকে চলে যাবে। ঈশ্বরের দিকে কেন চলে যাবে? কারণ পতঞ্জলি বলছেন, *ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা*, ঈশ্বরের চিন্তন করে করে মানুষ মনকে একাগ্র করে নিতে পারে, সেখান থেকে সে সমাধিতে চলে যেতে পারে।

ঠাকুর তাঁর সাধনার সময় সব কিছুই শিখছেন, ধ্যান কিভাবে হয়, ওটা কিভাবে হয়, সেটা কিভাবে হয়, কিন্তু ঠাকুরের মূল সাধনা ঈশ্বরপ্রণিধান দিয়েই ছিল। পরে পরে কথামৃতে, লীলাপ্রসঙ্গে আমরা সমাধির অনেক বর্ণনা পাই, সাধারণ ভাবে বোঝা যায় যে, মোটামুটি এগুলো সব ছিল ভাবসমাধি। ভাবসমাধি বলতে বোঝায়, একটা ছোট্ট দরজা যেন খোলা আছে। একবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে আছেন, শ্রীশ্রীমাও আছেন, সেখানে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেছে, মা জানেন না সমাধি কি, তিনি ঠাকুরকে দেখে ঘাবড়ে গেছেন, তিনি আর শুতে পারছেন না। পরে ঠাকুর মায়ের অবস্থা জানার পর তিনি মাকে শিখিয়ে দিলেন, যদি আমাকে সমাধি অবস্থায় এই রকম দেখ, তখন আমার কানে এই রকম মন্ত্র বলবে। ভাগ্নে হৃদয়রাম এগুলো জানত, কখন কি করতে বা বলতে হয়। ভাবসমাধিতে অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলো মরা মানুষের মত হয়ে যাবে, কিন্তু একটা ছোট্ট ছিদ্র থাকে, যেটা দিয়ে তিনি ফিরে আসেন। সমাধিতে যাওয়ার আগে শেষ যেটা সমাধিবান পুরুষরা শোনেন, সেটা একটা ওম্ ধ্বণি। সমাধিতে যখন নামেন, তখনও তিনি যেটা প্রথম শোনেন সেটাও ওম্ ধ্বণি। বা ওই রকম কোন মন্ত্র, যে মন্ত্রের ভাবকে চিন্তন করতে করতে উনি সমাধিতে চলে গেছেন, ওই ভাবের উপর আধারিত কোন মন্ত্র যদি তাঁর কানে বলা হয়, ওই শব্দটা গিয়ে তাঁর ওই জায়াগায় পৌঁছে যায়, তখন তিনি ওটাকে অবলম্বন আবার ধীরে ধীরে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাজ্যে ফিরে আসেন। আমরা তো আর এসব অনুভব করিনি, এর থেকে আর বেশী কিছু আমরা বলতে পারব না, বই পড়ে, মহারাজদের কাছে শুনে যেটুকু আমরা বুঝেছি, ততটুকুই আমরা বলতে পারব।

ঠাকুর আবার বলছেন, তিনি আগে থেকেই মনে একটা ইচ্ছা রেখে দিতেন, জল খাব, কি সন্দেশ খাব। তাতে কি হয়, চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা পতঞ্জলি যেটা বলছেন, ওটা পুরোটাই চলে যাবে না। গভীর স্মৃতির স্তরে একটু ইচ্ছা যেটা থেকে গেছে, ওটা যেন একটা পাতলা দড়ির মত তাঁকে ধরে আছে, ওটাই আবার তাঁকে ফেরত নিয়ে চলে আসছে।

এখন কথামৃতে মাস্টারমশাই প্রথম ঠাকুরের সমাধি দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন। ঠাকুর কথাবার্তা বলছেন, গান করছেন, গান শুনছেন, হঠাৎ ঠাকুর নিস্পন্দ হয়ে সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। আবার ধীরে ধীরে সমাধি থেকে নেমে আসছেন। যারা এই জিনিসগুলো বোঝে না, তারা পরে পরে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলে। আসল ব্যাপার হল, মানুষ যখন সুষুপ্তিতে ঘুমের অবস্থায় যায়, তার মন total shut-down করে দিচ্ছে। যদিও নিওরো বিজ্ঞানীরা বলবেন, সুষুপ্তি অবস্থায় অল্প একটু function থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাথে কোন যোগ থাকে না। সমাধি অবস্থায় সামান্য হাল্কা একটু সংযোগ থাকে, সব সময় যে হাল্কাই থাকবে তা না, একটু বেশীও থাকতে পারে; যেমন একবার ঠাকুর সমাধিতে আছেন, ওই সময় কেউ কথা বলছিল। পরে ঠাকুর বলছেন, আরে ওই সময় কে ওই রকম কথা বলছিল। তার মানে, সমাধির ওই অবস্থাতেও হাল্কা একটু শুনতে পাচ্ছেন। মন কতটা একাগ্র হচ্ছে, সেটার উপর নির্ভর করে, সমাধিতে তার বাহ্যজ্ঞান কতটুকু চলে যাবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ শুরু হওয়ার আগে ঠাকুর মাস্টারমশাইর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইংরাজীতে ন্যায়শাস্ত্র আছে কিনা। ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে মাস্টারমশাই দু-চারটে কথা বললেন। সেখান থেকে বলছেন –

"সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন। মাস্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের বারান্দার মধ্যে অদ্ভূত ব্যাপার হইতেছে"।

মাস্টারমশাইয়ের ঠাকুরের সাথে এখনও সে-রকম পরিচয় হয়নি। প্রথমের দিকের সাক্ষাৎগুলির তারিখও তাঁর মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, এই জিনিসটা প্রথম দর্শনে হয়েছিল, এটা দ্বিতীয় দর্শনে হয়েছিল, এটা তৃতীয় দর্শনে হয়েছিল, কিছু কিছু মনে আছে, কিন্তু তারিখ মনে ছিল না।

মাস্টারমশাই ভিতরে গিয়ে দেখছেন – "ঠাকুর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই-চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন"। মাস্টারমশাইর এখনও ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি যায়নি, মনটা এখন তাঁর গানের উপর। তিনি আগে ঠাকুরের গান শুনেছিলেন। সেটাকে উল্লেখ করে বলছেন – "ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শোনেন নাই"।

শ্রীশ্রীমাও পরে বলতেন, গানের গলা শুনেছি এক ঠাকুরের আর নরেনের। রামলাল দাদা দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, রামলাল দাদার গানও খুব মিষ্ট ছিল। কণ্ঠের মাধুর্য, সেটা একটা আলাদা জিনিস। গান অনেকেই করেন, কিন্তু কন্ঠের এই মাধুর্য সবার থাকে না। মাস্টারমশাইও এটাই বলছেন, ঠাকুরের গান আর এখন নরেনের গান শুনে তাঁর মনে হচ্ছে, এই দুজনের এমন মধুর গান তিনি আগে কোথাও কখন শোনেননি।

নরেনের গান শুনতে শুনতে মাস্টারমশাইয়ের এবার দৃষ্টি পড়ছে ঠাকুরের দিকে, বলছেন – "ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ; চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কিনা বহিছে"। নাকের কাছে তুলো জাতীয় কিছু পাতলা জিনিস না ধরা পর্যন্ত বোঝা যাবে না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। "জিজ্ঞাস করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক হইয়া ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুশ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে এরূপ হয়"।

আমাদের জানা নেই মাস্টারমশাইয়ের তখনই এটা মনে হয়েছি কিনা, হয়ত মনে হয়েছিল, কারণ এখনও পর্যন্ত ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কোন সেই রকম সাংসারিক কথা কিছু বলছেন না, হাল্কা কথা কিছু বলছেন না, আর তিনি কিছু কিছু বই পড়েছিলেন, আর অষ্টম পরিচ্ছদের শুরুতে তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটা শ্লোকের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যে শ্লোকে বলা হচ্ছে, সমাধির অবস্থা কখন হয়, মনটা যখন অচল হয়ে যায়। গীতাতে মনের অচল হয়ে যাওয়া, নিস্পন্দ হয়ে যাওয়ার অনেকগুলো বর্ণনা আছে। মাস্টারমশাই মোটামুটি বুঝে গেছেন, ঠাকুর সব সময় ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তন করেন, ঈশ্বরকে নিয়েই আলোচনা করেন। যার জন্য পরে যখন অন্য কথা উঠবে, যেখানে ঠাকুর মজা করছেন, ফচকিমি করছেন, তখন মাস্টারমশাই আঁতকে উঠবেন, তাঁর অবাকে লাগছে কিছুক্ষণ আগে যে মানুষ সমাধিতে চলে গিয়েছিলেন, তিনি আবার কি করে সাধারণের ন্যায় মজা করছেন। যাই হোক তিনি এতটা বুঝতে পারছেন যে, ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে এনার মন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে। একটু আগে যেটা ব্যাখ্যা করা হল, সুতোর মত একটু যেন থাকে, মাস্টারমশাইর তখনও এই ব্যাপারটা অতটা জানা নেই। কিন্তু এতটা বুঝতে পারছেন যে, বাহ্যজগৎ তাঁর মন থেকে পুরোপুরি বিলোপ হয়ে গেছে। এরপর তিনি বলছেন – না জানি কতদূর বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে এরূপ হয়।

মন যখন ফাঁকা থাকে, মন তখন নিজের মত চলতে থাকে। সামনে যে জিনিসগুলি ঘটছে, সেগুলোকে নিয়ে মন ভাবতে থাকে। কিন্তু মন যদি ব্যস্ত থাকে, আর সেই সময় হঠাৎ যদি অবাক করা কোন দৃশ্য নজরে আসে, মন তখন ওটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে – এটা কি করে হল, এটা কেন হল ইত্যাদি। ট্রেনে করে যাচ্ছি, জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলি সরে যেতে থাকে, তার মধ্যে কিছু দৃশ্য, যেমন ধানক্ষেত দেখছি, মন তখন একটা চিন্তা-ভাবনা করে, বাঃ বেশ ভাল ফসল হয়েছে। বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যখনই কোন কিছু মনের কাছে আসে, মন তখন ওটাকে বিশ্লেষণ করতে থাকে, আগের আগের জ্ঞানের সাথে মেলাতে থাকে। মাস্টারমশাইর মনটাও বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন। তিনি ধারণা করতে পারছেন না যে, কতটা বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে মানুষ এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। যেটা প্রথম দিকেই বলা হল, *ঈশ্বরপ্রনিধানদ্বা*, ঈশ্বরে যখন পুরো মন ঢেলে দেওয়া হয়, মন যখন ঈশ্বরে পুরো ডুবে যায়, মন তখন বাহ্যজগতের কোন কিছুই আর নেয় না।

জড় বস্তুর চিন্তন করতে করতে অনেক সময় মানুষের বাহ্যিক চেতনাটা চলে যায়, টিভিতে খুব উত্তেজনাপূর্ণ কোন খেলা দেখছে বা গভীর মনোযোগ দিয়ে কোন বই পড়ছে, তখন মশা কামড়ালে টের পায় না। সবারই জীবনে এই ধরণের কিছু না কিছু ঘটনা আছে, যেটা মানুষের স্মৃতিতে থেকে যায়, আমার মন ওতে এমন ডুবে ছিল যে আমি কিছু টের পাইনি। ঈশ্বর চিন্তন তা নয়, ঈশ্বর চিন্তনে আপনি সচেতন ভাবে মনকে ঈশ্বরে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। জড় চিন্তনের সময় মন আপনা থেকেই ওই বস্তুতে চলে যায়। বাচ্চারা বড়দের নজর পাওয়ার জন্য কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু বড়রা, বিশেষ করে পুরুষ মানুষ সহজে চোখের জল ফেলতে চায় না। কিন্তু সে-রকম কোন গভীর দুঃখ-কষ্ট হলে চোখের জল নিজে থেকেই বেরোতে শুরু করে। জড় বস্তু মনকে যখন টানে, তখন এভাবেই টানে। কালিদাসের কাহিনীতে আছে, শকুন্তলা দুষ্মন্তের কথা ভেবে যাচ্ছেন, আর সেই সময় দুর্বাসা মুনি এসেছেন, শকুন্তলার কোন হুঁশ নেই, দুষ্মন্তের ভাবনা তাঁর মনটাকে টেনে নিয়েছে। ঠাকুর যখন ঈশ্বরের চিন্তন করছেন, মনকে তিনি সচেতন ভাবে টেনে নিয়ে এসেছেন, আমি ঈশ্বরের কথা ভাবছি, তারপর আস্তে আস্তে সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। তফাৎ হল, জড় বস্তুকে নিয়ে মানুষ যখন ডুবে যায়, সেখান থেকে যখন সে ফেরত আসে, তখন সে যা ছিল তাই থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে মানুষ যখন ডুবে যায়, ফেরত আসার সময় সে একজন জ্ঞানী হয়ে ফিরে আসে। দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার হয়, আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে গিয়ে সে একটা অতিন্দ্রিয় আনন্দে, যেটা এই জগতের না, সেই আনন্দে ভাসতে থাকে।

একটু আগে সুষুপ্তির কথা, বেহুঁশ অবস্থার কথা আর সমাধির কথা বলা হল। সুষুপ্তি থেকে মানুষ যখন ফিরে আসে, তখন সবাই বলে, আমি কি দারুণ একটা ঘুম দিলাম, আমার কিছু মনে নেই। ওর মস্তিষ্ক শুধু অতটুকু মনে রেখেছে, যখন সুতোর এ-দিকে মন চলে এলো, তখন তার একটা স্মৃতি শুধু থাকে – আমার কিছু মনে নেই। তার সাথে এটাও মনে থাকে যে, আমি আনন্দে ছিলাম। বেহঁশ অবস্থা থেকে হুঁশ আসার পর সে ঘাবড়ে যায়, আমার কিছু মনে নেই, আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ির লোকেরা তাকে তাড়াতাড়ি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। আর সমাধিতে যখন যায় তখনও ফিরে এসে বলে, কিছু মনে নেই, কিন্তু স্মৃতিতে থাকে এক অনাবিল আনন্দের আশ্বাস। কিন্তু সুষুপ্তি আর সমাধির তফাৎ হল, সমাধিতে একবার চলে যাওয়ার পর সে জ্ঞানী হয়ে ফিরে আসে। সুষুপ্তিতে যাওয়ার পর যখন ফিরে আসে তখন সে যেমন মুর্খ ছিল তেমন মুর্খ হয়েই ফিরে আসে।

ওখানে কি গান চলছিল? চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন। মাস্টারমশাই লক্ষ্য করছিলেন "গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন"। নরেনের গান আর এই রকম গানের বাণী যেখানে, ঠাকুরের তো শিহরণ হবেই। ঠাকুর এক জায়গায় বলবেন, যখন উনি সমাধিতে যাচ্ছেন, পাশে হয়ত কেউ কথা বলছে, ওনার তখন মনে হচ্ছে, কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, আর কথাগুলো যেন লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আপনারাও দেখবেন, ঘুমোতে যাচ্ছেন, একটা অর্দ্ধচেতন অবস্থা, ঘুমিয়েও আছেন আবার জেগেও আছেন, তখন যদি কোন কথা ভেসে আসে, বা কোন গান ভেসে আসে, তখন কথাগুলো যেন লম্বা টানতে শুরু করেছে। এটা হল লক্ষণ এবার ঘুমের মধ্যে ঢুকতে চলল। ঠাকুরও সেই রকম, তাঁর কর্ণে গানের কথা সুর সব যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যেভাবে গান শুনি, কিংবা ঠাকুরই পরে যেভাবে শুনবেন, সেভাবে শুনছেন না। বলছেন, ঠাকুর শিহরিতে লাগিলেন, ঠাকুরের মনে সব সময় ঈশ্বরীয় ভাব, সেখানে ওই ভাবের গান। গানের সুর আর ভাব যদি এক না থাকে, তাহলে গান আলুনি লাগবে, দুটোকে মিলতে হবে। এক জায়গায় ঠাকুর সমাধি থেকে নেমে এসে বলবেন, নরেনের গান আজ আলুনি লাগছিল। সুর ও ভাব দুটোকে মিলতে হবে।

"চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 'কোটি শশী-বিনিন্দিত' কী অনুপম রূপদর্শন করিতেছেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন?

কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে”।

মাস্টারমশাইয়ের মনে এখনও এই ধারণা আসেনি যে ঠাকুর অবতার। তাঁর কাছে ঠাকুর এখনও একজন বড় মহাত্মা, যিনি অনেক সাধনা করেছেন, মনকে ঈশ্বরে অনেক ডুবিয়ে রাখেন বলে তিনি ওই অবস্থায় গেছেন। ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন, এটা একটা খুব important term। চোখ বন্ধ করে ঠাকুরের চিন্তা করছেন, ধ্যান করছেন, তখনও ঠাকুরের চিন্তা করছেন। কি রূপে চিন্তা করছেন? গুরু যে রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। গুরু কি রূপ দেখিয়েছেন? গুরু ঠাকুরের একটা ছবি দেখিয়ে বলে দিলেন, ইনিই তোমার ইষ্ট। গুরু কখন বলে দেননি যে, এই ছবিটা তোমার ইষ্ট। কিন্তু সবাই যখন ধ্যান করেন, ছবির উপরই ধ্যান করেন। গুরু ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলে দিয়েছেন, ঠাকুর তোমার ইষ্ট, এর উপর ধ্যান করবে, আর সব সময় বেশীর ভাগ ভক্তরা ধ্যান করছে ঠাকুরের ছবির উপর। যে ভাগ্যবান ভক্তদের বেলুড় মঠে আসার সুযোগ হয়েছে, তারা বেলুড় মঠের মন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহ দেখেছেন, তাঁরা এবার ঠাকুরের বিগ্রহের উপর ধ্যান করবেন। এবার আপনার ধ্যান কাগজ থেকে পাথরে নেমে এলো। এখন কোনটা বেশী নিকৃষ্ট, কাগজ বেশী নিকৃষ্ট, না পাথর বেশী নিকৃষ্ট সেটা আপনাকে ভাবতে হবে। আপনার ধ্যান এখন ঘুরঘুর করছে কাগজ আর পাথরের মধ্যে। আর তারপর এসে বলছেন, মহারাজ এত জপ করছি, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না। হবে কোত্থেকে, গুরু বলেছেন ঠাকুরের ধ্যান করতে, আর আপনি ধ্যান করছেন, ঠাকুরের কাগজের ছবির উপরে, নয়তো পাথরের বিগ্রহের উপরে। সাধনা মানেই, কাগজ আর পাথর থেকে সরে চিন্ময় রূপের ধ্যান করাতে। যেমন আমি আপনাকে দেখছি, আপনাকে সামনা-সামনি দেখা এক রকম, আপনার ছবিতে আপনাকে আরেক রকম দেখব। আপনাকে চিন্তা করলে এক রকম দেখব, স্বপ্নে আপনাকে দেখলে আরেক রকম দেখব। আপনাকে আমি যেমনটি দেখছি, ধ্যানে ঠাকুরকে সেভাবেই দেখার চেষ্টা করতে হয়। ওই চেষ্টা আর জপ করতে করতে একটা সময় নিজে থেকেই ঠাকুরের চিন্ময়-রূপ ভেসে আসবে। এখানে মাস্টারমশাই বলছেন, ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন, আমার মনে হয় তখন মাস্টারমশাই এত কথা বুঝতেন কিনা। তবে অনেক পরে তিনি যখন কথামৃত লিখতে শুরু করেছেন, তখন অবশ্যই তিনি বুঝতেন, নাহলে এই রকম অভিব্যক্তি আসবেই না।

যে জিনিসটাকে আমরা জানি না, সেই জিনিসটাকে যদি লিখতে যাই, ওর বর্ণনা গুলো ভুলভাল হয়ে যাবে। মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনাতে কোথাও ভুল নেই। তার মানে ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তিনি এই জিনিসগুলো বুঝে গিয়েছিলেন যে, ছবি আর চিন্ময়-রূপ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। ধ্যান করা বা সাধন-ভজন করার উদ্দেশ্যই হল, ছবি বা বিগ্রহ যেটা দেখা আছে, সেখান থেকে সরে এসে যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে এই মানুষ রূপে, ত্রিমাত্রিক রূপে ধ্যান করা। এরপর সাধনা করে করে ঠাকুরের চিন্ময়-রূপ বা জ্যোতির্ময়-রূপ দেখা যায়। আর তা নাহলে সারা জীবন আপনি ধ্যান করে যাবেন, জপ করে যাবেন, কিছুই হবে না। কারণ আপনি যেটার ধ্যান করবেন সেটাই পাবেন। ঠাকুরের ছবির যদি ধ্যান করেন, ঠাকুর চিরদিন আপনার কাছে ছবি রূপেই থাকবে, ঠাকুর ঠাকুর রূপে কোন দিনই আপনার কাছে আসবেন না।

“আবার গান চলিতেছে – হৃদি কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ”। মাস্টারমশাই বলছেন, “আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য। শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ। স্তিমিত লোচন”। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ঠাকুর যেন দু-দুবার সমাধি চলে গেলেন, চোখটা হাল্কা করে একটু খোলা। আর বলছেন, “কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপদর্শন করিতেছেন”। চোখটা একটু খোলা, চোখ নীচের দিকে নেই, লোকের দিকে নেই, উপরের দিকে কিছু একটা যেন দেখছেন। এটা কিন্তু মাস্টারমশাইর মনে হচ্ছে। হয়ত ঠাকুর কিছু দেখছিলেন, এখন তিনি স্থূল চোখ দিয়ে দেখছিলেন, নাকি মনের চোখ দিয়ে দেখছিলেন, জানার কথা না। উনি ওটা বর্ণনা করছেন।

মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনা এত নিখুঁত যে, এক চুল ছেড়ে দিচ্ছেন না, ওখানে আমি আপনি যে নিজের মত একটা কিছু কল্পনা করে নেব, সেই জায়গাটা তিনি কিছুতেই ছাড়ছেন না। ফলে আমরা যে বর্ণনা পাচ্ছি, একেবারে নিখুঁত। বলছেন, তাঁর সেই "অপরূপ রূপদর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন"। ওই আনন্দ যেটা ঠাকুরের মনে আসছে, মাস্টারমশাই মনে করছেন, ওই অপরূপ রূপদর্শন করেই ঠাকুর আনন্দে ভাসছেন। ঠাকুর বারবার বলছেন, একবার যদি কেউ ঈশ্বরের রূপদর্শন করে, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমাকে চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। আবার কোথাও বলছেন, মিছরির সরবৎ যে খেয়েছে তার আর চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগবে না। পরে এক জায়গায় বলবেন, ছবিতে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনটি দেখা যায়।

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন –

চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।

"সমাধি ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল – প্রেমানন্দরসে হও রে চিরমগন"।

এখানে এটা লক্ষ্য করার, ঠাকুরের যে সমাধির ভাব মাস্টারমশাই যেটা এতক্ষণ দেখলেন, সেটাকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন, আর মাঝে মাঝে সেই গানের সুরটা তাঁর মনে ভেসে উঠছে। আজকের এই দৃশ্য মাস্টারমশাইয়ের কাছে একেবারে নূতন দৃশ্য, তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, সবই হয়েছে, কিন্তু সেটাই যে সব সময় মাথায় ঘুরছে তা না। কিন্তু এই যে আনন্দ-দৃশ্য এই দৃশ্য মাস্টারমশাইকে কোথাও একটা ছুঁয়েছে, যার জন্য গানগুলো ভেসে উঠছে। এই হল কথামৃতে প্রথম মাস্টারমশাইয়ের ঠাকুরের সমাধির বর্ণনা। এরপর পর পর সমাধির কথা আসতে থাকবে, কোথাও সমাধির বর্ণনা তিনি বিস্তারে করবেন, কোথাও একটু সংক্ষেপে করে বেরিয়ে যাবেন। এর মধ্যে একটা মূল ব্যাপার হল, যে গান হচ্ছে সেই গানের কথা ও সুর ঠাকুরকে টেনে সমাধিতে নিয়ে যাচ্ছে, আবার ওই গানই কখনও তাঁকে সমাধি থেকে নামিয়ে আনছে। পতঞ্জলি যোগসূত্রানুযায়ী যদি দেখা যায়, চৈতন্যের চিন্তন করে করে, সেই চৈতন্যে মন এমন ডুবে যাচ্ছে যে, আগে যে পাঁচ রকমের বৃত্তির কথা বলা হল, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি ঠাকুরকে ছুঁতে পারছে না, ঠাকুর এর ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেছেন। এখানে এসে অষ্টম পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপর নবম পরিচ্ছেদে মাস্টারমশাইয়ের চতুর্থ দর্শন হবে।

নবম পরিচ্ছেদ
চতুর্থ দর্শন

মাস্টারমশাই প্রায়ই কোন পরিচ্ছেদ শুরু করার আগে বেশীর ভাগ সময় গীতা থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে একটা শ্লোক রেখে দিতেন। তাতে মনে হতে পারে যে, এই পরিচ্ছদে এই শ্লোকের ভাব। কিন্তু সেটা যে সব সময় মিলছে, তা না। তৃতীয় দর্শনের পরের দিনই মাস্টারমশাইয়ের চতুর্থ দর্শন হচ্ছে। এটা মাত্র চতুর্থ দর্শন, এর আগে তিন দিন এসেছেন। যাই হোক তৃতীয় দর্শনের পরের দিনও ছুটি ছিল, মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। এবার কিন্তু মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথাতে আকর্ষিত হচ্ছেন।

বিকাল তিনটে নাগাদ মাস্টারমশাই আবার হাঁটতে হাঁটতে ঠাকুরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে এসেছেন। দেখছেন ঘরে মাদুর পাতা আছে, মাদুরের উপর নরেন, ভবনাথ এবং আরও কয়েকজন বসে আছেন। মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনা করছেন, "কয়টিই ছোকরা, উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্য বদন, ছোট তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন"।

"মাস্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ওই রে আবার এসেছে' – বলিয়াই উচ্চহাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। - আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন – ইংরাজী পড়া লোকেরা যেমন করে"।

একবার আমাকে একটা জায়গায় হিন্দু ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল। সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল, হিন্দুস্থান বা হিন্দু কতদূর? আমি বললাম যত দূর পা ছুঁয়ে প্রণাম করার অভ্যাস আছে, তত দূর হিন্দু ধর্ম আছে। কারণ পা ছুঁয়ে প্রণাম একমাত্র হিন্দুরাই করে, আর কেউ করে না। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা, সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করা, হাঁটু গেড়ে প্রণাম করা, পা ছুঁয়ে প্রণাম করা হিন্দুদের মধ্যেই হয়, আর হাতজোড় করে প্রণাম করা এটাও একমাত্র হিন্দুদেরই। অনেক সময় দেখা যায়, বিশেষ করে সিনেমাতে কেউ খুন করতে যাচ্ছে, সে বেচারা হাতজোড় করছে। কিন্তু ভয়ে বা নিজের প্রাণ বাঁচাতে কারুর পায়ে পড়া এটা আমাদের কাস্টম না, আমাদের মধ্যে প্রণাম করাটা ritualএর মধ্যে পড়ে। হাতজোড় করে প্রণাম করার মধ্যে একটা বিনয়ের ভাব থাকে। স্কুল কলেজে পড়ার সময় যখন কোন ভক্তিগীতি বা দেশাত্মবোধক গান হত, হাতজোড় করে আমরাও গান গাইতাম। কিন্তু পা ছুঁয়ে প্রণাম করা, কি ভূমিষ্ঠ হয়ে, কিংবা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার জন্য ভক্তি লাগে। আর কাউকে যদি সম্মান দিতে হয়, তখন হিন্দুদের তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হয়। মনু প্রণামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন, প্রাণবায়ু যেটা বেশী বেশী লাফিয়ে চলে, নীচু হয়ে প্রণাম করলে ওই প্রাণবায়ুটা নেমে যায়। আসলে প্রণাম মানুষকে বিনয় হতে শেখায়। আর বিনয় না হলে কেউ বড় হতে পারে না।

হাতজোড় করে প্রণাম করাতে কোন দামই নেই। ভিড় ঠেলে ঠাকুরের সামনে যেতে পারছি না, বা কারুর কাছে এগিয়ে আসতে পারছি না, সেখান পর্যন্ত হাতজোড় করে প্রণাম ঠিক আছে। কিন্তু সামনা-সামনি হাতজোড় করে প্রণাম করছি, এটা ভাল দেখায় না। কোন গুরুজন, যাঁর সাথে আপনার অনেকদিনের পরিচিতি, তাঁকে যদি অবজ্ঞার ভাব দেখাতে চান, তাহলে পা ছুঁয়ে প্রণামের বদলে হাতজোড় করে প্রণাম করে দিলেন, তাতেই তিনি বুঝে যাবেন আপনি কি ইঙ্গিত করছেন। পা স্পর্শ করে প্রণাম করা মানে, আমার যে আমিত্ব, আমার যে অস্তিত্ব, এটা আপনার চরণের যে রজ, তার সমান। আপনি বলবেন, আমি ও-রকম মনে করি না, আমি তো মনে করি না উনি আমার প্রণামের যোগ্য। আপনার এই মনোভাবে ওনার ভাল মন্দ কি হবে জানা নেই, কিন্তু আপনার ভাল-মন্দ এর সাথে

জড়িয়ে আছে। ভাল-মন্দ কিভাবে জড়িয়ে আছে? আপনি যদি পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন, তখন আপনার অহঙ্কারটা একটু দমার সুযোগ পেল। আপনার অহঙ্কারটা দমে গেল মানে, আপনি বড় হয়ে গেলেন।

অহঙ্কার যাতে দমে, সেইজন্য মনু পরিষ্কার করে ঠিক করে দিচ্ছেন, কাকে কাকে প্রণাম করতে হবে। পরিচিতদের মধ্যে যে আপনার থেকে একটু বড়, তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হবে। তারপর গুরু আছেন, মা-বাবা আছেন, এই রকম মনু একটা লম্বা তালিকা তৈরী করে দিয়েছেন, কাকে কাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা হবে। পা ছুঁয়ে প্রণাম করা মানে, আমার পুরো অস্তিত্বকে ছোট করে আপনার পায়ে রেখে দিলাম। এটা করলে মানুষের শক্তি সাংঘাতিক বেড়ে যায়। আমরা মনে করি, ওকে প্রণাম না করে আমি একটা আচ্ছা শিক্ষা দিলাম। শালা একটা ভণ্ড সাধু, ওকে আমার প্রণাম করতে হবে? সে তো না হয় ভণ্ড সাধু, ওর যা হবার হবে, কিন্তু তার সাথে তুমিও অধঃপাতে গেলে। মাস্টারমশাই ইংরাজী পড়া লোকের কথা বলছেন। ইংরাজী পড়া লোকেরা মনে করে তারা বিরাট কিছু, আমি আবার তাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করব! এখন নূতন একটা শব্দ শুনছি – difference between India and Bharat – India হচ্ছে ইংরাজী পড়ে মা-বাবাকে নাম ধরে ডাকছে আর Bharat মানে যেখানে এখনও মা বাবাকে শ্রদ্ধার সাথে মা বলে বাবা বলে ডাকছে।

মাস্টারমশাই বলছেন, ইংরাজী পড়া লোকেরা যেমন করে। তখনকার দিনে ঠাকুরের মত মানুষকে হাতজোড় করে প্রণাম করছেন, এটাই হল ইংরাজী কালচার। মাস্টারমশাইও ইংরাজী পড়া লোকের মত আগে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতেন, এখন দেখে দেখে তিনি পাল্টে গেছেন, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখেছেন। প্রণাম করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তারপর মাস্টারকে দেখে ঠাকুর কেন হেসেছিলেন সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুর ময়ূরের গল্প বলছেন, একটা ময়ূরকে চারটের সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল, পরের দিন ঠিক চারটের সময় ময়ূরটা উপস্থিত হয়ে গেছে। এটাকে বলে condition reflects, যেটা পরে রাশিয়ান বিজ্ঞানী ট্যাবলো কুকুরের উপর একটা পরীক্ষা করেছিলেন। ঘন্টা বাজালেই তিনি কুকুরকে খাবার দিতেন, কুকুর খাবার খেত, তার মুখ থেকে স্যালাইবা বেরোত। পরে উনি দেখালেন, যেমনি আবার ঘন্টা বাজাচ্ছেন, খাবার নেই, কিন্তু কুকুরের মুখ থেকে স্যালাইবা বেরোতে শুরু হয়ে যেত, এটাকে বলে conditions reflects। চারটে বাজল, মৌতাত ধরেছে, সে পোঁছে গেল, আমার এখন আফিম লাগবে।

যাদের ঘুমের সমস্যা আছে তারা যদি একটা রিচ্যুয়াল করে নেন, এবার আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, মানে এবার প্রথম এটা করলাম, দ্বিতীয় এটা হল। এর আগেও বলেছিলাম, ঘুমের যদি সমস্যা হয়, কথামৃত খুলুন, খুব জোর দু-তিন পাতা পড়ুন, তার বেশী না, টানা পড়তে থাকব, এটা করলে আবার গোলমাল লেগে যাবে, রিচ্যুয়ালের মত দুটো পাতা মাত্র পড়ুন। দেড় পাতা যেতে যেতে মন জেনে গেল, এবার আমার ঘুমিয়ে পড়ার সময় আসছে। দু-পাতা পড়া হল, এবার লাইট বন্ধ হল। জপের জন্য বুকের কাছে হাত নিয়ে এলাম। মন বলল, এই রে শুরু হল, আর না। দেখবেন একশ আট পর্যন্ত পোঁছাতে পারবেন না, তার আগেই মনের সুইচ অফ হয়ে যাবে। কদিন এভাবে অভ্যাস করলে ঘুমের সমস্যা উড়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, আফিমের মৌতাত ধরেছিল, ময়ূর ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে, ঠাকুর এগুলো মজা করে বলছেন। এরপর মাস্টার মনে মনে কি ভাবছেন সেটা বর্ণনা করছেন।

"মাস্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, 'ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে – কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে। মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার জো নাই, এখানে আসতেই হবে'। এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনষ্টি করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে"।

এটাকে বলে comfort level। ইংরাজীতে খুব নামকরা কথা আছে, Man is known by the company he keeps, company মানেই হয় comfort level। Comfort level দুই প্রকার, আপনি কার সাথে থাকছেন সেটাও comfort level show করে, আর কার সঙ্গে আপনি থাকতে চাইছেন, সেটাতেও comfort level show করে। যেমন অনেক সময় দেখা যায় নিরুপায় হয়ে আপনাকে কারুর সঙ্গ করতে হচ্ছে, আপনি তার সঙ্গ চাইছেন না, কিন্তু উপায় নেই, থাকতে হবে তার সঙ্গে, কথা বলতে হবে তার সঙ্গে। ওখানে আপনার ব্যক্তিত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না। আপনার ঠিক ঠিক কার কাছে গেলে ভাল লাগে, কার সঙ্গে বসলে আপনার মনে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এর সাথে আড্ডা মেরে চলে যেতে পারি, বুঝতে হবে আপনি সেটা। আপনি একটু বিচার করে দেখবেন, যদি দেখেন নাতির সাথে থাকতে আপনার খুব ভাল লাগছে, বুঝবেন আপনার বুদ্ধি নাতির মত। আচার্য বলছেন, *তরুণস্তাবক তরণীরতঃ*, তরুণ অবস্থায় তরুণী ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভাল লাগছে না, বুঝবেন কাম ছাড়া আপনার মনে আর কিছু নেই। *বৃদ্ধস্তাবক চিন্তামগ্নঃ*, একা একা থেকে সব সময় ভেবে চলেছে, কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুরের মত ভুরর ভুরর করে তামাক টানছে আর ভাবছে জীবনে কি হল আর কি হল না।

মাস্টারমশাইএর জীবন তখন অনেকটা এই ধরণের জীবনের মতই ছিল, কিছুই নেই জীবনে। ঠাকুরের সাথে পরিচিত হল, তিন দিন ঠাকুরের কাছে গেছেন, ঠাকুরের কথাগুলো শোনার পর ওনার মনকে এবার ঠাকুর টেনে নিয়েছেন। ওনার যে comfort level, ছ-দিন ওনাকে স্কুলে কাজ করতে হবে, ছুটির দিন হলেই দৌড়ে আসবেন, ওই যে অতটুকু comfort level পাবেন, ওইটুকু হল সামনের ছ-দিনের রিচার্জ। চব্বিশ ঘন্টা মাস্টারমশাই ঠাকুরকে পাবেন, সম্ভব না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য পাবেন, ধীরে ধীরে ওটাই জীবনকেন্দ্র হয়ে যায়।

কেন বেঁচে আছি? নিকষা যেমন রামচন্দ্রকে বললেন, হে রাম! বেঁচে আছি বলে কত দেখলাম, আরও কত দেখব। ময়ূরের মৌতাতের গল্প ঠাকুর মজা করে বলছেন। কিন্তু কি হয়, জীবনের বেলাগুলিকে যদি দিনের বেলার মত তিনটে ভাগে ভাগ করে নেন, বারটা অবধি, বারটা থেকে ছটা অবধি, আবার ছটা থেকে বারটা অবধি, কিছু কিছু জিনিস একটা করে জীবনে যেন অবশ্যই থাকে, যেটা আপনাকে টানবে। মাতালগুলো যেমন একটু মদ খেয়ে নিলে চার্জড হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম দিনে তিনবার, না হলে অন্তত দিনে দুবার, আর কিছু না দিনে একটা কিছু আপনাকে রাখতেই হবে, যেটাতে গেলে আপনি পুরো চার্জড হয়ে যাচ্ছেন। শুধু ওটাই না, উল্টো দিক থেকে সারাটা দিন আপনার মন ওখানে পড়ে আছে। ঠাকুর বারবার এই জিনিসটাকে আনছেন, বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত, সব কাজ করছে কিন্তু মনটা পড়ে আছে তার দেশে সন্তানের উপর। কচ্ছপের মন পড়ে আছে আড়ায়, সেখানে তার ডিম আছে। ঠাকুর সেখানে ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন, অবশ্যই জীবনের সেটা একটা আদর্শ, যেটা থাকতেই হবে। তবে জীবনে যদি একটু শান্তি চান, জীবনটাকে যদি একটু মসৃন ভাবে চালাতে চান, তাহলে দিনে কম করে দু-বার, পারলে তিন-বার – I am waiting for this। বিশেষ করে যখন বিছানায় যাব, এই জিনিসটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, কোন একটা বই, কি কোন একটা বিশেষ কাজ। সেইজন্য ওগুলোকে ভাগ করে দিতে হয়।

ইদানিং কালে সবারই হাতে হাতে স্মার্ট ফোন ঘুরছে, আর ফোনের মধ্যে ফেসবুক, হোয়টসাপ, ইউটিউব সবটাই আছে, একবার ওটা দেখছি, একবার সেটা দেখছি। ওভাবে দেখতে নেই, সব কটা ভাগ করে দিতে হয় – সকালবেলা শুধু হোয়টসাপ দেখব, দুপুরে শুধু ফেসবুক দেখব আর সন্ধ্যেবেলা শুধু ইউটিউব দেখব। তখন দেখবেন তাতেই আপনার একটা এনার্জি এসে গেছে। একটা আর্টিফিসিয়াল এক্সাইটমেন্ট তৈরী করে দিচ্ছি। আর্টিফিসিয়াল বলা মানে, আমি চাইলেই সব সময় সবটাই পেয়ে যেতে

পারি, কিন্তু ব্রেক করা আছে। সব মানুষের একটা কিছু লাগে, যেটা থেকে সে চার্জড হবে। সেইজন্য জীবনে একটু এক্সাইটমেন্ট খুব দরকার পড়ে, যেটা তার জীবনটাকে ধরে রাখবে।

আপনার তো সুযোগ নেই, সেইজন্য ওটাকে ব্রেক করে দিতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠলেন, সেখান থেকে সারা দিনের জন্য একটা রুটিন করে নিন। সকালে উঠলেন, হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুরের কাছে বসলেন, জপধ্যান করলেন। সকালে কেন উঠলাম? ঠাকুরকে এভাবে দেখার জন্য। এরপর নিজের মত করে দিনটাকে ব্রেক করে সাজিয়ে নিতে হয়। মাস্টারমশাইএর আত্মহত্যার একটা প্রবণতা ছিল, সেখান থেকে তিনি এই অবস্থায় চলে এসেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি একটা জায়গা পেয়েছেন, যেখানে তিনি চার্জড আপ হচ্ছেন। আর ঠাকুরের ঘরে নরেন, ভবনাথ আদি অনেক ছোকরা ভক্তরা আছেন, দেখছেন সেখানে যেন আনন্দের হাট বসেছে। এই আনন্দটা কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আনন্দ নয়। পাঁচটা বাচ্চা যদি একসাথে কোথাও জুটে যায়, ওরা আনন্দে হুটোপাটি করতে থাকবে, বাচ্চারা কখনই নিরানন্দ থাকে না। এটাই বাচ্চাদের স্বাভাবিকত্ব, পাঁচজন বন্ধু এক জায়গায় জুটে গেলে ওরা মজা করে, ওটা আনন্দ না, মজা। আনন্দ তখনই হয়, যখন ঈশ্বর তাঁর আধার হন, এর বাইরে যে আনন্দ মনে করছি, ওটাকে সুখ বলা হয়। চলিত ভাষায় সবটাকেই আনন্দ বলে, কিন্তু যখন এই বস্তুকে আধার করে আনন্দ করা হয়, তখন এটা মজা হয়, ইন্দ্রিয়সুখ হয়। পরনিন্দা, পরচর্চা ওর মধ্যেই পড়ে। কিন্তু ঈশ্বর যেখানে আধার হয়ে যান, কেন্দ্র যেখানে অধ্যাত্ম, ওখানেই ঠিক ঠিক আনন্দ। ওখানে গেলেই যে কোন লোক নিজেকে উন্নত মনে করবে।

মাস্টারমশাই নিজে কি ভাবছেন সেটারই এবার বর্ণনা করছেন, "মাস্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ইঁহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্বক প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন"?

প্রাকৃত মানে অতি সাধারণ মানুষ, যেমনটি দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছেন তেমনটিই আছে, ওখানে আর কোন পরিবর্তন হয়। একটা হাসির গল্প আছে, একজনের ব্রেন ট্রান্সপ্ল্যান্ট হবে। সে ব্রেন কিনতে গেছে। একটা ব্রেন নিয়ে দেখছে, বলা হল এটা বৈজ্ঞানিকের ব্রেন, দশ হাজার টাকা দাম। আরেকটা দোকানে গিয়ে আরেকটা ব্রেন নিয়ে দেখছে, বলা হল এটা ডাক্তারের ব্রেন, পনের হাজারা টাকা। তাকে একটা সাধারণ মানুষের ব্রেন দেখানো হল। কত দাম? দশ লাখ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারদের ব্রেনের দশ বারো হাজারের মধ্যে আর একটা সাধারণ মানুষের ব্রেন দশ লাখ টাকা কি করে হয়! একটুও ব্যবহার করে হয়নি, একেবারে ফ্রেশ। পুরো ফ্রেশ মানে প্রাকৃত। যেমনটি ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল তেমনটিই আছে, তার একটুও ব্যবহার হয়নি। অপরের সম্পত্তি হরণ করতে নেই, আপনার বুদ্ধি ঠাকুর দিয়েছেন, ঠাকুরের সম্পত্তি তো নষ্ট করা যাবে না। তাই যেমনটি দিয়ে ঠাকুর পাঠিয়েছেন, মরার সময় তেমনটি ঠাকুরকে ফেরত দিয়ে বলব, 'দেখ ঠাকুর তুমি যেমনটি দিয়েছিল তেমনটি রেখে দিয়েছি, এক ফোঁটাও খরচ করিনি'। জসকি তস্ ধর্ দিনি চাদরিয়া, কবীর দাস বলছেন, এই চাদর, মানে এই শরীর, তুমি যেমনটি ঠাকুর দিয়েছিলে, তেমনটি রেখে দিয়ে গেলাম। আমরা ব্রেনটাকে চাদর বলছি। হে ঠাকুর আপনি যেমনটি দিয়েছলেন, আপনার আশীর্বাদে তেমনটি রেখে আমি এবার চললাম, এদেরকে বলে প্রাকৃত। এই প্রাকৃত লোকেদের হাসি, ঠাট্টা, মজা অত্যন্ত সাধারণ হয়। আধ্যাত্মিকতায় আপনি একটু যদি উন্নত হয়ে থাকেন, সংস্কৃতিতে যদি একটু উন্নত হয়ে থাকেন, আপনার আর এই হাসি-মজা ভাল লাগবে না। স্কুলে রিইউনিয়নের সময় আপনার সময়ের অনেক সাথী পড়ুয়াদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। সবাই হা হা হি হি করে মজা করছে, কিন্তু আপনার আর এই হাসিমজা ভাল লাগবে না, আপনি বুঝতে পারছেন, এদের ভিতরটা ফাঁকা। কিন্তু আপনি এদের এই অবস্থাকে পার করে এসেছেন। আপনার অনেক বন্ধুরা, ক্লাশমেটরা ওখানেই আটকে আছে। ঠাকুরকে দেখে মাস্টারমশাই বলছেন, আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।

এবার মাস্টারমশাই দু-দিন আগেকার ঠাকুরের কথাগুলিকে মনে করছেন – “ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করেছিলেন? ইনিই কি আমায় ‘তুমি কি জ্ঞানী’ বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার-নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মতো থাকতে বলেছিলেন”?

প্রসঙ্গ থেকে সরে এখানে দু-চারটে কথা বলার আছে। যাঁরা খুব উচ্চমানের মানুষ, তাঁরা আর জগৎকে পাত্তা দেন না, জেনে গেছেন ওনারা আলাদা হয়ে গেছেন। ভ্যান গগের জীবনে একটা ঘটনা আছে, অনেকেই জেনে থাকবেন ঘটনাটা। এত বড় চিত্রকর, সারা জীবন প্রায় না খেয়েই মরলেন। একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন, মেয়েটি আবার একজন গণিকা। সেই মেয়েটি একদিন ভ্যান গগকে বলছে, তোমার কান আমার এত ভাল লাগে, যদি আমার কাছে রাখতে পারতাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গিয়ে ছুরি দিয়ে একটা কান কেটে সেই রক্তাক্ত কান মেয়েটিকে উপহার দিলেন। পরের দিকে ভ্যান গগের একটি কান ছিল না। আইনস্টাইন খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। এখন ওনার ডাইরির কিছু কিছু পাতা বেরোতে শুরু হয়েছে। তিনি বিয়ে করেছেন, বিয়ের দিন একটা বিরাট লিস্ট স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। রীতিমত লিখিত চুক্তিপত্র – যখন আমি চাইব না আমার সাথে কথা বলবে না, আমার খাওয়া-দাওয়া থাকার সব ব্যবস্থা তোমাকে নিজে হাতে করতে হবে, আমাকে যেন কোন দায়ীত্ব না দেওয়া হয়, আমি যখন কথা বলতে চাইব না, তখন আমাকে যেন কথা বলতে বাধ্য না করা হয়, এই রকম নিজের স্ত্রীকে দেওয়া বিরাট লম্বা লিস্ট বেরিয়েছে। সেইজন্য কিছুদিন পর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে দিলেন, ডিভোর্সও হয়ে গেল। সেই আইনস্টাইন যখন জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন, জগদ্বিখ্যাত হওয়াটা গুরুত্ব নয়, তিনি কাজ করে করে এমন একটা উচ্চ অবস্থায় মনটাকে নিয়ে গেছেন যে, প্রেসের লোকেরা বলছে, স্যার আপনার জিভটা একটু বার করুন ছবি তুলব। উনিও বিরাট করে জিভ বার করলেন, ফটো উঠে গেল। আইনস্টাইনের খুব নামকরা ফটো। স্যার আপনার টুপিটা একটু আকাশে ছুড়ে দিন, তিনিও ছুড়ে দিলেন, ছবি উঠে গেল। তিনি এখন কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করছেন না। তাচ্ছিল্য বোধে না, উনি এত উপরে চলে গেছেন, যেমন বাচ্চাদের যেটা করতে বলবেন, বাচ্চারা তাই করবে। আইনস্টাইনদের মত যাঁরা উচ্চ মাপের মানুষ, তাঁরা কোথাও একটা জায়গায় এসে জাগতিক সব কিছুকে ছাড়িয়ে যান।

ঠাকুরের এটা ভ্যান গগের মত না, আইনস্টাইনের মতও না। ঠাকুরের এই যে ফষ্টিনষ্টি, এটা পুরো আলাদা, এটা হল ভাবমুখে থাকা। কারণ, আইনস্টাইনকে যদি বলা হয়, আপনার এই থিয়োরিটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ডিস্টার্বড হয়ে যাবেন, ওনার মনটা আবার জগতে নেমে আসবে। ঠাকুরের এই জিনিস কক্ষণ হবে না, ঠাকুর সব সময় রসেবশে আছেন। এই যে আইনস্টাইন জগৎকে গ্রাহ্য করছেন না, বা ভ্যান গগ নিজের কান কেটে দিচ্ছেন, বড় বড় কবি, শিল্পী, বড় বড় বৈজ্ঞানিক, এনাদের এই ধরণের অনেক কিছুর ঘটনা পাওয়া যাবে। বলা হয়, জিনিয়াস আর পাগল দুজন একই, দু-জনের ব্রেন সেন্টারে বিরাট কিছু তফাৎ নেই। আর জিনিয়াস মানেই হল পাগল, কারণ তুমি নর্মাল নও। নর্মাল মানেই হয় সাধারণ, যেমনি কাউকে অসাধারণ বলছি, সাথে সাথে বুঝতে হবে সে এ্যবনর্মাল। সুপার-নর্মাল আর এ্যবনর্মাল, দুটো একই। জিনিয়াস মানেই পাগল, কারণ সমাজে তিনি নিজেকে খাপ-খাওয়াতে পারেন না, তাঁর ব্যবহারটাও ফিট করে না। ঋষি, সন্ত মহাত্মাদের যাঁরা সত্যিকারের খুব উচ্চ হন, অনেক সময় দেখা যায়, তাঁরাও সমাজে ফিট করেন না।

ঠাকুরের কিন্তু ওই অর্থে কিছু হচ্ছে না, ঠাকুরের হল, মনটাকে ধরে রাখতে হবে। একটা বড় গ্যাস বেলুন ছেড়ে দিলে আকাশে কোথায় উড়ে চলে যাবে। যদি ওকে ধরে রাখতে হয়, রীতিমত খুব ভারী ওজনদার জিনিসের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। সেই ওজন হল নরেন, রাখাল, ভবনাথ, লাটু, এনারা কোন রকমে বেলুনরূপী ঠাকুরকে এই পৃথিবীতে বেঁধে রেখেছেন, তা না হলে ঠাকুরকে আর পাওয়া যাবে না। গরুর দুধ যেমন বাছুর না হলে পাওয়া যায় না, বড় গ্যাস বেলুনকে বেঁধে না রাখলে

যেমন মাটিতে ধরে রাখা যাবে না, ঠিক তেমনি ঠাকুরের এই কথাগুলো আসবে না, নরেন, রাখাল, লাটুর মত লোক যদি না থাকে।

এই যে ফষ্টিনষ্টি আমরা দেখছি, ঠাকুর কিন্তু এই জিনিস অন্য লোকের সঙ্গে করবেন না, করবেন একমাত্র তাঁর অন্তরঙ্গদের সাথে। আইনস্টাইনের কাছে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, কোন গ্রাহ্যই করবেন না। প্রেসের লোক, যাদের সাথে তাঁর কোন পরিচয় নেই, তারা বলছে, এই হাতটা একটা তুলুন, এই একটু জিভটা বার করুন, যেটা করতে বলা হচ্ছে, উনি সেটাই করে দিচ্ছেন। ঠাকুর এই জিনিস কখনই করবেন না, ঠাকুর খুব সাবধান। ঠাকুরের যত হাসি, যত ঠাট্টা, যত ফষ্টিনষ্টি খুব ঘনিষ্টদের মধ্যে যখন আছেন, ওর বাইরে তিনি একজন পারফেক্ট ভদ্রলোক। হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা কথা বললে, খুব বিষয়ী লোক দেখলে, তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না বাপু বা এই ধরণের কিছু কথা বলে দিচ্ছেন, সেটা আলাদা। কিন্তু এখানে ঠাকুরের যে রূপ দেখছি, মাস্টারমশাই যার বর্ণনা করছেন, এই রূপ দেখা যাবে শুধু অন্তরঙ্গদের মাঝখানে যখন আছেন, ঠাকুরের এই দিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাস্টারমশাই নূতন আসছেন, সবে চতুর্থ দর্শন, তিনি খুব অবাক হয়ে গেছেন। পরে পরে তাঁর পরিষ্কার হবে কে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, কে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। একটা বাচ্চা ছেলে ঠাকুরের ঘরে এসেছে, সামনে একটা চ্যাঙাড়ির মধ্যে সিঙারা রাখা আছে, ঠাকুর আস্তে আস্তে ওটা সরিয়ে দিচ্ছেন, কারণ বাচ্চা ওই দলে পড়ে না। আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে, যেখানে দেখছি ঠাকুরের কথাবার্তা অন্তরঙ্গদের সাথে এক রকম, অন্যান্য লোকের সাথে অন্য রকম।

আমাদের মনে হতে পারে যে, গীতায় সমদর্শির কথা, স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে তো এটা মিলছে না। মিলবে না, কারণ গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের একটা অবস্থার বর্ণনা করছেন, আরও যে অবস্থার কথা আছে, সেগুলোর বর্ণনা করছেন না। লীলাপ্রসঙ্গে ও কথামৃতে ঠাকুরের যে অবস্থার বর্ণনা পাই, এটাই হল পরমহংসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। স্থিতপ্রজ্ঞ হল একটা দিক, এটা পূর্ণাঙ্গ না।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাস্টারকে এক-একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ্, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুশি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে'। মাস্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে"।

পরে আমরা দেখব, একদিন নরেন ও মাস্টারমশাই বর্তমান যুগের ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ঠাকুর যখন তাদের আলোচনার বিষয় জানতে পারলেন, তখন তিনি মাস্টারমশাইকে তিরস্কার করছেন, তোমার বয়স বেশী, এইসব প্রসঙ্গ তোমার উঠতে দেওয়া উচিত হয়নি ইত্যাদি। যাই হোক, এখানে হাসিমজা সব হচ্ছে, সেখান থেকে হঠাৎ ঠাকুর হনুমানের কথা বলতে শুরু করলেন।

ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে মহাবীর হনুমানের একখানি পট ছিল। ভক্তিশাস্ত্রে যখনই দাসভাবের প্রসঙ্গ কথা আসে, মহাবীর হনুমান হলেন এই দাসভাবের আদর্শ। ঠাকুর বলছেন, "দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না, কেবল ভগবানকে চায়। যখন ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বললে – আমার কি ফলের অভাব, পেয়েছি যে ফল, জনম সফল......"।

বাল্মীকি নিজের মত রামায়ণ কথা রচনা করলেন, কিন্তু পরে পরে বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন রাজ্য রামায়ণকে সবাই নিজের মত করে নিলেন, যা কিনা সব সময় বাল্মীকি রামায়ণের সাথে যে মিলবে তা নয়, মেলার কথাও না। কারণ রামায়ণ মহাভারত হল আমাদের ইতিহাস-পুরাণ।

ইতিহাস-পুরাণের কাজ হল মানুষকে ধর্ম পথে নিয়ে যাওয়া। ধর্ম পথের সাথে কোন রকম compromise করা যাবে না, কাহিনীকে নিজের মত পাল্টাবেন, বর্ণনাও নিজের মত করে পাল্টাবেন, কিন্তু ধর্মটাকে ধরে রাখবেন। আর যে রাজ্যে আছেন, যে ভাষায় আছেন, তারা যে জিনিসটাকে বোঝেন, সেই জিনিসের মাধ্যমকে অবলম্বন করে বলবেন। এখানে হনুমানের ব্রহ্মাস্ত্র চুরি করার যে কাহিনী ঠাকুর বলছেন, এই কাহিনীর বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণে বা অন্যান্য রামায়ণেও পাওয়া যাবে না। না পাওয়ার জন্য কিছু আসে যায় না। কারণ যিনি এটা করেছেন, তিনি নিজের মত জিনিসটাকে দেখেছেন। তিনি বর্ণনা করছেন, মহাবীর হনুমানের মন শ্রীরামচন্দ্রে এমন পড়ে আছে যে, এখন তাকে পথ থেকে সরাবার জন্য যত চেষ্টাই করা হোক, বিচলিত করার যত প্রয়াসই করুক না কেন, হনুমান তাঁর পথ থেকে বিচলিত হবেন না। যিনি এর রচয়িতা, তাঁর উদ্দেশ্য হল, যিনি শুনছেন, যিনি ভক্ত, তাঁর মনে এই ভাব দেওয়া, তুমি যে পথে যাচ্ছ, সেই পথে তোমার বিঘ্ন আসবে, প্রলোভন আসবে, ওদিকে না তাকিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। যদি সময় থাকে, একটা উত্তর দিয়ে দেবে, তোমার দিকে আমি তাকাচ্ছি না, তোমার কথায় আমার কিছু হবে না, এই বলে এগিয়ে যাও।

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন, ঠাকুর এই গান গাইতে গাইতে আবার সেই সমাধি। এই কিছুক্ষণ আগে ফষ্টিনষ্টি করছিলেন, মহাবীর হনুমানের কথা উঠল, সেখান থেকে দাসভাব, দাসভাব থেকে রামচন্দ্র, রামচন্দ্র থেকে "আবার সেই সমাধি! আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন – ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুশি করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি অবস্থা মাস্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে ওই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ নিজের নিজের কার্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম রাম', এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন"।

এর আগে সমাধি নিয়ে আলোচনা করার সময় ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই বলা হয়েছিল, ঈশ্বরে মন দিয়ে রাখার জন্য মন একাগ্র হয়ে এমন ডুবে যায় যে, ওই অবস্থায় ইন্দ্রিয় আর কোন কাজ করবে না, ইন্দ্রিয়ের কথা ছেড়ে দিন, মনের মধ্যেই কোন চাঞ্চল্য থাকবে না, সেখানে ইন্দ্রিয় অনেক নীচে পড়ে থেকে যায়। এখানে সমাধিকে খুব সহজ ভাবে বর্ণনা করছেন – কথা হচ্ছিল, কথা হতে হতে হনুমান শব্দটা এসে গেছে, এটা এখানে বর্ণনা নেই কিভাবে হনুমান শব্দটা এলো, হনুমান শব্দ এলো, হনুমান থেকে ভক্তি, সেখান থেকে ছোট্ট একটা গান হতে হতে, দাসভাব, রামচন্দ্র, সেখান থেকে রামের ভাবে ডুবে গেলেন। সেইজন্য ওই সমাধির অবস্থা থেকে যখন ফেরত আসছেন, তখন 'রাম রাম' এই নাম উচ্চারণ করতে করতে নামছেন। এটাই শ্রীশ্রীমাকে নির্দেশ করেছিলেন, সমাধির আগে যদি এই রকম ভাব থাকে, তাহলে এই রকম ভাবের মন্ত্র বললে ওনার মন ধীরে ধীরে আবার বাহ্যজগতে নেমে আসবে।

"মাস্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক"! প্রথমের দিকে মাস্টারমশাই বর্ণনা শুরু করছেন আগের দিনের সমাধি, সেখান থেকে এই ফচকিমি, এই ফচকিমি থেকে মনটা চলে গেল হনুমানে, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন সমাধিতে। আসলে এটাই ভাবমুখ, ঠাকুরের মন সব সময় ডুবে আছে ঈশ্বরের মধ্যে। সামান্য একটু কোন ঈশ্বরীয় স্পার্ক লাগল, মনট হুঁশ করে ঈশ্বরে ডুবে গেল। ঠাকুরের সন্তানরা কোন রকমে তাঁকে এই জগতের মধ্যে নামিয়ে রাখছেন জগতের কল্যাণের জন্য।

"ঠাকুর পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। মাস্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমারা দুজনে ইংরেজীত কথা কও ও বিচার কর, আমি শুনব'"।

ঠাকুরের ইংরেজীতে কথাবার্তা, বিচার এগুলো ভাল লাগত। নরেন্দ্রকে ভালবাসতেন, নরেন তাঁর ঠিক ঠিক আপন। বাড়িতে বাচ্চা গান শিখছে, ইংরেজী কবিতা শিখেছে, বাড়িতে অতিথি এলে বলি, বাবা! কাকুকে একটা গান শুনিয়ে দাও তো, একটু টুইঙ্কল টুইঙ্কলটা শুনিয়ে দাও তো। নরেন তাঁর চোখের মণি, ইংরেজীতে নরেন তর্ক করবে উনি ওটা দেখবেন, বুঝবেন না কিছুই, কিন্তু একটু দেখতে চাইছেন নরেন কিভাবে ইংরেজীতে তর্ক করে।

"মাস্টার আর নরেন উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাংলাতে। ঠাকুরের সামনে মাস্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় একরকম বন্ধ। আর কিরূপে তর্ক-বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না"।

কথামৃতের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল, কথামৃত পড়ার সময় মোটামুটি দু-রকমের ভাব আনা যায়। একটা তো হল কথামৃত পড়ছি, এটাই একটা ভাব সৃষ্টি করে। সেটাকে না ধরলে প্রথম হয় তত্ত্ববিচার, এই যে তত্ত্বের কথাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে নিয়ে বিচার হয়। আর দ্বিতীয় হয় লীলাচিন্তন। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, তাঁরা সকাল সন্ধ্যা জপ করেন, জপ করতে গিয়ে ধ্যান করছেন। কিন্তু সব সময় তো ধ্যান করা যায় না, সব সময় ঠাকুরের মূর্তির উপর মন রাখা যায় না, তখন হয় লীলাচিন্তন। এই যেমন আজকে আমরা কথামৃতের যে আলোচনা করলাম, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরে ছোট তক্তাপোশের উপর বসে আছেন। ঘরে নরেন আছেন, ভবনাথ আছেন, মাস্টার আছেন, ঠাকুর তাঁদের মিষ্টি করে বলছেন, তোমরা ইংরাজীতে কথা বল, এই দৃশ্যকে দেখে যাচ্ছি, তখন দেখা যায় এই ভাব নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ থাকা যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে লীলাচিন্তনের বিরাট মাহাত্ম্য। কথামৃতে মাস্টারমশাই ছবির মত প্রত্যেকটা দৃশ্যের যে বর্ণনাগুলি করেছেন, তাতে তিনি লীলাচিন্তনের একটা বিরাট দরজা খুলে দিয়েছেন।

সমাধির অবস্থায় চলে যাওয়াতে ঠাকুরের এই যে একটা অনায়াস প্রয়াস, মনে হচ্ছে বিনা প্রয়াসে তিনি সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, হাসিমজা করছেন, সেখান থেকে গান, সেই গান থেকে চলে যাচ্ছেন সমাধিতে। এখানে ঠিক ঠিক যে এক মিনিটের ধ্যান হবে সেটা সম্ভব না, ধ্যান মানে একটা চিন্তাকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকা, আর সেখানে ঠাকুরের সমাধি। এরপর দশম পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে।

দশম পরিচ্ছেদ

অন্তরঙ্গ সঙ্গে – 'আমি কে'?

বেলা তিনটার সময় মাস্টারমশাই এসেছিলেন, এখন বিকাল পাঁচটা বাজে। কয়েকজন ভক্ত যে যার বাড়িতে চলে গেলেন। মাস্টারমশাই আর নরেন আছেন। অর্থাৎ এখন আর কেউ নেই। দক্ষিণেশ্বর মন্দির ফাঁকা হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই ঠাকুরবাড়ির এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন। কিছুক্ষণ পরে হাঁসপুকুরের দিকে আসছেন।

মাস্টারমশাই "দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণদিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া; নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'দেখ, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন – নূতন পতি (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো'? নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হ্যাঁ, চেষ্টা করব"।

ইদানিং কালে আর এই জিনিসগুলো দেখা যায় না, কিন্তু আগেকার দিনে বিবাহ কম বয়সেই হয়ে যেত, মেয়েদের বয়স খুবই কম থাকত। বিয়ে হয়ে গেলেও মেয়েকে শ্বশুড় বাড়ি পাঠানো হত না। যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা মাঝে মাঝে আসত, নূতন বিয়ে হয়েছে, একটু ঘন ঘন আসে। এটা কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের ঐহিক সম্পর্ক নয়। আমরা অনেক সময় মনে করি আধ্যাত্মিক জীবন আর জাগতিক জীবনে একটা বিরাট তফাৎ। কাহিনী, কমিকস পড়ে, টিভি সিরিয়াল দেখতে গিয়ে যখন দেখছেন বাল্মীকি ধ্যান করছেন আর তাঁর উপর উই পোকার ঢিপি হয়ে গেছে। বেলুড় মঠে আসছেন, মনে করছেন, সন্ন্যাসীরা ওই রকম ধ্যান করছেন আর চুলগুলো যেন লম্বা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, কাছে গিয়ে দেখছেন জিনিসটা সেই রকম কিছু না। এ-সবের জন্য লোকেদের মনে হয় যে, আধ্যাত্মিক জীবন এক রকম, সাংসারিক জীবন আরেক রকম। কিন্তু তা না, যেটা মূল জ্ঞান, সেটাকে যদি আলাদা করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, জাগতিক জীবনে যা যা দরকার, যেমন যেমন চলে, আধ্যাত্মিক জীবনও ঠিক তেমন তেমন চলে। টাকা-পয়সা যারা অর্জন করতে চায়, তাদেরও খাটতে হয়, আধ্যাত্মিক জীবনেও খাটতে হয়। লোকেরা মনে করে আধ্যাত্মিক জীবন মানে পলায়নের জীবন। আমাদের অনেক সময় শুনতে হয়, বেশ আছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, মজা করছেন। তা না, মাথার ঘাম যখন পায়ে গিয়ে পড়ে তখন ধ্যান হয়। ঠাকুর বলছেন, ঋষিরা কত খাটতেন। খাটনি দুটো জায়গাতেই সাধারণ।

সংসারে যদি থাকতে হয় তাহলে কোন কোন জায়গায় একটা গভীর সম্পর্ক তৈরী করতে হয়। আধ্যাত্মিক জীবনেও যাদের সাথে ভাবের মিল থাকে, তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরী করতে হয়। ওই গভীর সম্পর্কের জন্য যোগাযোগের ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব পেয়ে যায়। ইদানিং হোয়াটসাপ, ফেসবুক হয়ে মানুষের যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ একা থাকতে পারে না। খুব উচ্চমানের ঋষি যাঁরা, উচ্চমানের সন্ন্যাসী যাঁরা, সংসারের সাথে যাঁদের কোন লেনাদেনা নেই, সমাজের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, এনাদের বাদে সবাইকে নিজের একটা গোষ্টি চালাতে হয়। আমরা যখন ইয়ং সন্ন্যাসী ছিলাম, তখন একজন খুব বিচক্ষণ মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, 'দেখ, সাধু জীবনে দুটো জিনিস সব সময় করবে, তাহলেই তুমি নিরাপদ। প্রথম ঠাকুর তোমার ইষ্ট, ঠিক আছে। কিন্তু বেলুড় মঠের যে ঠাকুর, ইনিই হলেন বিশেষ, এনার সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক রাখবে'।

ছায়া-কায়া সমান, আপনার ঘরে যে ঠাকুরের ছবি আছে সেটাও ঠাকুর, আপনি যেখানে থাকেন সেখানে যদি রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সেন্টার থাকে বা প্রাইভেট আশ্রম থাকে, সেখানে যে মন্দির আছে, সেই মন্দিরেও ঠাকুর আছেন, একই ঠাকুর। কিন্তু বেলুড় মঠের ঠাকুর আলাদা। বাবুর যেমন বৈঠকখানা থাকে, বেলুড় মঠ হল ঠাকুরের বৈঠকখানা। সন্ন্যাসী, ভক্ত সবাইকে এখানকার সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরী করে, সেই সম্পর্কটাকে লালন-পালন করতে হয়। যেমন আপনি ঠিক করলেন, এই দিনে, এই বিশেষ তিথিতে আমি ঠাকুরের কাছে আসবই। এবার বন্যা হোক, সাইক্লোন আসুক, আপনাকে আসতেই হবে। ইদানিং কালে দেখবেন বেলুড় মঠের আশেপাশে দেশবিদেশের অনেকেই ফ্ল্যাট কিনে থাকতে শুরু করেছেন। কিছু না হোক, সকাল বিকাল ঠাকুরকে দর্শনটা করতে পারেন।

সন্ন্যাস জীবনে আমাকে মঠের অনেক সেন্টারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু যবে থেকে বেলুড় মঠে আমার পোস্টিং হয়েছে, সেদিন থেকে, যাই হয়ে যাক, সাইক্লোন হোক, বৃষ্টি হোক, শরীর খারাপ হয়ে বিছানায় যদি না পড়ে থাকি, আমার প্রথম কাজ হল মন্দিরে গিয়ে আগে ঠাকুরকে দর্শন করা। এই ধরণের নিষ্ঠাতে একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরী হয়। অনেকেরই মনে হবে, ঢংবাজী করছে, ধাপ্পাবাজী করছে; না না কখনই তা না। ধাপ্পা তো মনের, ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক তো আত্মার সম্পর্ক, তার মানে আপনি অনেক উচ্চস্তরের দিকে এগোচ্ছেন। আপনি চুরি-চামারি করুন, মিথ্যা কথা বলুন, যাই করুন, এগুলো যে ভাল নয় সবাই মানছে। ঠাকুরের সঙ্গে যদি আপনার বিশেষ সম্পর্ক হয়, তা যে ভাবে, যে আকারেই হোক, সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে, নানা রকম বই পড়ে আপনি এর অনেক বর্ণনা পাবেন, কিন্তু work-out আপনাকে নিজেকেই করতে হবে। ওই যে ভালবাসার বন্ধন, ভালবাসার যে

দড়ি আপনাকে টেনে নিয়ে আসবে, সুখে-দুঃখে এটাই আমাদের বাঁচায়। সুখের বন্যা যখন আসে, তখন ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে, আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তখন কিছুর হুঁশ থাকে না, জীবন খুব ভাল চলছে। দুঃখ-কষ্টের যখন ঝড় আসে তখনও সেই দুরবস্থা, নিজেকে বাঁচাতেই প্রাণ চলে যায়।

দুটো ক্ষেত্রেই যদি খুঁটি ধরা থাকে, আর ঠাকুর ছাড়া অন্য কোন খুঁটি হয় না, তখন সবই আছে, সংসারও আছে, ভোগ-বাসনা আছে, একটু আধটু মিথ্যা কথা, একটু আধটু চুরিও আছে, কিন্তু তার মধ্যেও ঠাকুরকে ধরে আছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা, হে ঠাকুর, আমার মধ্যে পূর্ব পূর্ব জন্মের দুর্বলতাগুলি আছে, ঠাকুর এগুলো আমার ভিতর থেকে সরিয়ে দাও, দেখবেন ধীরে ধীরে এগুলো কমতে শুরু করবে। আর আপনি যদি বলেন, ঠাকুর খুব দুর্দিনে পড়েছি, যদি লাখ খানেক টাকা দাও; ঠাকুর দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, তবে না দেওয়ারই বেশী সম্ভবনা। কিন্তু আপনি যদি বলেন, ঠাকুর আমার মধ্যে এই এই দুর্গুণ আছে, এই এই দুর্বলতা আছে, এগুলোকে সরিয়ে দাও; দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যে চলে যাবে, আর থাকবে না।

আত্মা মানে শুদ্ধ আত্মা, সংসার মানে আত্মার উপর আরোপিত, ত্যাগ আমাদের স্বভাব, ভোগটা আমাদের কৃত্রিম। আত্মা স্বভাবে ভোগ করতে পারে না, আত্মার স্বভাব ত্যাগ করা, ওটাই সে পারে, যেটা স্বাভাবিক সেটাই ঠিক। ত্যাগ করাটা আমাদের স্বভাবেই রয়েছে, কিন্তু এটাই মায়া যে, আমরা সব সময় উল্টোটা ভাবি। আমাদের কাছে ত্যাগটা অস্বাভাবিক লাগে। সন্ন্যাসীদের দেখে লোকেরা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে তখন ভুলে যাচ্ছে যে, ত্যাগটাই স্বাভাবিক, ত্যাগেই আনন্দ। এটা অন্য জিনিস যে, বেশীর ভাগ সংসারী মানুষ মল-মুত্র ত্যাগ ছাড়া জীবনে আর কোন কিছু ত্যাগ করে না, সেটা আলাদা, কিন্তু ত্যাগই হল মানুষের স্বাভাবিক জিনিস। আপনি যত কোল্ডড্রিঙ্কস খান, যত মদ খান, যত দামী জিনিস খান, প্রস্রাবের সময় যখন আসে তখন আপনিও ত্যাগের জন্য ছটফট করতে থাকবেন। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তখন ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে হবে। নানা রকমের জিনিস সঞ্চয় করে করে আপনার যখন প্রচুর জিনিস জমে যায়, তখন এটাই আপনাকে ডোবাবে। ফুটো দিয়ে নৌকাতে জল ঢুকছে, জল যদি বাইরে না ফেলেন আপনি মরবেন।

ঠাকুরের সঙ্গে যখন বিশেষ সম্পর্ক হয়ে যায়, ঠাকুর যখন আপনজন হয়ে যান তখন এই জল বাইরে ফেলা শুরু হয়। সেইজন্য ঠাকুরকে আপন করে নিতে হয়। জীবনে এক, দুই, তিন করে কিছু কিছু পয়েন্টস ঠিক করে নিতে হয়, যাই হয়ে যাক, শয্যাগ্রস্ত যদি না হয়ে যাই, ঠাকুরকে নিয়ে এটা আমি করবই করব। দৈনন্দিন জপধ্যান নিয়ে বলা হচ্ছে না, এটা বেলুড় মঠের ঠাকুরকে নিয়ে বলা হচ্ছে।

মহারাজ দ্বিতীয় যেটা বলেছিলেন, 'একজন কি দুজন সাধুকে অবশ্যই সামনে রাখবে, যিনি তোমার ধ্রুবতারা। তাঁকে তোমার সব কথা বলবে, কোন কিছু লুকোবে না। আর নিয়মিত তাঁর সাথে দেখা করবে'। অনেক আগেকার কথা, ১৯৮৭ কি ১৯৮৮ সালের ওই সময়ের কথা, তখন দূরে চলে গেলে এখনকার মত নিয়মিত আসা-যাওয়া করা যেত না। সেইজন্য মহারাজ বলছেন, 'নিয়মিত চিঠি লিখবে, পাঁচ পয়সার পোস্টকার্ডেই লিখবে, তিনি উত্তর দিন আর নাই দিন, চিঠিটা লিখে যাবে'। মহারাজের কথায় সেই সময় আমার এই কথাটা খুব গভীরে মনে হয়েছিল – importance of communication।

আগে আপনি ঠিক করুন জীবনে আপনি কি চান। একটা বাচ্চা ছেলেও জানে আমি যদি খেলা করতে চাই, আমোদ-আহ্লাদ যদি করতে চাই আমার চারজন বন্ধু দরকার। আপনিও জানেন আপনার জীবনে কি কি দরকার, কিছু টাকা দরকার, আপদ-বিপদে দুজন বন্ধু দরকার; সারা জীবন তো এগুলো করেছেন, ওদিকে তো আপনার investment আছেই, আর্থিক অনিশ্চিয়তা নেই, বিপদের সময়

লোকবলের ঘাটতি হবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে একবার যখন বুঝে গেলেন এনার সঙ্গে আমার বেশ মেলে, ইনি আমার ক্ষতি করবেন না, মাঝ পথে ডুবিয়ে দেবেন না, এরপর ওনার সাথে communication বাড়াতে হয়। Relationship একটা বিরাট investment, যত আপনি invest করবেন তার dividend তত আপনি ভাল পাবেন, ফল তত ভাল হবে। এই যে relationship এটা casual না, যেখানে relationship lifelong হতে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু ঘন ঘন communication, ঘন ঘন সাক্ষাৎকার খুব important।

মানুষের এই যে জীবন চলে, এই চলাকে যদি আমরা একটু খতিয়ে দেখি বা বিচার করি, আমরা দেখছি মানুষ একাই জন্ম নেয়, জীবন-যাপন মোটামুটি একাই চলে, আর মৃত্যুতো অবশ্যই একা, মাঝখানে মনে হয় আমার যেন কয়েকজন সঙ্গী আছে, ওই সঙ্গীদের মধ্যে কেউ casual আছেন, কিছু ভাল বন্ধু আছে, কিছু সাধারণ বন্ধু আছে আবার কিছু আছেন যাঁরা সত্যিকারের আপনজন। মা-বাবার ক্ষেত্রে আপনার চয়েস নেই, ওনাদের কাছে আমাকে জন্ম নিতে হয়েছে। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক, এটা একেবারে আপনজনের সম্পর্ক। মা-বাবাও দেখবেন, যেদিন থেকে গর্ভে এসেছে, যবে থেকে জানল আমাদের মাঝখানে নূতন একজন আসছে, সেদিন থেকে একটা identification হয়ে যায়, আর জন্ম নেওয়ার পর সাত মাস, আট মাস হয়ে যাওয়ার পর একটা strong identification হয়ে যায়। ঠিক ওই একই সম্পর্ক আসে, যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়, সম্পর্ক জোরাল যদি না থাকে, গোলমাল লেগে যাবে।

এই যে দুটো সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী এবং বাবা-মার সাথে সন্তানের সম্পর্ক, এই দুটো থেকে আরও গভীর সম্পর্কের দরকার পড়ে যেখানে আধ্যাত্মিক জীবন থাকে। আগেকার দিনে বেলুড় মঠে গুরুপূর্ণিমার প্রচলন ছিল না, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী এর প্রচলন করেন। গুরুপূর্ণিমা সন্ন্যাসীদের বড় উৎসব। প্রভু মহারাজ এই উৎসব সবার জন্য খুলে দিলেন, উদ্দেশ্য ওটাই, বেলুড় মঠে ভক্তরা অন্তত এই একদিন আসবে, বেলুড় মঠে গুরু ঠাকুর নিজে, সঙ্ঘগুরুই সঙ্ঘের গুরু। বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট হলেন সঙ্ঘগুরু, ঠাকুরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, সঙ্ঘগুরুর সাথে যেন identification হয়, এই যোগটা যেন হয়। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁর মাধ্যমে আপনি আধ্যাত্মিক পথে এগোবেন, তাঁর সাথে ঘন ঘন সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে মরুভূমিতে গাছ রোপণ করে তাতে জল ঢালার মত হবে। আপনি জল ঢাললেন, ধীরে ধীরে ওই জলটা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটা দাগ হয়ত থাকবে, দেখে মনে হবে এখানে কেউ জল ঢেলেছিল, কিছু দিন পরে সেটারও কোন চিহ্ন থাকবে না, হয়ত একটা হাল্কা আবছা একটা স্মৃতি থাকবে। ফলে কি হবে? যেটা হওয়ার ছিল সেটা হবে না।

অনেক সময় বলা হয় যে, গুরুকে ভুলে যাওয়া, মন্ত্র ভুলে যাওয়া, এগুলো পাপ। এগুলো ভয় দেখানোর জন্য বলা হয়, যাতে ঠিক রাস্থায় থাকে। মূল কথা হল, একটা ভাল জিনিস হওয়ার ছিল, হারিয়ে গেল। কেন হারিয়ে গেল? খুব সহজ একটি কারণে। সেই জোরালো একটা মেলবন্ধন তৈরী করা হয়নি। ভালবাসার সুতো, যেটা এক অপরের সাথে বাঁধবে, সেই সুতোকে শক্ত করেননি। বাবা-মার সাথে সন্তানের একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক এমনিতেই থাকে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অত গুরুত্ব থাকে না, কিন্তু বিষয়ী লোকেদের জন্য এখানেও সম্পর্কের একটা ভাল গুরুত্ব থাকে। কিন্তু যাঁরা ধর্মপথে যাবেন, যিনি আধ্যাত্মিক গুরু, শুধু গুরু না, মেন্টর, যাঁর সঙ্গে কথা বললে আপনার একটু আধ্যাত্মিক ভাব জাগে, একটু বড় হতে ইচ্ছে করে, এনার সাথে ঘন ঘন মিশতে হয়।

ঠাকুর নরেনকে চিনেছেন। গুরু পাওয়া খুব সহজ। আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় যান, নিউজ ম্যাগাজিনে যান, সবাই সবাইকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। আপনি কি কোথাও বিজ্ঞাপন দেখেছেন, আমি শিষ্য হতে চাই, আমার একজন গুরু দরকার? কোন দিন দেখবেন না। ঠাকুরও বলছেন, লাখে লাখে গুরু পাওয়া যায়, চেলা পাওয়া যায় না। বেদের সময় দেখুন, শিষ্যরা আসত, গুরু তাদের ভাগিয়ে

দিতেন। এখন গুরুরা বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে, এসো, দরজা খোলা, এক্ষুণি কিছু দক্ষিণা দিতে হবে না, পরে দেখা যাবে। সত্যিই শিষ্য পাওয়া যায় না। ঠাকুর এত বড় সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। তখনকার দিনে কে জানত, ইনি কলকাতার একজন নামকরা লোক হবেন, কে জানত ইনি বাংলার একজন নামকরা লোক হবেন, কে জানত কয়েক বছরের মধ্যে ইনি বিশ্বের একজন নামকরা আধ্যাত্মিক গুরু হতে যাচ্ছেন। কেউ জানত না। ঠাকুর বলছেন, সিংহীর দুধ যদি মাটির পাত্রে রাখা হয়, পাত্র ফেটে যাবে। ঠাকুরের কথাগুলোর ভিতর যে গভীরতা রয়েছে, এটা যদি কেউ বুঝতে পারে, বুঝতে হবে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবেন না। আমাদের এখন মনের যা অবস্থা, এই অবস্থায় এই কথাগুলো যদি যায় আমাদের ব্রেনের ফিউজ উড়ে যাবে, আমাদের সেই প্রস্তুতিই নেই, তাই নেওয়ার দম নেই।

আমরা কথামৃতের আলোচনা করছি ঠিকই, কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখা দরকার, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন তখন কত লোক ছিলেন, হৃদয়রাম ছিলেন, আরও কত পূজারীরা, ভাণ্ডারী, খাজাঞ্চি এনারা সবাই ছিলেন। ঠাকুর এনাদের সাথেও নিশ্চয় এই ধরণের কথা বলেছিলেন, ঠাকুরের পক্ষে সম্ভবই ছিল না যে, কামারপুকুরে ধান কেমন হয়েছে, দেশে কার বিয়ে হল, কার ছেলে হল, এসব জাগতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। ১৮৫৩ সাল থেকে, এখন ১৮৮২ সালের একটা দৃশ্যের বর্ণনা চলছে। তার মানে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আটাশ ঊনত্রিশ বছর আছেন, আর পুরো এই পিরিয়ডটা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ডুবে আছেন। ওখানকার লোকেদের সামনে ঠাকুরের এই নাটক চলছে। কিন্তু কেউ এই নাটকের কিছু নিতে পারছে না, কেউ বুঝতেও পারছে না কি বলছেন। একটা সিরিয়াস বই, বিশেষ করে খুব সিরিয়া থিঙ্কিং যদি নিজের ফরমেটে আসে, কেঁচোর মুখে নুন দেওয়ার মত আপনি ফেরত চলে আসবেন – ও বাবা! এ দেখছি সব বড় বড় কথা, আমার জন্য না। সিরিয়াস জিনিস যদি সহজ ভাষায় আসে তখন মনে হয়, বুঝে ফেলেছি। আমি মজা করে বলতাম, 'কোন ভক্তকে হয়ত জিজ্ঞেস করেছি, কথামৃত পড়েছেন'? 'হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ে ফেলেছি'। 'শুধু পড়েননি, পড়ে ফেলে দেওয়া হয়ে গেছে। যেটা সারা জীবনের সাধনা, সেটা পড়ে ফেলেছেন'।

ঠাকুর সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর থেকে সনাতন সত্যকে নামাচ্ছেন, এর বাহক কে হবে? ঠাকুর ছটফট করছেন। চোর যদি টাকার বাণ্ডিল সমেত থলের সন্ধান পেয়ে যায়, কি করে ওটাকে হাতাতে হবে, এই ভেবে তার কি রকম ছটফটানি হবে, একবার ভাবুন। দুজন ভালবেসে বিয়ে করেছে, বিয়ের পরের দিন একরাত আলাদা থাকতে হয়, স্ত্রী পাশের ঘরেই শুয়ে আছে, প্রিয়তমা পাশের ঘরেই আছে, পাগলের মত ছটফট করছে। ঠাকুর নরেনকে দেখে ওই রকম ছটফট করছেন, নরেন পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ, নরেন এখনও ঠাকুরকে, ঠাকুরের সুদূর দৃষ্টিকে বুঝছে না। নরেন যে কত বড় দায়ীত্ব নিয়ে জগতে এসেছে, নরেন এসব কিছু জানে না, নরেনের সে-রকম কোন চিন্তাও নেই। ঠিক এই মুহুর্তে ঠাকুরের দরকার একজন উপযুক্ত শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণের দরকার অর্জুনের, শ্রীরামকৃষ্ণের দরকার নরেনের। কিন্তু তার আগে নরেনকে তো তৈরী করতে হবে, বিনা তৈরী দিয়ে দিলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, কোন কাজেই লাগবে না। বাকিদের উনি তৈরীই করতে পারবেন না। মাটির ঢেলা দেখতে একই রকম লাগে, কিন্তু সেই মাটির ঢেলাকে ডাণ্ডা মেরে মেরে ভাঙবে, জল মেশাবে, কাদা করবে, তারপর সেটাকে চাকে বসাবে, সেখান থেকে ঘট তৈরী হবে। সেটাকে আবার রোদে শুকোবে, তারপর আগুনে পোড়বে, এরপর গিয়ে ঘট তৈরী হবে, এবার তাতে জল রাখা যাবে। ঠাকুর এখন খুঁজছেন, ওই মাটির টুকরো কোথায়, যেটা দিয়ে তিনি ঘট বানিয়ে জল রাখবেন।

অথচ আমি আপনি সবাই মাটির টুকরো, কিন্তু আমরা যে-ভাবে দেখাচ্ছি, তাতে আমরা কেউ একটা বড় পাথর, কেউ বা একটা গ্রানাইট। কিন্তু হীরার কথা ভাবুন, ওই হীরাকে ভেঙে আর কিছু করা যাবে না। আমরা সবাই নিজেকে মনে করছি বিরাট কিছু, নিজেদের কাছে আমরা হীরা। কিন্তু হীরাকে পাত্রে পরিণত করা যাবে না, ঠাকুরের জলরূপী সনাতন সত্যগুলিকে রাখা যাবে না। মজা করে হীরা

বললাম, আসলে আমরা একটা পাথর। এই পাথরকে ভাঙতে ভাঙতে আচার্য নিজেই ভেঙে যাবেন। আর কোন ভাবে যদি ভেঙেও দেন, সেটাকে আর ঘটে রূপান্তরিত করতে পারবে না। আমরা কেবল বলতে থাকব, কত আর মারবেন, অনেক তো হল।

জানি না, কোন জিনিসকে পাওয়ার জন্য আপনি কোন দিন উন্মত্তের মত ছটফট করেছেন কিনা, ছোটবেলা করেছেন নিশ্চয়, কারণ বাচ্চা বয়সে চকলেট, পেন্সিল, ইরেজার এগুলো বড়দের কাছে চাওয়ার পর না পেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে দিতাম। বড় হয়ে, যখন একটা চেতনা এসে গেছে, আমার এটা চাই, একেবারে সামনেই, এটাকে পেতেই হবে। যুদ্ধের সময় খাদ্য সঙ্কট চলছে, রেশনের দোকানে চাল-গম এসেছে, বিশাল লোকের ভিড় জমে গেছে, সবাই বলছে, আমাকে দিন, আমাকে দিন। কিংবা এই ধরণের অন্য কিছু থাকে, যেটার উপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, ওটা আমার চাইই চাই, পাগলের মত ছটফট করছেন। এগুলো ভাল বোঝা যায়, যদি কোন ছেলে কোন মেয়েকে সত্যিকারের ভালবাসে, তখন ছেলে মেয়েটিকে impressed করার জন্য কত কিছু করে, ওকে আমার চাইই চাই। ঠাকুরও এই ধরণের অনেক উপমা আনছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির এত বড় গ্রন্থ, সেখানেও সেইজন্য গোপী আর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে আসা হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে। মা যেখানে থাকতেন পাশেই একটা মেয়ে থাকত। নাচটাচ হচ্ছে, আরেকটা ছেলে পয়সা নেই যেতে পারছে না, সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মা দেখে হাসছেন, দেখ কি রকম ছটফট করছে। পাগলের মত ছটফটানি, এটাকে যদি আমরা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিই, তখন গিয়ে বুঝতে পারব, নরেনের জন্য ঠাকুর কি রকম ছটফট করছেন।

ঠাকুর সেই বিরাট শক্তিশালী চুম্বক, নরেন সেই লোহা। চুম্বকের চৌম্বক শক্তি লোহাতে সঞ্চারিত করা হবে, তারপর ওটাই একটা বড় চুম্বক হয়ে যাবে। ওই যে inductionটা হবে সেটারই প্রস্তুতি চলছে। তাই লোহাকে কাছে কাছে রাখতে হবে, লোহাটা দূরে সরে গেলে আর চুম্বক হবে না। সেইজন্য বলছেন, দেখ্, আর একটু বেশি বেশি আসবি। ঠাকুর ভয় পাচ্ছেন, আপনি ঠাকুরের জীবনীতে ঠাকুর ও নরেন একসাথে যে অংশগুলিতে আছে, সেই অংশগুলো পড়ুন, দেখবেন ঠাকুর সব সময় ভয় পাচ্ছেন, এই বুঝি নরেন অন্য কিছু হয়ে গেল, এই বুঝি নরেন অন্য কারুর হয়ে গেল। শুনেছেন, নরেনের বিয়ের কথা চলছে, ঠাকুর মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে কাঁদছেন। সাধারণ মানুষ এ-সব বুঝবেও না, যাঁদের একটু চেতনা আছে, তাঁরা হয়ত চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন। অবতার মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের মাঝখানে নেমে এসেছেন, দরকার একজন উপযুক্ত ভাল শিষ্য, যে অবতারের বার্তা, অবতারের শিক্ষা, অবতারের জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্যকে মানবজাতির কাছে বয়ে নিয়ে যাবে। পেয়ে গেলেন সেই মানুষটিকে, লক্ষণ দেখেই তিনি বুঝে নিয়েছেন, এই সেই লোক, এবার ওকে পাকড়াও করতে হবে, ওর চেনা পরিবেশ থেকে ওকে বার করে আনতে হবে। স্পাইরা যখন কাউকে ধরতে যায় বা মারতে যায়, প্রথমে লোকটিকে তাকে চিনতে হয়। যখন চিনে গেল, এই তো সেই লোক। এবার পুরো নজরটা ওর দিকে, লক্ষ্য করতে থাকে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় থাকছে, পাগলের মত চেষ্টা করে যায় কিভাবে ওর কাছ পর্যন্ত পৌঁছান যায়।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, কেমন আসবি তো? আবার উপমা দিচ্ছেন, যেমন – নূতন পতি। বিষয়ীরা আবার এগুলোকে ভুলভাল বুঝবে। কিন্তু খুব গভীর তাৎপর্য। একমাত্র যাঁরা খুব উচ্চমার্গের আচার্য এই জিনিস তাদেরই হয়। ঠাকুর আবার মাস্টারমশাইকে explain করছেন, মাস্টার যেন কোথাও ভুল ধারণা করে না বসে।

"সকলে কুঠির পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন। কুঠির কাছে মাস্টারকে ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়", ঠাকুর গ্রামে বড় হয়েছেন, যদিও বেশি দিন ছিলেন না, কিন্তু ছোটবেলার ঘটনাগুলো মনের মধ্যে থেকে যায়, ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৩, প্রায় আঠারো বছর গ্রামে ছিলেন।

কিন্তু প্রথম চার-পাঁচ বছর বয়সেই যে ছাপ পড়ে সেটা প্রবল থাকে। সেইজন্য ঠাকুরের বেশির ভাগ উপমাই গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের হাট, গরু বেচাকেনা হয়, গরু বলতে এখানে বলদ বলছেন।

"তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে"।

তাহলে যে গরুর ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরুগুলোর কি হবে, ওই গরু তো বিক্রিই হবে না। কিন্তু না, এখানে গরুর মালিক বদমাইশি করে, গরুর ল্যাজ সারাদিন এমন মোচড়াতে থাকে যে, ওর ল্যাজে প্রচণ্ড ব্যাথা হয়ে যায়। পরে ল্যাজে হাত দিলেই ব্যাথার চোটে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে, আর এইভাবে খদ্দেরকে বোকা বানায়। আমরা হলাম সেই ল্যাজ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ল্যাজে ব্যাথা করে দেওয়া গরু। একটু হাত দিলেই তিড়িং করে উঠি, আমাদের যে রাগ, আমাদের যে অহঙ্কার – হ্যাঁ আমাকে আপনি এ-রকম বললেন, আপনি জানেন আমি কে! ভিতরে কিছু নেই, ফাঁপা, শুধু ওই অহঙ্কারের জন্য তিড়িং বিড়িং করে উঠছে। কথামৃতে এই রকম লোকের বর্ণনা বার বার আসবে। ঠাকুর বলছেন, বুড়োর অভিমান, একবার কিছু বলে দিলে সারা জীবন মনে রাখবে।

যুধিষ্ঠির একদিন দ্রৌপদীকে বলছেন, সংসারের লোকেরা ক্রোধকে মনে করে শক্তি, ক্রোধটা শক্তি না। ঠাকুর এখানে ক্রোধের কথা বলছেন না। তেতে যাওয়া হল যার ল্যাজটা আচ্ছা করে মোচড়ান হয়েছে, ছুলেই ব্যাথায় মরা গরুও লাফিয়ে উঠবে। এখানে তেজের কথা বলা হচ্ছে, ভিতরে তেজ আছে। এই তেজটা অন্য রকম। পাখিকে যদি একটা পাথর ছুঁড়ে মারা হয়, সব পাখি উড়ে পালাবে। পায়রাগুলো একটু চালাক, সব কটা পালাবে না, অন্য পাখি সব কটা উড়ে পালিয়ে যাবে। আর সিংহকে যদি একটা পাথর ছোঁড়া হয়, একবার শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে। সিংহকে রাগাতে গেলে অনেক খাটতে হবে। কিন্তু একবার যদি রেগে যায়, তারপর বুঝে নিন কি হবে। ঠাকুর এখানে এই শক্তির কথা বলছেন। একটা পাথর মারলে সব পাখি উড়ে গেল, তার কথা বলছেন না, সিংহ ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে, ওই শক্তির কথা বলছেন। একটা পাথর ছুঁড়লেন, কিছু প্রতিক্রিয়া দেবে না, তারপরেও আপনি পাথর মেরে যাচ্ছেন, এটা সেটা ছুঁড়ে মারছেন, তারপর একটা সময় এক থাবাতে খেল খতম। নরেন হল সেই সিংহ, যে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে সে প্রতিক্রিয়া করবে, একেবারেই না। কিন্তু যখন মুখটা খুলবে, সারা দেশ নড়ে উঠবে। সিংহ যখন হুঙ্কার দেয়, আট থেকে দশ কিলো মিটার দূর পর্যন্ত শোনা যাবে। পরে আমেরিকায় নরেন এমন হুঙ্কার দিচ্ছেন, ভারতে তার কম্পনের অনুরণ হচ্ছে।

এর আগে যে নূতন পতির কথা বলছেন, এর কোন লিঙ্ক এখানে পাবেন না, পরের প্যারাগ্রাফে না এলে বোঝা যাবে না, ঠাকুর নরেনের জন্য কেন ছটফট করছেন। এই সেই শিষ্য। আচার্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় লিখছেন, ভাল শিষ্য পেলে আচার্যের শিক্ষার প্রসার ভাল হয়। কত মুনি, কত ঋষির শিক্ষা হারিয়ে গেল শুধু ভাল শিষ্য পরম্পরা না থাকার জন্য। ঠাকুর শিষ্য-পরম্পরা তৈরী করার ঠিক লোককে পেয়েছেন। ঠাকুর বারবার সবার সামনে নরেনের কত সুখ্যাতি করছেন। এখানে প্রধান সুখ্যতি কি? হাটের গরু, ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছে, এত দুঃসাহস তোমার, আমার ল্যাজে হাত দেওয়া!

"সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন; মাস্টারকে বলিলেন, 'তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বলবে কিরকম ছেলে"। যাকে আমরা ভালবাসি, আমরা চাই লোকে তাকে জানুক, পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করি, ওকে কেমন লাগল? নরেন হলেন ঠাকুরের বিশেষ। ঠাকুরের অন্যান সন্তানদের তুলনা করে অনেক কথা হয়, কিন্তু নরেন নরেন, কারুর সাথে ওর কোন তুলনাই হয় না, আলাদা জাত।

কথামৃত পড়ার সময় আমাদের একটা জিনিস সব সময় মাথায় রাখতে হবে, আমাদের যে অন্যান্য শাস্ত্রগুলি রয়েছে, যেমন বেদ, গীতা, উপনিষদ, পুরাণ, স্বামীজীর রচনাবলী, এগুলো অন্য ধরণের। ওর মধ্যে সত্যগুলি যেমন আছে, তেমনটি রাখা আছে। কিন্তু কথামৃতে অনেক কিছু রয়েছে, ঠাকুরের বর্ণনা রয়েছে, ঠাকুরের সাধারণ সাধারণ কথাগুলো আছে, কাউকে হয়ত ক্যাজুয়ালি কিছু বলেছেন, সেটাও আছে। মজার ব্যাপার হল, এগুলোতেও আমরা বিশেষ অর্থ দেখতে শুরু করি। পরে ঠাকুরই বলবেন, গ্রামের এক জমিদার ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে দুটো মোসায়েব আছে। জমিদার পা পিছলে পড়ে গেছে। এখন জমিদার পড়ে গেছে দেখে লোকেরা হাসাহাসি করবে। উঠে দাঁড়ালো, বলছে, 'আমি যে পড়ে গেলাম উয়ার একটা মানে আছে'। আমাদের জীবনে এই এক সমস্যা, যেখানে কোন মানে নেই সেখানেও আমরা মানে খুঁজে বেড়াই। কথামৃতে গায়ের জোরে কোন মানে বার করতে যাবেন না। যাঁরা ভাব নিয়ে আছেন, ঈশ্বরীয় ভাবে, ঠাকুরের ভাবে সব সময় জুড়ে রাখতে চান, ভাল, খারাপ কিছু না, কিন্তু ওই সময় তাঁদেরও কিছু ধরণের গোঁড়ামি, বোকামি এসে যায়। আমরা যেমন যেমন এগোব, ঠাকুরের অনেক কিছু আসবে, যেগুলোর এমনিতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যে বিশেষ দাম আছে, তা নয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এগুলো থেকেও লোকেরা বিশেষ অর্থ বার করতে শুরু করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যে পাঁচটায় এই প্রেক্ষাপটটা শুরু হয়েছিল, এখন রাত হতে চলেছে। এখানে খুব সুন্দর একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। "রাত হইয়াছে – মাস্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে পারিতেছেন না"। আস্তে আস্তে ঠাকুরের সাথে মাস্টারমশাইয়ের সম্পর্কটা দৃঢ় হচ্ছে, তিনি আর যেতে পারছেন না। আবার ঠাকুরকে খুঁজছেন। বলছেন, ঠাকুরের গান শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়ে গেছেন যে মাস্টারমশাই বলছেন, "তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে, আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান"। এমন দেবদুর্লভ কন্ঠ, এমন সুর আর এমন কথা, মাস্টারমশাইয়ের খুব সাধ আবার গান শোনার।

বলছেন, "খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুইপার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকারে মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল"। ঠাকুরের গান শুনে মাস্টারমশাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। সেইজন্য একটু সঙ্কুচিত ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ আর কি গান হবে"? ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'না, আজ আর গান হবে না'। এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল অমনি বলিলেন, 'তবে এক কর্ম কর। আমি বলরামের বাড়ি কলকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গান হবে"।

কদিন পরেই ঠাকুর কলকাতায় যাবেন। এরপর বলরাম বসুকে মাস্টার জানে কিনা, বোসপাড়ায় তাদের বাড়ি ইত্যাদি বলে মাস্টারমশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন – "আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়"? মাস্টারমশাই সবে চারদিন ঠাকুরের সাথে দেখা করেছেন, এরই মধ্যে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন।

"মাস্টার চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে"? ঠাকুরের এটা খুব প্রিয় উপমা ছিল, কত আনা, আবার অংশ না কলা, এগুলো যখন আসবে আমরা আলোচনা করব।

"মাস্টার – 'আনা' এ-কথা বুঝতে পারছি না; তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমাভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব আর কখন কোথাও দেখি নাই"।

মাস্টারমশাই ঠাকুরকে এখনও সে-ভাবে জানেন না, পরে পরে তিনি ঠাকুরকে অবতার রূপে দেখবেন, অবতারতত্ত্বের কথা বলবেন। বলছেন, দেখুন আমি তো বলতে পারব না আপনার কত জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যে জিনিসগুলিকে সম্মান দেওয়া হয়, কি কি – জ্ঞান, প্রেমাভক্তি, সাধারণ ভক্তি না, প্রেমাভক্তি; বিশ্বাস, বৈরাগ্য, এগুলোর জন্য যে ফল হয়, উদার ভাব; গীতাতে কয়েকবার বলছেন, *সর্বভূত হিতে রতাঃ*, এই উদার ভাব, সবারই প্রতি উদার ভাব। ধর্মের নামে যারা মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে তারা উদার ভাবে কি বোঝে ভগবানই জানেন। তোমার ভিতর এখনও উদার ভাব আসেনি, তুমি কিসের ঈশ্বরের সন্তান!

এই যে ঠাকুর বলছেন, আমাকে তোমার কি বোধ হয়, এগুলো পড়লে অনেক সময় আমরা ভাবি মজার ছলেই হয়ত ঠাকুর বলছেন, বা ঠাকুর দেখছেন তাঁকে অন্যরা কিভাবে দেখছে, আমরা এগুলো বুঝি না, জানি না। কারণ আমরা দেখছি ঠাকুর একবার দুবার সাক্ষাতের পর অনেককেই জিজ্ঞেস করতেন, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। পরে পরে ঠাকুর নিজেই শিষ্যদের দেখিয়ে বলছেন, এই ছোকড়াদের শুধু এই কটি জিনিস জানলেই হবে, তারা কে, আমি কে আর আমার সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক। সাধনা বলতে এটাই, এ-ছাড়া আর কোন সাধনা নাই, আপনি কে, ঠাকুর কে আর ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক। আমরা ঠাকুরের সময় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি বলে খুব সহজে আমরা এই কথাগুলি বলতে পারছি। কিন্তু ঠাকুরের সময় ঠাকুর নিজের শিষ্যদের নামে অনায়াসে বলছেন, এই ছোকড়াদের শুধু এটুকু জানলেই হবে, ওরা কে, আমি কে আর আমার সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক।

নরেন যেমন ঠাকুরের বিশেষ লোক, মাস্টারমশাইও তেমন বিশেষ লোক। এই কথামৃত আমরা মাস্টারমশাইয়ের দরুণ পেয়েছি। তখনকার দিনে কেউ বুঝত না মাস্টারমশাইর কি বৈশিষ্ট্য, বরঞ্চ যাঁরা ছিলেন তাঁরা ত্যাগী, আর ত্যাগীদের যা হয় – অহঙ্কার থাকে, সে যত বড়ই হোক। আর ত্যাগীদের এটাও থাকে – অকারণে উপদেশ দেবে, ত্যাগীদের আরেকটা সমস্যা হয়, অপরকে তাচ্ছিল্য করবে, করবেই। আপনি এমন সন্ন্যাসী পাবেন না, যে অপরকে তাচ্ছিল্য করেন না, মুখে না করলেও মনে মনে করবেই। মাস্টারমশাই বিবাহিত, সন্তানাদি আছে, যার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দিককার দিনগুলিতে অনেক সন্ন্যাসী ছিলেন, যাঁরা মাস্টারমশাইর কাছে যাওয়া পছন্দ করতেন না। মাস্টারমশাই আর সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিরাট বিভাজন ছিল। সন্ন্যাসীদের এই ভাব – ঠিক আছে বই লিখেছেন, উনি গৃহী মানুষ, সংসারে ডুবে আছেন, ইত্যাদি। আজকে আমরা একশ বছর দূরে চলে এসেছি, এগুলো আমাদের কাছে এখন কোন ম্যাটার করে না। আমাদের কাছে নরেন যেমন বিরাট হয়েছেন, নিজে শিক্ষা দিচ্ছেন, ঠিক তেমনি কথামৃতের জন্য আমরা সবাই মাস্টারমশাইএর কাছে বিরাট কৃতজ্ঞ, নাগপঞ্চমীর দিন আমরা সন্ন্যাসীরা খুব শ্রদ্ধার সাথে মাস্টারমশাইর জন্মতিথি পালনা করি।

নরেনের নামে আগে ঠাকুর প্রশংসা করে এত কথা বললেন, ঠিক তেমনি মাস্টারমশাইয়েরও একটা বিশেষ দাম আছে। ঠাকুর এবার মাস্টারমশাইকে দেখতে শুরু করেছেন, আমার সাথে সম্পর্কটা কেমন। চারদিনের মাত্র দেখাশোনা, এরই মধ্যে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়? একটা সম্পর্ক তৈরী না হলে এই প্রশ্ন করা যায় না। ঠাকুরের ভেরিফিকেশান শুরু হয়ে গেল, আমাদের মধ্যে ওই বণ্ড আছে কিনা। কিন্তু নরেনের ক্ষেত্রে ঠাকুর যেমন একেবারে উপচে গিয়েছিলেন, আর নরেনকে এক সেকেণ্ডের জন্যও ছাড়ছেন না, নরেনের সঙ্গে কিছু হয়ে গেলে ঠাকুর পাগলের মতে হয়ে যাচ্ছেন, মাস্টারমশাইয়ের সাথে সেভাবে নেই। এমনকি মাস্টারমশাই এদিক সেদিক কিছু করছেন, ঠাকুর তাঁকে বকে দিচ্ছেন। একবার তো ঠাকুর খুব অপ্রসন্ন হয়ে মাস্টারমশাইকে বলেই দিলেন, কারিগরের কাছে অনেক কল থাকে, একটা কল খারাপ হলে আরেকটা কল লাগিয়ে দেয়। অর্থ হল, তুমি মায়ের দ্বারা যে কাজের জন্য নির্দিষ্ট, যদি ঠিক করে কাজ না কর, তাহলে আরও অনেকে আছে যারা এই কাজ করে দেবে।

মাস্টারমশাই এবার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সদর ফটক পর্যন্ত এসে তাঁর কি মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার নাটমন্দিরে ঠাকুরের কাছে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি দেখছেন, "ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী – নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন। আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে। অনপেক্ষ"।

আমরা জানি সিংহ যখন শিকার করে তখন দল বেঁধে শিকারকে আক্রমণ করবে। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে সিংহ একা চলে, তা না, বরঞ্চ বাঘ বেশী একা থাকে, শিকারও একা একা করে। কিন্তু মানুষের মনে সিংহ সম্বন্ধে ভুল কিছু ধারণা চলে এসেছে, কারণ সিংহের রাজকীয় চাল, মেজাজ, সেই সঙ্গে পশুরাজ বলছে, সেখান থেকে আমাদের মনে এই ধারণাটা ঢুকে আছে যে সিংহ একা থাকে। আমরা বাল্মীকি রামায়ণে এবং আরও অনেক জায়গায়, নরব্যাঘ্র, নরশার্দুল এই শব্দগুলির ব্যবহার পাই, কিন্তু পরে পরে বাঘ সেখান থেকে সরে গেল। বাঘ আর সিংহ দুজনের শক্তির তুলনা করে ইন্টারনেটে সার্চ করলে দেখা যাবে, এর কোন conclusion নেই। কারণ অনেকগুলো ঘটনা আছে যেখানে বাঘ একটা পূর্ণ বয়স্কের সিংহকে মেরে দিয়েছে, আবার আছে সিংহও বাঘকে মেরে দিচ্ছে। মোটামুটি তুলনা করলে দেখা যাবে বাঘের শক্তি সাধারণ ভাবে সিংহ থেকে বেশী। কিন্তু সিংহের কেশর, চালচলন দেখে মনে হয় সিংহ বিরাট কিছু, কিন্তু তা না। কবিরা যখনই ম্যজেস্টির বর্ণনা করেছেন, তখন সেখানে তাঁরা নিয়ে আসছেন সিংহকে। আর মা পার্বতী তাঁর বাহন বানালেন সিংহকে, সেখান থেকে সিংহের রাজকীয়টা পুরো আলাদা একটা রূপ পেয়ে গেল।

মাস্টারমশাই সিংহের উপমা নিচ্ছেন, ঠাকুর পাদচারণ করছেন, আত্মারাম, অনপেক্ষ, কোথাও কিছু নেই। সংসারী মানুষ পারে না, সংসারী মানুষ সঙ্গী ছাড়া থাকতে পারে না। যদি কেউ না থাকে, যদি একা হয়ে যায়, মন তার বিষণ্ন হয়ে যাবে। যাকেই দেখবেন একা একা হাঁটছে, হয় তাড়াতাড়ি পোঁছবার জন্য হাঁটছে বা দুখী হয়ে একা হাঁটছে। আমি যতজন সন্ন্যাসীকে একা একা হাঁটতে দেখেছি, সবাই পশুরাজ সিংহের মত একা হাঁটছেন। সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে গেছেন কিনা। কোন সন্ন্যাসীকে যদি একা একা হাঁটতে দেখেন, আপনার দেখে কখনই মনে হবে না যে, ওনার একজন সঙ্গী দরকার। ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ছাড়া একা একা নিঃসঙ্গ কেউ থাকতে পারে না। হাঁটার মধ্যে রাজকীয় ভাব, সন্ন্যাসীদের মধ্যে থাকে, সংসারীদের সাধারণ ভাবে থাকে না। মাস্টারমশাই ঠাকুরকে প্রথম প্রথম দেখছেন, সেইজন্য এই ভাবগুলো তাঁর চোখে পড়ছে।

মাস্টারমশাই ফিরে এসেছেন দেখে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, "আবার যে ফিরে এলে?

"না, এটা বলার জন্য যে, বলরাম বোসের বাড়ি বড় মানুষের বাড়ি – যেতে দেবে কি না; তাই যাব না ভাবছি। এখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব"।

"শ্রীরামকৃষ্ণ – না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তাহলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে"। মাস্টারমশাই যে আজ্ঞা বলে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। এরপর মাস্টারমশাই বলরাম বাবুর বাড়িতে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করছেন। এই অধ্যায় এখানেই শেষ, আমরাও এই পর্বের আলোচনা এখানেই শেষ করছি।